পরিবেশ ও বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, 1949 সালের 26 নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা – ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন – ২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' -কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো এই বইটি।

এই বিজ্ঞান বইটি সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবনবিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। লেখা ও ছবিগুলি যাতে শিশুমনে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রেখে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, কালি ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পর্ষদ প্রণীত 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে ও তাদের শিখন সামর্থ্য বাড়বে। অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথিতযশা শিক্ষক - শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রেমী শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ — যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বইটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন সাহায্য করে পর্ষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

আশা করি পর্ষদ প্রকাশিত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নততর করতে সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা উদবুদ্ধ হবে। এইভাবে সার্থক হবে পর্ষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন বিনা দ্বিধায় বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্ষদের নজরে আনেন যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বইটির মান উন্নত হবে এবং ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে যে, 'even the best can be bettered'। বইটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সমাজের ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গঠনমূলক মতামত ও সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ডিসেম্বর, ২০১৭
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বইয়ের নাম 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুযায়ী জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ সমন্বিত আকারে একটি বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো। সহজ ভাষায় এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বইটি আকর্ষণীয় এবং প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রেখেছি—'তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়।' (ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক)। ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম 'বিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশে আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধানে ব্রতী হবে এবং উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ড.সন্দীপ রায় দেবব্রত মজুমদার পার্থপ্রতিম রায় ড.শ্যামল চক্রবর্তী

সুদীপ্ত চৌধুরী রুদ্রনীল ঘোষ ড.ধীমান বসু দেবাশিস মন্ডল

নীলাঞ্জন দাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডাঃ সুব্রত গোস্বামী

ড. অনির্বাণ রায় ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ডাঃ পৃথ্বীশ কুমার ভৌমিক

অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ মজুমদার অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার

শিবপ্রসাদ নিয়োগী ডঃ অংশুমান বিশ্বাস

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ — দেবাশিস রায়

সহায়তা — হিরাব্রত ঘোষ, অনুপম দত্ত, বিপ্লব মন্ডল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ বই নিয়ে কিছু কথা

এই বইয়ের নাম কেন ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান ’ সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের মনে হয়েছে যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের প্রথমে পরিবেশের নানান ঘটনা ও বৈচিত্র্যের প্রতি কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দিকে শিশুর যাত্রা তার চেনা পৃথিবী থেকে, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। সেই কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ের নাম ‘আমাদের পরিবেশ’। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষ যখন ধীরে ধীরে আরো জানতে চায় তখন সে অনুভব করে যে শুধু পরিবেশ পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। সেকাজে তখন প্রয়োজন বিজ্ঞানের, যে বিজ্ঞান তার জ্ঞানের যাত্রায় আলোকবর্তিকা। এই কারণেই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বইয়ের নাম ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’।

আমরা ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের প্রথাগত (Formal) ধারণায় দীক্ষিত করতে চাই, কিন্তু সে যাত্রায় আমরা অনুসরণ করব শিখনের Constructivist ধারণার পথই। আজ সারা বিশ্বে পঠনপাঠনে অনুসৃত এই Constructivist ধারণার মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে তার পরিচিত জগৎ থেকে তার মনোজগতের ধারণাসমূহের সাহায্য নিয়ে ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষায় দীক্ষিত করা। সেই কারণে যতদূর সম্ভব নানাভাবে অনুসন্ধানের (Exploration) সাহায্য নেওয়া হয়েছে, বহুসংখ্যক হাতেকলমে পরীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সবপরীক্ষা অল্প চেষ্টায়, অল্প খরচেই করা সম্ভব। হাতেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের নানান বিষয় আরো ভালোভাবে শিখতে পারবে। যেহেতু বিজ্ঞানের সবকিছুই Intuitive নয়, তাই শিক্ষক / শিক্ষিকাকে Concept Learning ও Knowledge Construction- এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিখন পরিচালনা করতে হবে।

এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়ী প্রচেষ্টার (Integrated Approach) ফসল। আমরা মনে করি দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে জীববিদ্যা , রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করলেই সমন্বয় সাধন হয়ে যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং মেলবন্ধনের চেষ্টাই এই বইকে অন্য মাত্রা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ বইটিতে সহজ ভাষায় জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মেলবন্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে, সেই দিক থেকে দেখলে এই বইটি পথিকৃৎ।

বিজ্ঞানে তথ্যানুসন্ধান ও সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই বইয়ের পাঠক ও পাঠিকাদের বহুক্ষেত্রেই Open-ended প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই ধরনের প্রশ্ন / কর্মপত্র ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহী করে তুলতে সংযোজিত হয়েছে। এটিও এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বইটি সম্বন্ধে যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

1 ভৌত পরিবেশ

তাপ

ঠান্ডা ও গরমের ধারণা

নীচের ছবিগুলো দেখো
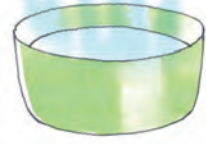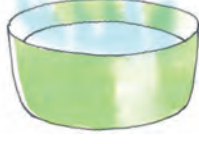
ওপরের ছবিতে তিনটি বাটির একটিতে ঠান্ডা জল আর অন্য দুটিতে ভিন্ন মাত্রার গরম জল আছে। আঙুল ডুবিয়ে যদি তিনটি পাত্রের জলের গরম অবস্থার বর্ণনা দিতে চাও তাহলে কীভাবে ওই অবস্থার বর্ণনা করবে?

উত্তরটা হয় 'ঠান্ডা' অথবা 'গরম' অথবা 'বেশি গরম'।

কিন্তু যদি বিভিন্ন মাত্রার গরম জলের অনেকগুলো পাত্র নেওয়া হয়, একই ধরনের শব্দ দিয়ে তাদের গরম বা ঠান্ডা অবস্থাকে আলাদা করে বোঝানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

অথচ আমরা চাই যে নানারকমের ঠান্ডা-গরম অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকুক। যখন শব্দ দিয়ে এটা হচ্ছে না, এমন কিছু কি তোমার মনে আসছে যা দিয়ে এটা সম্ভব?

নানারকমের টাকার হিসাব আমরা সংখ্যা দিয়ে করি। নানারকম ওজন আমরা সংখ্যা দিয়ে বোঝাই, এখানেও কি ওইভাবে সংখ্যা ব্যবহার করা সম্ভব?

বিভিন্ন ঠান্ডা-গরম অবস্থা প্রকাশের জন্যও তাই বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন, কতটা ঠান্ডা বা কতটা গরমের জন্য কোন সংখ্যা, তা ঠিক হবে কীভাবে? চলো নীচের পরীক্ষাটি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করা যাক।

উষ্ণতা ও তার পরিমাপ ঃ

উপকরণ ঃ 1) ঢাকনাওয়ালা একটি ছোটো কাচের শিশি।
2) কিছুটা রঙিন জল।
3) পেনের সরু খালি রিফিল।
4) এক বাটি গরম জল।
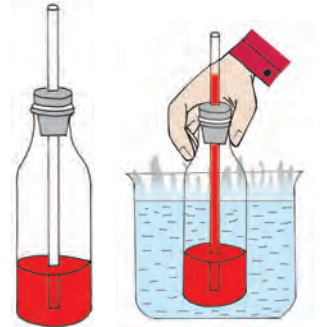
পদ্ধতি : খালি শিশিতে কিছুটা রঙিন জল নাও। জলের পরিমাণ এমন হবে যাতে শিশির মধ্যে বায়ুপূর্ণ স্থানের পরিমাণ বেশি হয়। ওই শিশির মুখটা ভালো করে আটকাও। শিশির ছিপিতে ডট পেনের দু-মুখ খোলা ফাঁকা সরু রিফিলের নলটা ঢোকাবার মতো একটা ফুটো করো। ওই ফুটো দিয়ে ওই ফাঁকা রিফিল ঢোকাও। মুখে মাখার ক্রীম বোতল আর রিফিলের জোড়ের মুখে লাগাও।

শিশিটাকে কিছুক্ষণ বাটির গরম জলের মধ্যে এমন ভাবে ডুবিয়ে রাখো যাতে শিশির বায়ুপূর্ণ স্থানের

বেশিরভাগটা জলের তলায় থাকে। কী দেখলে? রিফিলের নল দিয়ে রঙিন জল কি কিছুটা উপরে উঠল? জল যতটা উঠল সেখানে নলের গায়ে একটা দাগ দাও।

এবার বাটির জলটা আরও একটু বেশি গরম করে পরীক্ষাটা আবার করো। দেখত এবার রঙিন জল রিফিলের নল দিয়ে বেশি উচ্চতায় উঠল কিনা। জল যতদূর উঠল সেখানে নলের গায়ে আবার দাগ দাও।

তোমার জ্যামিতি বাক্সের স্কেল দিয়ে সহজেই তুমি দাগ অবধি রঙিন জলের উচ্চতা মাপতে পারো। যার ফলে তুমি দুটি আলাদা সংখ্যা পাবে যা দৈর্ঘ্যের মান বোঝায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই দুরকম দৈর্ঘ্যের জন্য দুটি আলাদা সংখ্যা পাওয়ার কারণ কী। বাটির জল দু-বার দু-রকম গরম ছিল। তাই রঙিন জল দু-বার দু-রকম উচ্চতায় উঠেছে। আমরা দুরকম গরমের জন্য দুটি আলাদা সংখ্যা পেয়েছি।

এইভাবে বিভিন্ন গরম-ঠান্ডা অবস্থার জন্য সংখ্যা ঠিক করতে অপর একটি রাশির (যেমন- এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য) সাহায্য নেওয়া হয়।

তোমরা বাড়িতে জ্বর মাপার জন্য থার্মোমিটার দেখেছ। জ্বর বাড়লে ওই থার্মোমিটারের মধ্যে সরু সুতোর মতো পারদসূত্রের দৈর্ঘ্য বাড়ে। তবে থার্মোমিটারের গায়ে লেখা সংখ্যাটি কিন্তু দৈর্ঘ্যের মাপ নয়। পারদসূত্রের দৈর্ঘ্য যেভাবে বাড়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই থার্মোমিটারের গায়ের সংখ্যাগুলি ঠিক করা হয়েছে। গরম বা ঠান্ডা অবস্থা প্রকাশের জন্য এভাবে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি উষ্ণতার পরিমাপ। উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। বিভিন্নরকম গরমের সংস্পর্শে পারদসূত্র যখন বিভিন্ন উচ্চতায় ওঠে তখন তা বিভিন্ন উষ্ণতা বোঝায়।

নীচের ছবিদুটি লক্ষ করো।
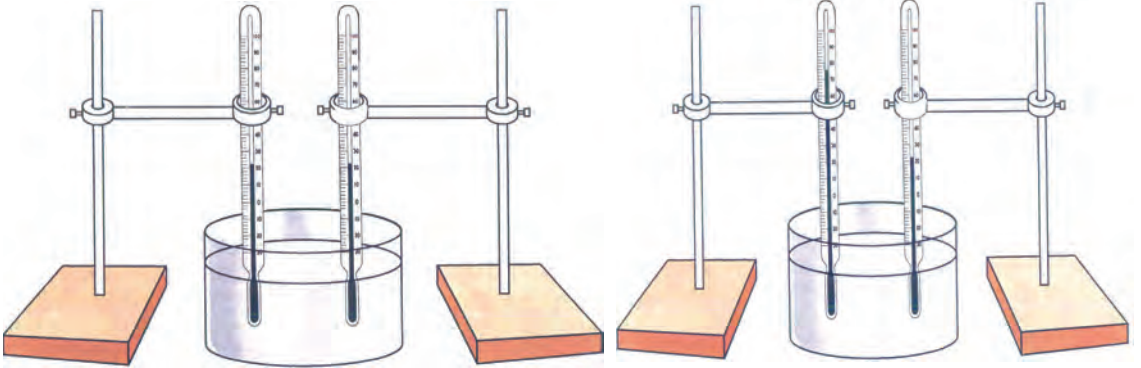
ছবি :1 ছবি :2

দুটি থার্মোমিটার একই রকম। দুটি ছবিতেই থার্মোমিটার দুটি একই তরলের মধ্যে ডোবানো আছে।

1 নং ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্রের উচ্চতা সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে কি? যুক্তি দিয়ে লেখো।

2 নং ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্রের উচ্চতা কি সঠিক দেখানো আছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দুটি আলাদা পাত্রে তরল নেওয়া হলো। পাশের ছবিটিতে থার্মোমিটারের পারদসূত্রের উচ্চতা দেখে বলো কোন পাত্রের তরলের উষ্ণতা বেশি - 'ক' না 'খ'?

পাশের ছবিতে হুবহু একই ধরনের গঠনের থার্মোমিটার 'ক' ও 'খ' দেখানো হয়েছে। দুটি থার্মোমিটারেরই পারদকুণ্ড একটি পাত্রে রাখা বরফের মধ্যে ডোবানো আছে। এই অবস্থায় থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্র যে উচ্চতায় উঠেছে সেখানে দাগ কাটা হয়েছে। ছবিতে ওই দুটি দাগের পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা সংখ্যা বসাও।
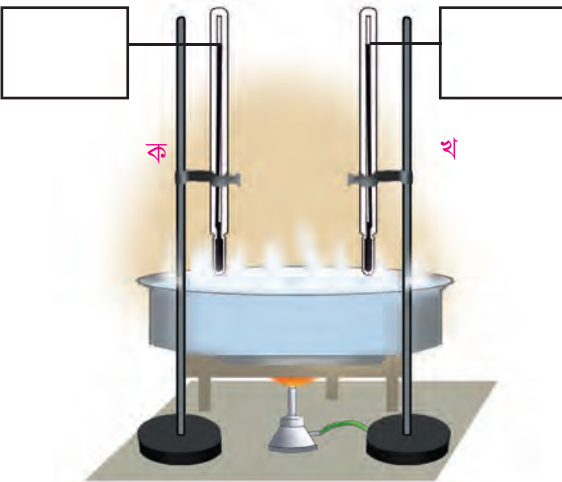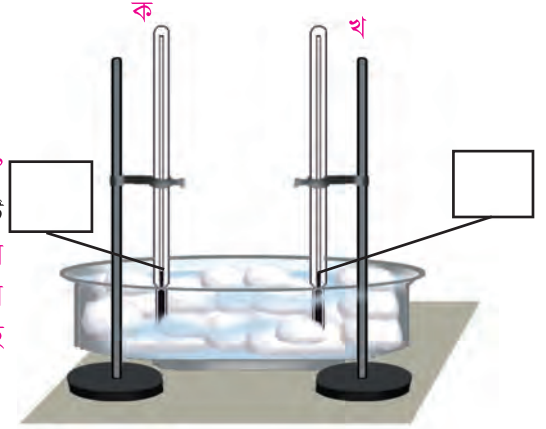
পাশের ছবিতে পাত্রের জলটা ফুটছে। ফুটন্ত জলের একটু উপরে উপরোক্ত থার্মোমিটার দুটির পারদকুণ্ড রাখলে পারদসূত্রের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে একসময় স্থির হয়। থার্মোমিটারের যে উচ্চতায়পারদসূত্র উঠবে সেখানে একটা দাগ দেওয়া হয়। ওই দাগটা ওই গরমের মাত্রায় পারদসূত্রের উচ্চতা কতটা তাকে দেখায়। ছবিতে 'ক' ও 'খ' থার্মোমিটারে যে দুটি দাগ দেওয়া আছে তার পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা সংখ্যা লেখো, যে সংখ্যা দুটি আগের ছবিতে বরফে ডোবানো থার্মোমিটারের গায়ে লেখা সংখ্যা দুটির চাইতে বেশি।

নীচে সঠিক স্থানে তোমার ভাবা সংখ্যাগুলো লেখো।

পারদসূত্র যেখানে উঠেছে	ক-থার্মোমিটার	খ-থার্মোমিটার
গরম বাষ্পে রাখার পর (U)		
বরফে ডোবানোর পর (L)		
U–L (বিয়োগফল)		
দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কত ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগকে 'এক' বলা যাবে? এই একটি ভাগকে এক ডিগ্রি বলা হয়।		

পাশের ছবিটি ভালো করে দেখো —

'ক' ও 'খ' দুটি থার্মোমিটারই একরকম। একই জিনিস দিয়ে তৈরি। একটি পাত্রে বরফ ও বরফ-গলে-পাওয়া জল একসঙ্গে আছে। জল ও বরফের ওই মিশ্রণের মধ্যে দুটি থার্মোমিটারের পারদকুণ্ড ছবির মতো করে ডোবানো হলো।

নীচের সারণিটি ভালো করে দেখো ও পারদসূত্র যে উচ্চতায় উঠেছে তার গায়ে লেখা সংখ্যা দুটি লক্ষ করো।
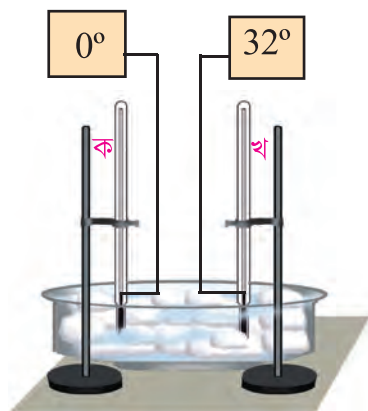
সারণি - 1

	ক	খ
পারদ স্তম্ভের উচ্চতা	ক ও খ-তে একই	
পারদসূত্র যে উচ্চতায় রয়েছে সেখানে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত গরমের মাত্রা (L)	0º	32º

পাশের চিত্রে 'ক' ও 'খ' দুটি থার্মোমিটারই একরকম। দুটি থার্মোমিটারেরই কুণ্ডকে একই পাত্রে রাখা ফুটন্ত জলের ওপরের বাষ্পে রাখা হলো। পারদসূত্র যেখানে উঠল সেখানে সংখ্যা লিখে গরমের মাত্রা বোঝানো হয়েছে।
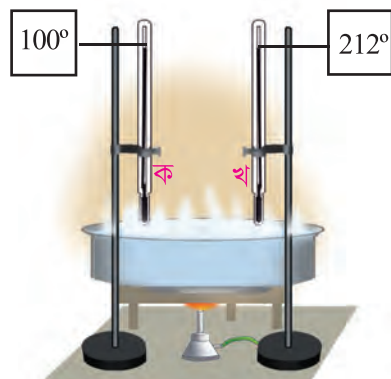
নীচের সারণিটি দেখো ও সংখ্যাদুটি লক্ষ করো।

সারণি - 2

	ক	খ
পারদ স্তম্ভের উচ্চতা	ক ও খ-তে একই	
সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত বেশি গরমের মাত্রা (U)	100°	212°

সারণি - 1 ও সারণি - 2 মিলিয়ে লেখো :-

	ক	খ
বরফ জলে ডোবানোর পর লেখা সংখ্যা (L)		
ফুটন্ত জলের উপরে রাখার পর লেখা সংখ্যা (U)		
U – L		
দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগকে এক ডিগ্রি বলা যাবে?		

উপরে নেওয়া 'ক' থার্মোমিটারকে যেভাবে সংখ্যা লিখে ভাগ করা হয়েছে তাকে বলে সেলসিয়াস স্কেল, আর 'খ' থার্মোমিটারকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তাকে বলে ফারেনহাইট স্কেল। সেলসিয়াসকে C ও ফারেনহাইটকে F দিয়ে বোঝানো হয়।

রেখা দিয়ে বোঝানো সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট থার্মোমিটারের স্কেলের ছবি পাশে দেওয়া হলো।

ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে 'C' ও ফারেনহাইট স্কেলে 'F' পাঠ দেখাচ্ছে।

সেলসিয়াস স্কেলে 0^o থেকে C -এর দূরত্ব এবং ফারেনহাইট স্কেলে 32^o থেকে F -এর দূরত্ব সমান।

এবার বলত, 0^o থেকে C-এর মধ্যে কতগুলি ঘর আছে, এবং 32^o থেকে F-এর মধ্যে কতগুলি ঘর আছে?
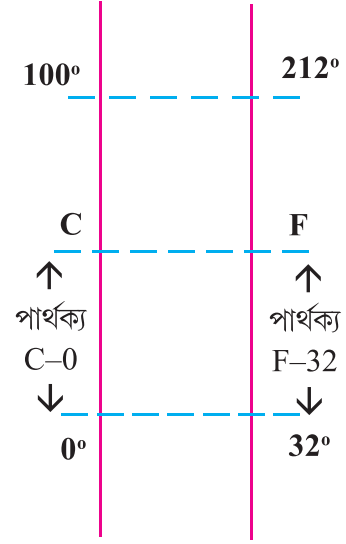
আগেই দেখেছ সেলসিয়াস স্কেলের 100 ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের 180 ঘরের সমান।

তাহলে সেলসিয়াস স্কেলের 1 সংখ্যক ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের $\frac{180}{100}$ ঘরের সমান।

অতএব, সেলসিয়াস স্কেলের C সংখ্যক ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের $\frac{180\,C}{100}$ সংখ্যক ঘরের সমান।

তাহলে লেখা যায়,

$$\frac{180C}{100} = F\text{-}32$$

বা, $\frac{9C}{5} = F\text{-}32$

বা, $\frac{C}{5} = \frac{F\text{-}32}{9}$

আবার, $\frac{9C}{5} = F\ \text{-}32$ হলে

বা, $C = \frac{5}{9}(F\text{-}32)$

এবার 40^oC কত ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান তা কষে বের করো।

উষ্ণতার পরিবর্তন ও তাপের ধারণা ঃ

শীতকালে ঠান্ডা জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে আমরা অনেকেই স্নান করি। এসো দেখি তা থেকে আমরা কি নতুন বিষয় শিখতে পারি।

নীচের ছবিদুটি লক্ষ করো
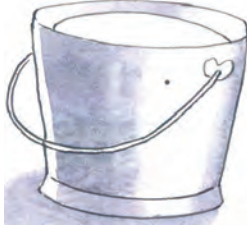
বালতিতে 15°C উষ্ণতায় জল
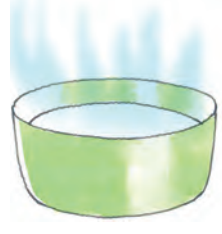
গামলাতে 97°C উষ্ণতায় জল

এবার বলো, বালতির জল ও গামলার জল মিশিয়ে দিলে কী হবে?

ঠিক উত্তরের পাশে '✓' দাও

মেশানো জল গামলার জলের চাইতে কম গরম ☐

মেশানো জল বালতির জলের চাইতে বেশি গরম ☐

তুমি দেখতে পেলে যে দুটি আলাদা উষ্ণতার বস্তু সংস্পর্শে এলে একটির উষ্ণতা বাড়ে ও অন্যটির উষ্ণতা কমে। এখন প্রশ্ন এটা কেন হয়?

যে বস্তুটির উষ্ণতা বাড়ল ভাবা যেতে পারে যে সে বাড়তি কিছু পেল । একইভাবে যার উষ্ণতা কমল সে কিছু হারাল।

দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে যা হারায় বা যা বাড়তি পায় তাকেই আমরা বলি তাপ (Heat)।

তাহলে যখন কোনো বস্তুর উষ্ণতা বাড়েও না বা কমেও না, স্থির থাকে অর্থাৎ বস্তুটি কিছু বাড়তি পায়ও না বা হারায়ও না তখন তাপের কথা ভাবার প্রয়োজন পড়ে না। ওপরের পরীক্ষায় গরম ও ঠান্ডা জলের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলেও জল তরলই ছিল, তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পরে আমরা দেখবো যে কোনো পদার্থের যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (পদার্থটি কঠিন থেকে তরল হয়, বা তরল থেকে বাষ্প হয়, বা বাষ্প থেকে তরল হয় ইত্যাদি) তখন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করা সত্ত্বেও ওই পদার্থটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাপ

দুটি হুবহু একই রকম পাত্র নেওয়া হলো। পাত্রদুটিতে ঘরের উষ্ণতায় (ধরি,25°C) সমান পরিমাণে জল নেওয়া হলো। একই বার্নার দিয়ে পাত্রদুটির জলকে পরপর গরম করা হলো। ধরো, প্রথম পাত্রের জলকে 50°C পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পাত্রের জলকে 75°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলো। (শূন্যস্থান পূরণ করো এবং উপযুক্ত স্থানে '✓' দাও।)
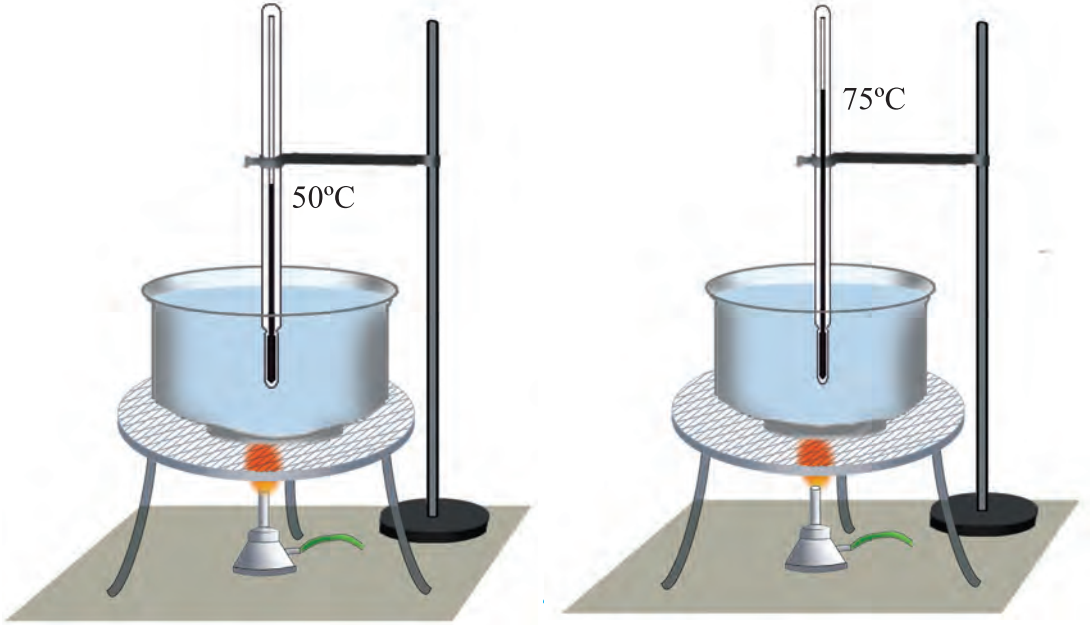
দ্বিতীয় পাত্রের জলের উষ্ণতা কতটা বাড়ানো হলো? .... °C।

কোন পাত্রের জলকে উত্তপ্ত করতে বেশি তাপ দিতে হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

এখন 50°C ও 75°C উষ্ণতার জল সহ পাত্র দুটোকে ঘরের উষ্ণতায় (25°C) রেখে দেওয়া হলো।

তাহলে ওই দুই পাত্রের জলই আলাদা আলাদা করে তাপ হারিয়ে কোনো না কোনো সময়ে ঘরের উষ্ণতায় আসবে। অর্থাৎ প্রথম পাত্রের জলের উষ্ণতা কমবে (50-25)°C=25°C আর দ্বিতীয় পাত্রের জলের উষ্ণতা কমবে (75-25)°=50°C।

ভেবে বলো তো কোন পাত্রের জল বেশি তাপ হারিয়েছে?

তাহলে বলা যায়-

নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তু বাইরে থেকে কতটা তাপ নিয়েছে বা কতটা তাপ ওই বস্তু থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তুর উষ্ণতা আগের থেকে কতটা বাড়ল বা কমল তার উপর। উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তবে বস্তুর নেওয়া তাপের পরিমাণও দ্বিগুণ হবে। একটি বস্তুর উষ্ণতা 10°C থেকে 20°C করতে যতটা তাপ দরকার 20°C থেকে 40°C করতে তার দ্বিগুণ তাপ দরকার।

বস্তু বাইরে থেকে যতটা তাপ নেয় বা বাইরে যতটা তাপ ছেড়ে দেয় তার সঙ্গে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা উষ্ণতা হ্রাসের সরল সম্পর্ক রয়েছে।

একটা পাত্রে একগ্লাস জল নেওয়া হলো। জলের উষ্ণতা 25°C। একটি বার্নার দিয়ে ওই জলকে 50°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলো। এবার ওই পাত্র খালি করে তাতে কুড়ি গ্লাস জল নেওয়া হলো। জলের উষ্ণতা এবারেও 25°C। ওই বার্নার দিয়ে এই জলের উষ্ণতা বাড়িয়ে আবার 50°C করা হলো।

25°C উষ্ণতায় জল
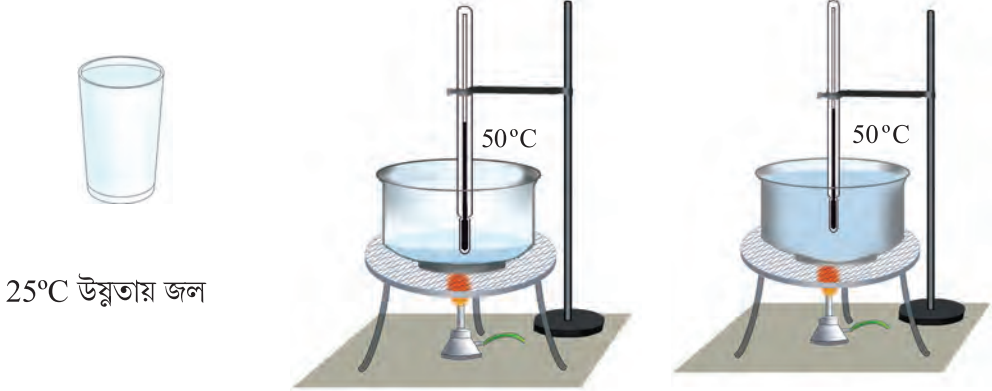
ভেবে বলো তো কোন ক্ষেত্রে জল 25°C থেকে 50°C অবধি উত্তপ্ত হতে বেশি তাপ নেবে? এক গ্লাস জল না কুড়ি গ্লাস জল?

উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে এক বাটি জলের যত তাপ লাগে, এক বালতি জলের তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ লাগে — এটা নিশ্চয়ই তোমরা বাড়িতে লক্ষ করেছ।

তাই বলা যায় উপাদান একই থাকলে উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে বেশি ভরের বস্তুর বেশি তাপ দরকার।

উষ্ণতা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়া বা কমার জন্য কোনো বস্তু কতটা তাপ বাইরে থেকে নেবে বা হারাবে, সেটা ওই বস্তুটার ভরের সঙ্গে সরল সম্পর্কে থাকে।

এবার হুবহু একরকম দুটো পাত্র নেওয়া হলো। একটা পাত্রে এক বাটি দুধ আর অন্য পাত্রে একই ভরের জল নেওয়া হলো। ধরা যাক দুধ ও জল উভয়েই ঘরের উষ্ণতায় (25°C) আছে।

এবার একই ধরনের দুটি বার্নার দিয়ে দুধ ও জল আলাদা করে একই সময় ধরে উত্তপ্ত করা হলো।
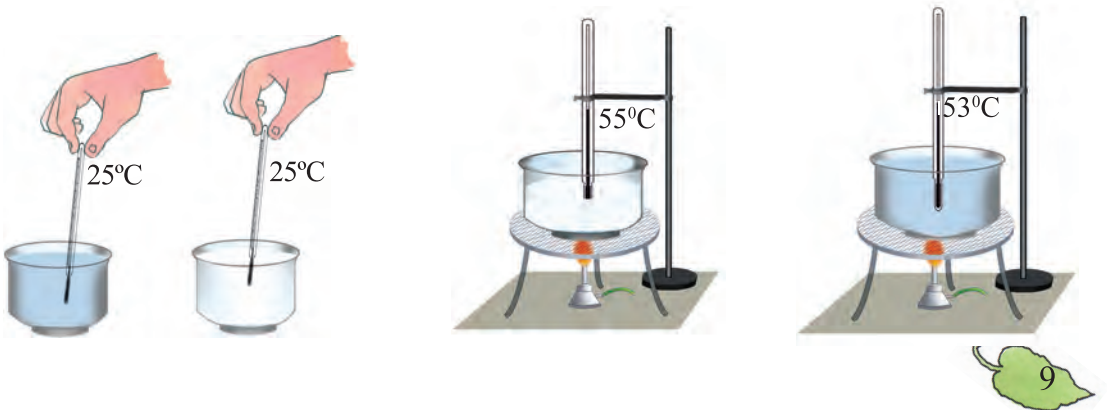
দেখা যায়, একই সময় ধরে উত্তপ্ত করা সত্ত্বেও দুই তরলের উষ্ণতা আলাদা আলাদা হয়, দুধের উষ্ণতা জলের চেয়ে বেশি হয়।

যেহেতু একই সময় ধরে গরম করা হয়েছে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় ওই দুই তরলকে একই পরিমাণ তাপ দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে সমান ভরের দুটি আলাদা পদার্থে সমপরিমাণ তাপ দেওয়া হলেও উষ্ণতা বৃদ্ধি সমান হয়নি। এ থেকে বলা যেতে পারে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য একটি বস্তু কতটা তাপ গ্রহণ বা বর্জন করবে তা বস্তুটি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি তার উপর নির্ভর করে।

তাহলে নীচের তালিকাটি পূরণ করো-

তাপের পরিমাপ করার জন্য SI পদ্ধতিতে যে একক ব্যবহার করা হয় তা হলো জুল। এছাড়াও অন্য একটি এককও তাপ পরিমাপের জন্য প্রচলিত। সেটি হলো ক্যালোরি। ক্যালোরি কিন্তু SI একক নয়।

তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

এসো একটা পরীক্ষা করা যাক।
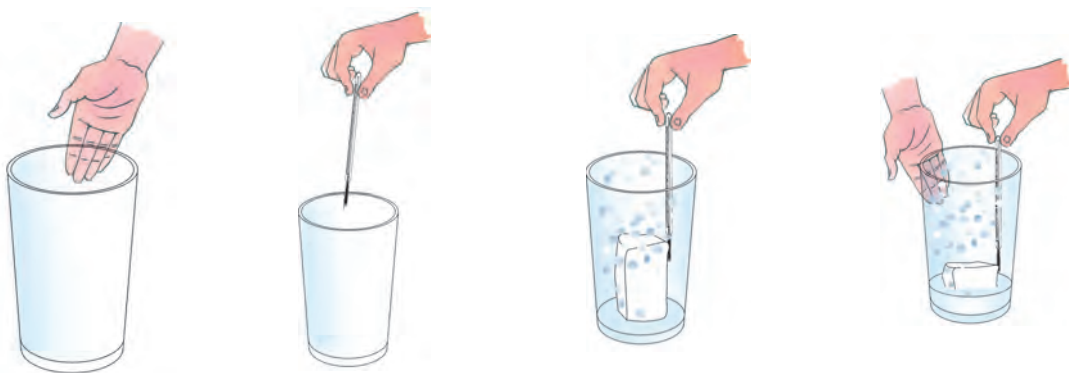
ঘরের উষ্ণতায় (ধরো 25°C) একটা গ্লাস নাও। এবার গ্লাসটার মধ্যে একটা বড়ো মাপের (গ্লাসের মধ্যে রাখা যায় এমন) বরফের টুকরো নাও। যদি একটা থার্মোমিটার দিয়ে তুমি বরফটার উষ্ণতা মাপতে তাহলে তুমি থার্মোমিটারে এই পাঠ 0°C পেতে।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দাও এবং কী ঘটছে তা লক্ষ করো। দেখতে পাচ্ছ বরফটা গলছে আর জলে পরিণত হচ্ছে।

এবার আবার থার্মোমিটার দিয়ে বরফটার উষ্ণতা পরিমাপ করো। দেখা গেল এবারেও বরফের উষ্ণতা 0°C, অর্থাৎ বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

এবার গ্লাসটার গায়ে হাত দিয়ে দেখো।

দেখবে গ্লাসটা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। যদি তুমি থার্মোমিটার দিয়ে গ্লাসটার উষ্ণতা মাপতে, তবে দেখতে গ্লাসের উষ্ণতা 25°C-র চেয়ে অনেক কমে গেছে।

নীচের সারণিটি পূরণ করো

পরীক্ষা শুরুর আগে	পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় উষ্ণতা বাড়ছে/ কমছে/একই রয়েছে
বরফের উষ্ণতা = 0°C গ্লাসের উষ্ণতা = 25°C	

এভাবেই বারবার বরফ আর গ্লাসের উষ্ণতা মাপতে থাকলে, তুমি দেখতে পাবে, পুরো বরফটা গলে জলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। কিন্তু গ্লাসে বরফ নেওয়ার পর থেকেই গ্লাসের উষ্ণতা কমতে থাকছে।

তাহলে গ্লাস নিশ্চয়ই তাপ হারিয়েছে। তবে সেই তাপ গেল কোথায়?

তাহলে কী বরফের এই জলে পরিণত হওয়া আর গ্লাসের তাপ হারানোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে?

আসলে গ্লাস কিছু তাপ হারিয়েছে। আর সেই তাপ গ্রহণ করেছে বরফ। আর তাতেই বরফ গলে জলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বরফের গ্রহণ করা এই তাপ বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। তাই এই তাপকে লীন তাপ বলে।

যে-কোনো পদার্থই তার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে যাওয়ার সময়ে বাইরে থেকে কিছু লীন তাপ সংগ্রহ করে অথবা হারায়। কিন্তু এই তাপ ওই পদার্থের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না।

এক্ষেত্রে 0°C উষ্ণতার বরফ লীন তাপ সংগ্রহ করে 0°C উষ্ণতার জলে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে '**গলন**' বলে। আর এই পরিবর্তনের সময় পদার্থ যে তাপ গ্রহণ করে তাকে গলনের লীন তাপ বলে।

যেমন বরফ গলনের লীন তাপ 80 ক্যালোরি/ গ্রাম। অর্থাৎ 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম বিশুদ্ধ বরফ ওই উষ্ণতার 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলে পরিণত হতে বাইরে থেকে 80 ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে।

এবার জেনে নেওয়া যাক, পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন কত রকমের হয়। নীচের তালিকাটা ভালো করে লক্ষ করো:
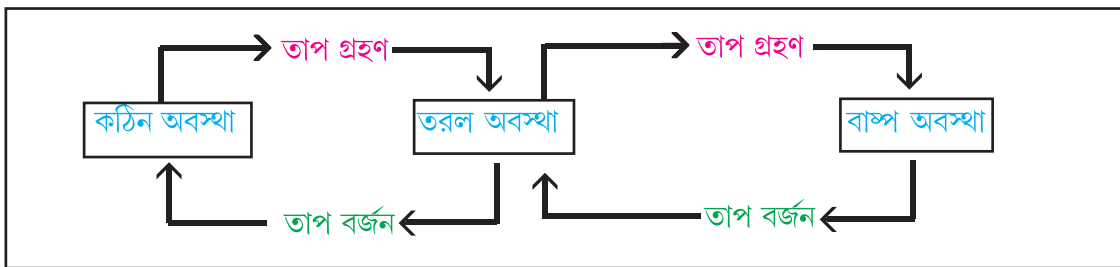
এবার নীচের সারণিটা পূরণ করো—

পদার্থ কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় বদলাচ্ছে	অবস্থার পরিবর্তনের নাম	লীন তাপ গ্রহণ/বর্জন	লীনতাপের নাম
কঠিন থেকে তরল	গলন		গলনের লীন তাপ
তরল থেকে কঠিন	কঠিনীভবন	বর্জন	
তরল থেকে বাষ্প	বাষ্পীভবন	গ্রহণ	
বাষ্প থেকে তরল	ঘনীভবন		

একক ভরের কোনো পদার্থের উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তখন ওই পদার্থ বাইরে থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে, সেই পরিমাণ তাপকেই ওই পদার্থের ওই অবস্থা পরিবর্তনের লীন তাপ বলে।

‘ক’ এবং ‘খ’ তালিকা দুটো ভালোভাবে লক্ষ করো। জল তার বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বাইরে থেকে কতটা লীন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তা এই তালিকা থেকে জানতে পারবে।

খ তালিকা
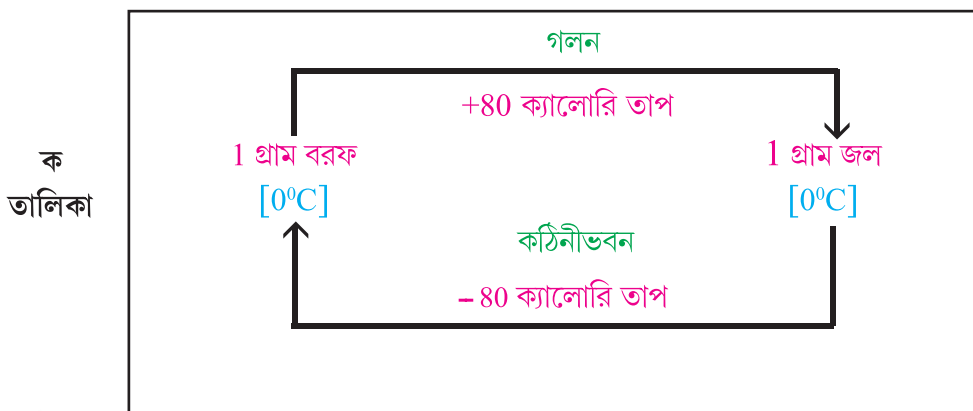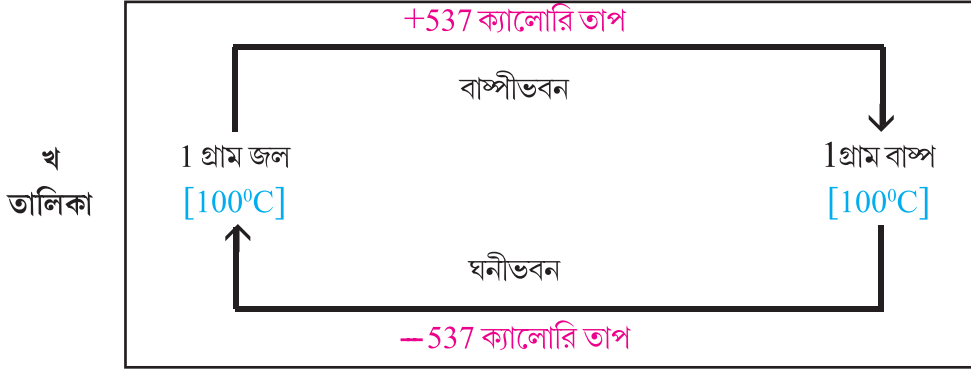
হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে ওই জায়গাটায় ঠান্ডা অনুভূত হয়। আসলে, স্পিরিট বা ইথার উদবায়ী পদার্থ (এই ধরনের পদার্থের খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবন হয়)। বাষ্পীভবনের জন্য দরকার লীন তাপ। স্পিরিট ওই লীন তাপ কোথা থেকে নেবে? স্পিরিট তখন আশপাশের পরিবেশ ও হাত থেকেই সেই লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে হাতের ওই অংশ তখন তাপ হারায়। তখন পাশাপাশি অঞ্চলের তুলনায় ওই অংশের উষ্ণতা কমে যায়। ফলে ওই অংশে ঠান্ডার অনুভূতি হয়।

মাটির কলশির জল ঠান্ডা থাকে। আসলে, মাটির কলশির গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল কলশির বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তার বাষ্পীভবন ঘটে। ফলে দরকার হয় লীন তাপের। ওই বেরিয়ে আসা জল তখন কলশি এবং কলশির ভেতরে থাকা জল থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে কলশি ও কলশির জল তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে।

এখন দেখো তো তুমি নীচের ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারো কিনা।

স্নান করে ওঠার পর পাখা চালিয়ে তার নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা বোধ হয়।

জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝে ঠান্ডা হয়।

গরমকালে ঘরের জানালা-দরজা খোলা রেখে ভেজা পরদা টাঙানো হলে ঘর বেশ ঠান্ডা থাকে।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় তাপের ভূমিকা

জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার তারতম্যের পিছনে তাপ ও উষ্ণতার প্রভাব আছে। শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার ওইসব প্রাণীর তুলনায় বেশি লোমশ (যেমন — কুকুর)। গরমের দিনে মানুষের গা থেকে দরদর করে ঘাম পড়ে। কুকুরের জিভ থেকে লালা পড়ে। সবই দেহকে ঠান্ডা রাখার জন্য। আবার মেরু ভালুকের দেহে ঘন লোম বা পেঙ্গুইনদের গা জড়াজড়ি করে থাকা সবই শরীরকে গরম রাখার জন্য। খুব গরমে চারাগাছ শুকিয়ে যায়। আবার গরম বালিতে গিরগিটি, সাপের মতো ঠান্ডা রক্তের প্রাণীরা রোদ পোহায়। এসব ঘটনা তাপের প্রভাবেই ঘটে।

কোনো জীব কতটা তাপ দেহের ভেতরে তৈরি করতে পারে এবং বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ওই জীবের কতটা পরিমাণ তাপের আদান-প্রদান হয়, তার ভিত্তিতেই বিভিন্ন জীবের দেহে তাপের তারতম্য হয়।

দেহের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বেড়ে গেলে এসো দেখি মানুষ কী কী করে —

1. .... বাড়িয়ে দেয়। 2. .... হার বেড়ে যায়। 3. .... ব্যাস বেড়ে যায়। 4. ....পরিমাণ কমে যায়। 5. .... অনীহা ও কুঁড়েমি দেখা যায়।

নীচের শব্দভাণ্ডার থেকে ওপরের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো।

শব্দভাণ্ডার: শ্বাসক্রিয়া, খাদ্যগ্রহণের,ঘাম বেরোনোর, কাজে, রক্তনালীর।

আবার দেহের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা কমে গেলে মানুষের শরীরে কী কী ঘটে তা নীচের শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে লেখো।

শব্দভাণ্ডার: কাঁপুনি, খাদ্যগ্রহণ, ঘাম বেরোনোর, লোম।

1. ...., 2. ...., 3. ...., 4. ....।

বাবলা, আমরুল, শুশনি ও রাধাচূড়ার মতো কিছু গাছের পাতা দিনের বেলায় একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খুলে যায়। আবার রাত হলে মুড়ে যায়। আবার বহু ফুলের পাপড়ি পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খুলে যায়।

তোমার চারদিকে জীবজগতের ওপর তাপের প্রভাবের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো ও নীচের খোপে লেখো।

আলো

প্রাত্যহিক জীবনে আলো সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও আলোর সরলরৈখিক গতি

- জানালা থেকে একটু দূরে উজ্জ্বল রোদে ঘরের মধ্যে তুমি পড়তে বসেছ। এমন সময় তোমার মা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাস, উজ্জ্বল রোদের বদলে একটা ছায়া এসে হাজির। এখন সব আবছা আবছা হয়ে গেল।
- অনিরুদ্ধ দুপুরবেলা ঝিলপাড়ে বটগাছের তলায় বসেছিল। তন্ময় হয়ে দেখছিল জলে ঢেউ-এর খেলা। কিন্তু হঠাৎই চোখ যেন আলোয় ধাঁধিয়ে উঠছিল। তখন ঢেউগুলোকে চকচকে লাগছিল।
- আনোয়ারা খালি বালতিটা যখন জল দিয়ে ভরতি করল তখন হঠাৎই বালতিটার উপর থেকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। বালতির গভীরতা যেন কমে গেছে মনে হচ্ছে।
- সুজাতা একদিন দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘুম আসছিল না। হঠাৎই দেখতে পেল ভেন্টিলেটর দিয়ে সূর্যের আলো উলটো দিকের দেয়ালে পড়ে কতগুলো গোল গোল আলোর চাকতি তৈরি করেছে। কিন্তু ওইরকম গোল গোল আকৃতি কেন?
- পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যুষ প্রতিদিন দেখে পুকুরে গাছের আর পুকুর পাড়ের বাড়িগুলোর কেমন সুন্দর ছবি পড়ে। পুকুরটা ঠিক যেন একটা আয়না।
- আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমি ভাবে ও যখন ওর ডান হাত নাড়ে তখন আয়নায় ওর ছবিটা একই রকমভাবে তার বাঁ-হাত নাড়ে কেন?
- একটা সোজা লাঠিকে লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল মৃণ্ময়। প্রতিদিন ওটার ওপর রোদ পড়ে। মৃণ্ময় প্রতিদিন ওর ছায়াটা লক্ষ করে। ছায়াটা কখনও ছোটো হয় কখনও বা বড়ো। কিন্তু মৃণ্ময় অবাক হয়ে দেখে, সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে, তখন লাঠির প্রায় কোনো ছায়াই পড়ে না।
- অরুণিমা একদিন জলভরতি বালতির মধ্যে একটা লাঠি ডুবিয়ে দেখে যে লাঠিটা যেন বাঁকা। কিন্তু যেই না লাঠিটাকে জলের ওপরে তুলল অমনি ওটা আবার সোজা হয়ে গেল।

এরকম কত ঘটনাই আমরা দেখি প্রতিদিন আমাদের চারপাশে। এসবই আলোর খেলা। আলো সম্বন্ধে জানলে, এসব ঘটনা কেন ঘটে তা বোঝা যায়। আমরা এখন সেটাই করব— জানব আলোর নানা কথা।

দিনেরবেলা আমরা ঘরের ভিতর সব কিছু দেখতে পাই—খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল সব কিছু। আর যখন রাত্রি নেমে আসে, ঘরের ভিতরের আলো নিভে যায়, চাঁদের আলো বা রাস্তার আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে না, তখন আমরা ঘরের ভিতরের কোনো জিনিসই দেখতে পাই না। আন্দাজে ঠাহর করে চলতে হয়। অথচ যদি একটা জোনাকি পোকা কোনোভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে সেটাকে দেখতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

এবার ভেবে বলো তো, জোনাকি পোকাটাকে তুমি দেখতে পেলে কেন?

অন্য জিনিসগুলোকে দিনেরবেলায় দেখতে পেলেও রাত্রিবেলায় অন্ধকারে দেখতে পাওনি কেন?

রাত্রিবেলাতেও যদি তুমি ওই জিনিসগুলোকে দেখতে চাও, তাহলে তোমার কী চাই?

তাহলে দেখা গেল কিছু কিছু বস্তু আছে যাদের নিজস্ব আলো আছে অর্থাৎ এই বস্তুগুলো থেকে নিজস্ব আলো নির্গত হয়। এই বস্তুগুলোকে **'স্বপ্রভ বস্তু'** বা **'আলোক উৎস'** বলে। যেমন - সূর্য, তারা, জোনাকি ইত্যাদি।

আবার যে বস্তুগুলোর নিজস্ব আলো নেই সেই বস্তুগুলোকে **'অপ্রভ বস্তু'** বলে। যেমন - ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি।

নীচের সারণিটা পূরণ করো। ঠিক স্থানে '✓' দাও।

বস্তু	স্বপ্রভ	অপ্রভ
কেরোসিন লম্ফ		
পেন		
জামার বোতাম		
মোমবাতি (জ্বলন্ত)		
জোনাকি		
ছাতা		
তারা		
চশমা		
সূর্য		
চাঁদ		

আলোর উৎস যদি আকারে খুব ছোটো হয়, আমরা অনেক সময় তাকে বিন্দু-উৎস বলি। একটি টর্চের আলোর সামনে কালো কার্ডবোর্ড রেখে ওই বোর্ডের গায়ে পিন দিয়ে একটি ছিদ্র করা হলো। ওই ছিদ্র দিয়ে যখন টর্চের আলো বেরিয়ে আসছে তখন ছিদ্রটিকে বিন্দু আলোকউৎস বলে ভাবা যেতে পারে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে জ্যামিতিতে আমরা বিন্দু বলতে যা বুঝি সেরকম অনেক বিন্দু মিলেই আসলে এইসব বিন্দু উৎসগুলো তৈরি। খুঁটিয়ে বিচার করলে তাই ওই কার্ডবোর্ডের ছিদ্র বিশুদ্ধ অর্থে বিন্দু-উৎস নয়।
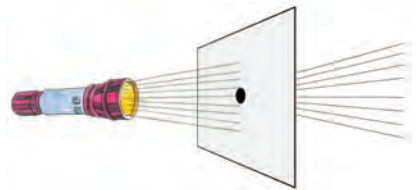
স্বপ্রভ বস্তু নিজে যেমন আলোর উৎস, তেমনি অপ্রভ বস্তুও আলোর উৎস হিসেবে আচরণ করতে পারে। কোনো স্বপ্রভ বস্তু থেকে আলো অপ্রভ বস্তুতে পড়লে ঠিকরে বেরোয়। যেমন স্টিলের বাসন একটি অপ্রভ বস্তু, কিন্তু তাতে সূর্যের আলো পড়ে সেই আলো ঠিকরে দেয়ালে যখন পড়ে তখন স্টিলের বাসনটিই আলোর উৎসের মতো আচরণ করে।
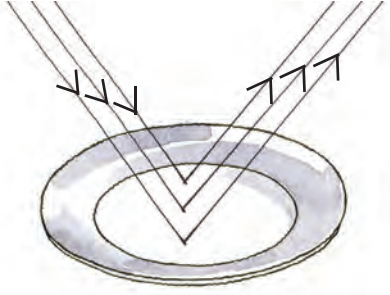
‘বিন্দু আলোক উৎসের’ চেয়ে আকারে বড়ো আলোক উৎসকে **‘বিস্তৃত আলোক উৎস’** বলে। যেমন - টর্চ, সূর্য, বৈদ্যুতিক বালব ইত্যাদি।

কাচের জানালা বন্ধ করে রাখলেও বাইরের রোদ তা দিয়ে ঘরে ঢোকে। কিন্তু কাঠের জানালায় তো তা হয় না। আলো সবরকম পদার্থের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। ভেবে দেখত, জলের মধ্যে দিয়ে কি আলো যেতে পারে? তুমি কি জল ভরতি পাত্রের তলদেশ বাইরে থেকে দেখতে পাও?

বায়ু,স্বচ্ছ কাচ, জল ইত্যাদি বস্তুগুলোকে **‘স্বচ্ছ বস্তু’** বা **‘স্বচ্ছ মাধ্যম’** বলে। এধরনের বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো সহজেই যাতায়াত করতে পারে। আবার, কাঠ, দেয়াল, লোহা ইত্যাদি যেসব বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো একেবারেই চলাচল করতে পারে না, তাদের **‘অস্বচ্ছ বস্তু’** বা **‘অস্বচ্ছ মাধ্যম’** বলে।

জানালা বন্ধ রয়েছে। জানালায় ঘষা কাচ লাগানো। জানালার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আবছা একটা মূর্তি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জানালা বন্ধ অবস্থায় যখন ওই কাচ দিয়ে ঘরে রোদ আসে, তখন হালকা, ফিকে হওয়া রোদ আসে। আসলে ঘষা কাচ, কুয়াশা, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো যাতায়াত করতে পারলেও, ভালোভাবে পারে না। তাই এই সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমকে বলে **‘ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু’ বা ‘ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম’।**

দরকারি কথা

কোনো মাধ্যম ছাড়াও আলো চলাচল করতে পারে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এক বিরাট অংশে কোনো মাধ্যম থাকে না। তবু প্রতিদিন সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়।

আলোর সরলরৈখিক গতি

হাতেকলমে 1

একটা শক্ত ও সোজা দু-মুখ খোলা পাইপ নাও।

এবার এক চোখ বন্ধ করে পাইপটার মধ্য দিয়ে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাকে দেখার চেষ্টা করো।

এবার একটা বাঁকা পাইপ নাও। পাইপটার মধ্য দিয়ে আগের মতো করেই শিখাটাকে দেখার চেষ্টা করো।

বাঁকানো পাইপের মধ্য দিয়ে মোমবাতির শিখাটাকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? **কেন এমন হলো ভাবত।**

কোনো বস্তুকে দেখতে হলে ওই বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়তে হবে। তবেই সেই বস্তুকে দেখা সম্ভব।

প্রথম ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।

তাহলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি মোমবাতির শিখা থেকে আসা আলো তোমার চোখ অবধি পৌঁছোতে পারেনি?

কেন পারল না? আলো কি তবে আসার পথে কোথাও বাধা পেয়েছে? কেনই বা বাধা পেল?

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের আলোর যাত্রাপথের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পাইপটা সোজা থাকায় আলো প্রথম ক্ষেত্রে শিখা থেকে চোখে পৌঁছোতে পেরেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাইপটা ছিল বাঁকা। আর তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলো চোখে এসে পৌঁছোতে পারেনি।

তাহলে বলা যায় ঃ

আলো সরলরেখায় চলাচল করে। এটা আলোর একটা ধর্ম।

আলোর আচার-আচরণকে বুঝতে আমরা জ্যামিতির চিত্রের সাহায্য নিই। আলোর যাত্রাপথকে ওই চিত্রে তির চিহ্ন যুক্ত সরলরেখার সাহায্যে বোঝানো হয়।

আলোর চলার পথকে তির চিহ্ন যুক্ত যে কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে বোঝানো হয়, তাকে **'আলোক রশ্মি'** (Ray of light) বলে। একটি আলোকরশ্মি বলে বাস্তবে কিছু নেই।

একসঙ্গে অসংখ্য আলোক রশ্মিকে, **'আলোক রশ্মিগুচ্ছ'** **(Beam of light)** বলে।

আলোক রশ্মিগুচ্ছ তিন ধরনের হয়।
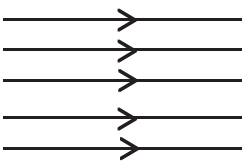
সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ
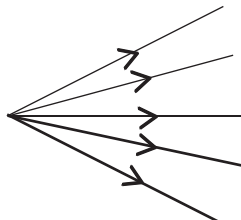
অপসারী আলোক রশ্মিগুচ্ছ
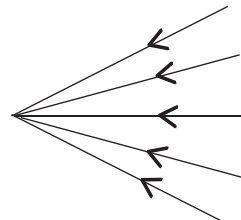
অভিসারী আলোক রশ্মিগুচ্ছ

প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তোমার ঘরে টিউবলাইট (অথবা আলোর অন্য কোনো উৎস) জ্বলছে। তুমি লাইটটার ঠিক উলটো দিকের দেয়ালের কাছে তোমার হাত রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে তোমার হাতের তালুর আকৃতি একটা অন্ধকার জায়গা গঠিত হলো। তোমার হাতের তুলনায় আকৃতিটা একটু বড়ো। ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলে দেখা যায়, ওই অন্ধকার আকৃতির মাঝখানের অংশ বেশ **গাঢ়**। আর ওই গাঢ় অন্ধকার অংশকে ঘিরে রয়েছে একটা আবছা অন্ধকার অংশ।
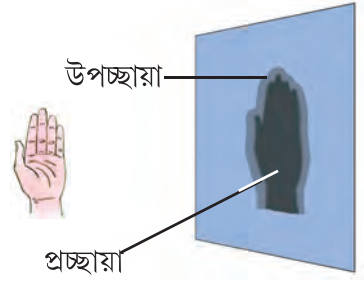
ওই গাঢ় অন্ধকার অংশটা হলো **ছায়া বা প্রচ্ছায়া**। আর প্রচ্ছায়াকে ঘিরে থাকা আবছা অন্ধকার অংশটা হলো **উপচ্ছায়া**।

তুমি হাতটা যত দেয়ালের কাছে নিচ্ছ, দেখবে ছায়া তত ছোটো হচ্ছে। আর উপচ্ছায়াও কমছে। যখন হাত দেয়ালের খুব কাছে, তখন উপচ্ছায়া একেবারেই নেই। শুধুই প্রচ্ছায়া।

আবার হাত যত দেয়াল থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছ, তুমি দেখবে ছায়ার অংশটা ক্রমেই ছোটো হচ্ছে আর উপচ্ছায়া ক্রমেই বড়ো হচ্ছে।
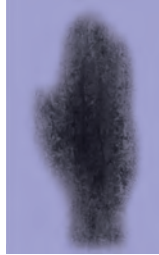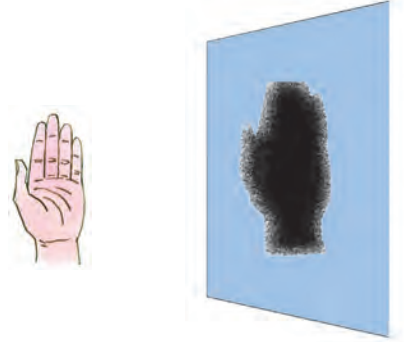
এবার টিউবলাইটটা নিভিয়ে দাও। বন্ধুকে বলো একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে তোমার হাতের পেছনে ধরতে (ছবিতে দেখো)।

(একটা কালো পিচবোর্ডের মাঝে পেরেক দিয়ে ফুটো করে মোমবাতির আলো ওই ফুটো দিয়ে পাঠাতে পারলে পরীক্ষাটা আরো ভালো হবে।)

কী দেখতে পেলে? দেয়ালে শুধুই তোমার হাতের ছায়া। উপচ্ছায়া অনুপস্থিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলোক উৎস বড়ো হলে প্রচ্ছায়া আর উপচ্ছায়া দুটোই গঠিত হয়। আবার উৎস যদি বিন্দু উৎস বা ছোটো উৎস হয় তখন উপচ্ছায়া গঠিত হয় না। শুধুই ছায়া গঠিত হয়।
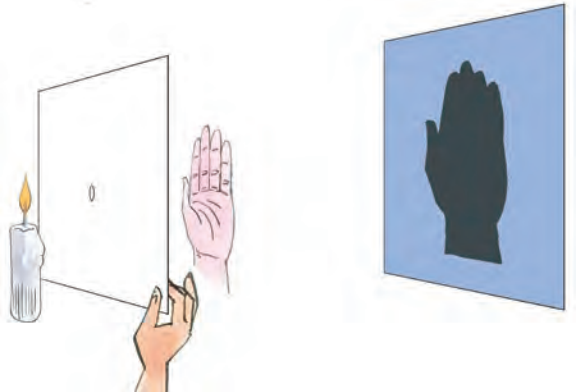
এবার হাতকে মোমবাতির কাছে নিয়ে যাও। কী দেখতে পাচ্ছ? ছায়া ক্রমশ বড়ো হতে থাকছে। হাত আবার আগের স্থানে নিয়ে এসো।
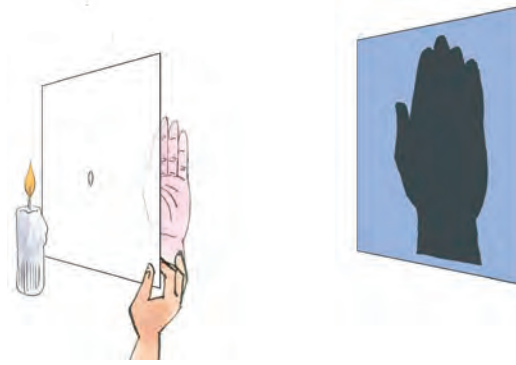
এবার, হাতকে দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতে থাকো। কী দেখছ? ছায়া ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। দেয়ালে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে ছায়ার দৈর্ঘ্য ও হাতের দৈর্ঘ্য সমান হয়ে গেল।
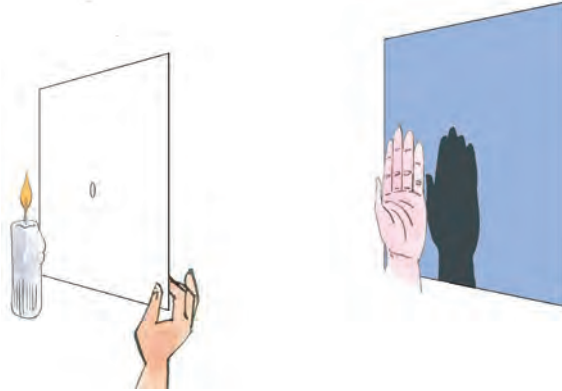
এবার মোমবাতিটা হাতের কাছ থেকে দূরে সরাতে থাকো। কী দেখতে পেলে? ছায়া ক্রমেই ছোটো হতে থাকছে। মোমবাতিকে আবার আগের স্থানে নিয়ে এসো।
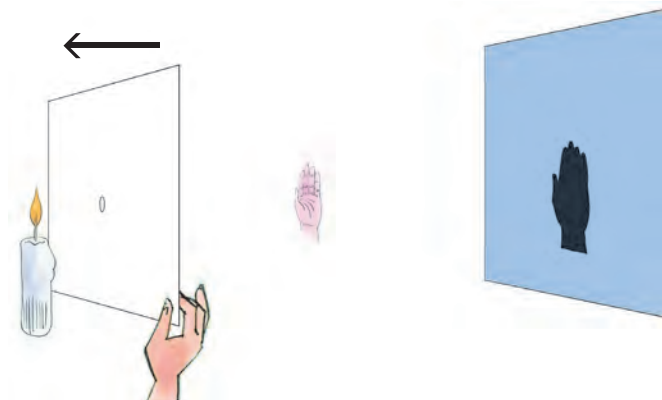
এখন, মোমবাতিটাকে হাতের কাছে আনতে থাকো। কী লক্ষ করছ? ছায়া ক্রমশ বড়ো হচ্ছে।
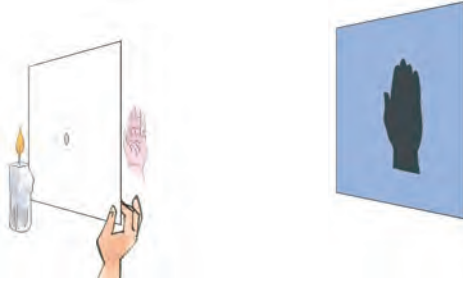
পরীক্ষাটা এবার ঘরের মাঝখানটায় করো। মোমবাতিটাকে টেবিলের কিনারায় বসাও। তার সামনে হাতটা ধরো। এবার বন্ধুকে বলো একটা বড়ো ক্যালেন্ডার উলটোপিঠ করে তোমার হাতের পিছনে একটু দূরে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্যালেন্ডারের ওপরে তোমার হাতের ছায়া গঠিত হবে। (চিত্র -1)
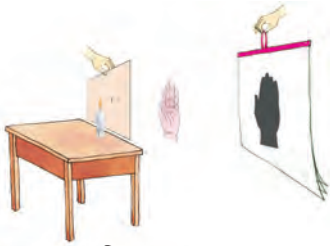
চিত্র -1

চিত্র -2

এবার, ক্যালেন্ডারটা হাতের কাছ থেকে দূরে সরাতে থাকো। কী দেখছ? ছায়াটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। (চিত্র -2) ক্যালেন্ডার আগের স্থানে নিয়ে এসো।

চিত্র -3

এখন ক্যালেন্ডারটা হাতের দিকে এগিয়ে আনতে থাকো। এবার দেখতে পাবে ছায়া ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। (চিত্র -3) ক্যালেন্ডার হাতকে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে হাতের দৈর্ঘ্য ও ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যাবে। (চিত্র -4)
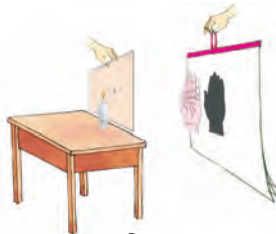
চিত্র -4

তোমরা জেনেছ আলো সরলরেখায় গমন করে। তাই আলোর চলার পথে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু ধরলে, আলো বাধা পায়। আর সামনে এগোতে পারে না। কিন্তু বাধা না পাওয়া আলো সরলরেখা ধরে সামনে এগিয়ে যায়। ফলে বস্তুটার পেছনে কোনো পর্দা ধরলে তাতে বস্তুটার আকৃতিবিশিষ্ট অন্ধকার অংশ গঠিত হয়।

তাহলে দেখা গেল আলো সরলরেখায় গমন করে বলেই বস্তুর **'ছায়া'** বা **'প্রচ্ছায়া'** গঠিত হয়।

বিস্তৃত আলোক উৎসের ক্ষেত্রে গঠিত হয় উপচ্ছায়া। এক্ষেত্রেও আলোর সরলরৈখিক গতিই দায়ী। আসলে, উপচ্ছায়া অংশে আলোক উৎসের কিছু অংশ থেকে আলো প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তাই সেখানে অন্ধকার গাঢ় হতে পারে না।
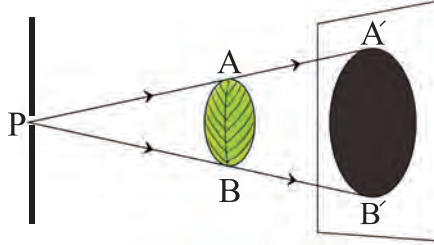
ছবিতে দেখো AB অস্বচ্ছ বস্তু। P -বিন্দু উৎস থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ AB-র ধার ঘেঁসে PAA′ ও PBB′ পথে পর্দায় গিয়ে পড়েছে। APB ফানেল আকৃতির অংশের কোনো আলোকরশ্মিই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ তারা AB- অস্বচ্ছ বস্তুতে বাধা পাচ্ছে। বাকি আলোক রশ্মিগুচ্ছ পর্দায় পৌঁছোতে কোনো বাধা পায়নি। ফলে তারা পর্দাকে আলোকিত করতে পেরেছে। ফলে পর্দার যে অংশ (A′B′) কোনো আলো পেল না তা অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অংশটা হলো বস্তুর ছায়া বা প্রচ্ছায়া।

এবার এসো একটা বিস্তৃত আলোক উৎস নেওয়া যাক।
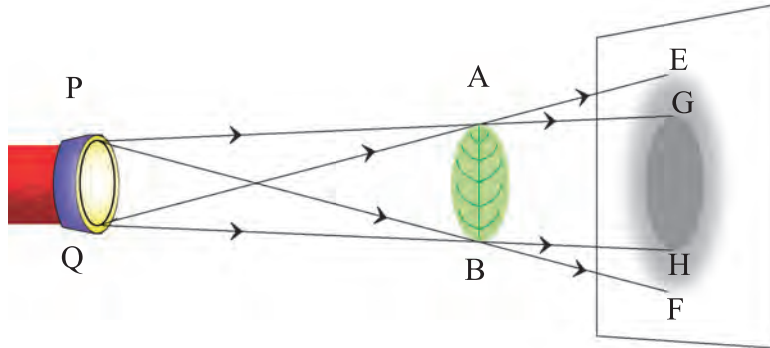
PQ বিস্তৃত আলোক উৎস। এই আলোক উৎসকে অসংখ্য বিন্দু আলোক উৎসের সমষ্টি ধরা যেতে পারে।

P বিন্দু থেকে আসা APB ফানেল আকৃতির অংশের আলোক রশ্মিগুচ্ছের কোনো অংশই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ তারা AB অস্বচ্ছ বস্তুতে বাধা পেয়েছে। তাই GF অংশে ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। আবার একইরকম ভাবে Q বিন্দু থেকে আসা AQB ফানেল আকৃতির অংশের আলোকরশ্মিগুচ্ছের কোনো অংশই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ AB -তে তারা বাধা পায়। ফলে EH অংশে অন্ধকার গঠিত হয়েছে।

কিন্তু GH অংশে PQ আলোক উৎসের থেকে আসা কোনো আলোক রশ্মিই পৌঁছোতে পারেনি। তাই ওই অংশে গাঢ় ছায়া তৈরি হয়েছে। আবার GE অংশে, আলোক উৎসের নীচের দিক থেকে কোনো আলোই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কিন্তু ওপরের অংশ থেকে আলো পৌঁছোতে পেরেছে। তাই GE অংশের অন্ধকার গাঢ় হতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটে FH অংশে। FH অংশে, আলোক উৎসের ওপরের অংশ থেকে কোনো আলো এসে পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কিন্তু নীচের অংশ থেকে আলো ওই অংশে আসতে পেরেছে। ফলে FH অংশও গাঢ় অন্ধকার হতে পারেনি।

তাই GE ও FH অংশে গঠিত হয়েছে উপচ্ছায়া। আর GH অংশে গঠিত হয়েছে প্রচ্ছায়া বা ছায়া।

সূচিছিদ্র ক্যামেরা

হাতেকলমে 2

ঘরের দেয়ালের কাছে একটা টেবিল নাও। ওই টেবিলের উপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি বসাও। একটা কার্ডবোর্ড নাও। একটা সরু পেরেক দিয়ে বোর্ডটার মাঝখানে একটা ছিদ্র করো। ঘর অন্ধকার করে দাও, মোমবাতির শিখা ও দেয়ালের মাঝে কার্ডবোর্ডটিকে ধরো। খেয়াল রাখো যেন কার্ডবোর্ডের ছিদ্রটা ও মোমবাতির শিখা একই উচ্চতায় থাকে।

এবার সামনের দেয়ালটা লক্ষ করো।

কী দেখতে পাচ্ছ?

দেয়ালে উলটানো মোমবাতির শিখার ছবি কী করে গঠিত হলো?

মোমবাতির শিখা থেকে চারদিকে আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু সব আলোকরশ্মি কার্ডবোর্ডের ছিদ্রটি দিয়ে যাচ্ছে না। P-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মোমবাতির শিখার নীচের দিকের A বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি AA' পথে দেয়ালের উপর A' বিন্দুতে পৌঁছোয়। একইভাবে শিখার ওপরের দিকের B বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি BB' পথে দেয়ালের উপর B' বিন্দুতে পৌঁছোয়। একইভাবে শিখার অন্যান্য বিন্দু থেকে আসা একটি করে রশ্মি ছিদ্র P-দিয়ে গিয়ে দেয়ালে পৌঁছোয়। ফলে দেয়ালের উপর AB শিখার উলটানো প্রতিকৃতি B'A' পাওয়া যায়। আলো সরলরেখায় চলাচল করে বলেই এটা হয়।
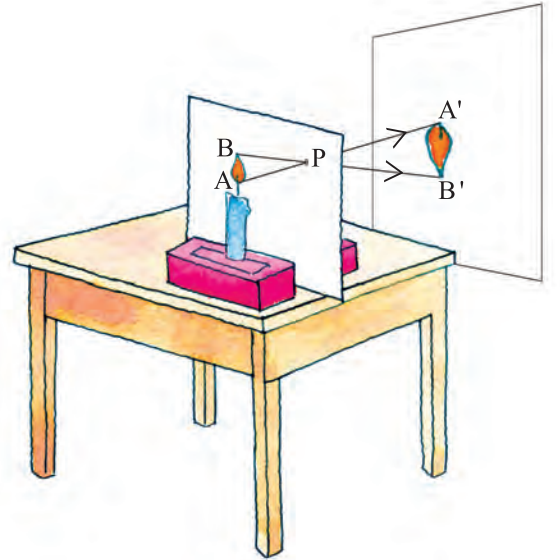
জুতোর বাক্সের মতো বড়ো একটি বাক্স নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনভাবে বাক্সটির একদিকের দেয়ালে সুচ বা সরু পেরেক দিয়ে একটি ছোট্ট ফুটো করো। বাক্সের ঠিক উলটো দিকের দেয়ালটি কেটে বাদ দিয়ে

সেখানে ট্রেসিং পেপার বা ঘষা কাচ দিয়ে একটি দেয়াল বানাও। এবার অন্ধকার ঘরে গিয়ে বাক্সের দেয়ালের ওই ফুটোর কাছে একটি মোমবাতির শিখা ধরো। দেখত উলটোদিকের ট্রেসিং পেপার বা ঘষা কাচের দেয়ালে মোমবাতির শিখার উলটানো প্রতিকৃতি দেখতে পাও কিনা। এই বাক্সটিই হলো তোমার সূচিছিদ্র ক্যামেরা। আগের পরীক্ষায় নেওয়া ছিদ্রসহ কার্ডবোর্ড ও দেয়াল মিলে একসঙ্গে ওই ক্যামেরা তৈরি হয়েছিল। আগের পরীক্ষায় তুমি মোমবাতি, কার্ডবোর্ড সরিয়ে ভালোভাবে লক্ষ করো। শিখাকে ছিদ্র থেকে যত দূরে সরাবে প্রতিকৃতি তত ছোটো হবে।
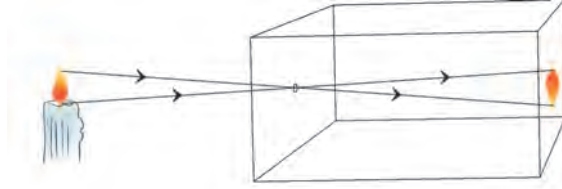
শিখাকে ছিদ্রের যত কাছে আনবে, প্রতিকৃতি তত বড়ো হবে।
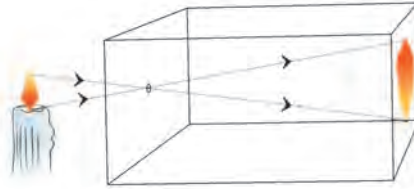
শিখা ও ছিদ্রের দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে, ছিদ্র থেকে পর্দার দূরত্ব (অর্থাৎ ক্যামেরার দৈর্ঘ্য) যত বাড়ানো হবে প্রতিকৃতি তত বড়ো হবে।
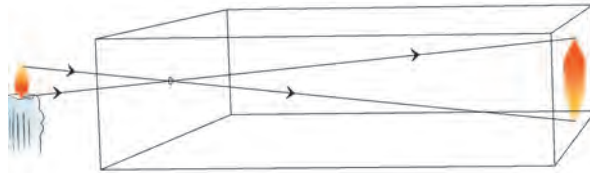
যদি ছিদ্র ও পর্দার দূরত্ব কমে, তবে প্রতিকৃতি ছোটো হয়ে যাবে।
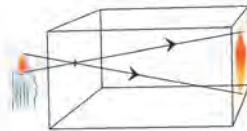
ছিদ্রকে বড়ো করে দেখো তো প্রতিকৃতির কিছু পরিবর্তন হয় কিনা?

আসলে, ছিদ্র বড়ো হলে তা অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্রের সমষ্টিরূপেই কাজ করে। প্রতিটি সূক্ষ্ম ছিদ্র একএকটি আলাদা আলাদা স্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি করে। ফলে সমস্ত প্রতিকৃতি মিলেমিশে একটা অস্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি হয়।

স্বাভাবিকভাবেই ছিদ্র যত ছোটো হবে, প্রতিকৃতি তত সূক্ষ্ম হবে।

সূচিছিদ্র ক্যামেরায় বস্তুর **প্রতিকৃতি** গঠিত হয় মাত্র, তা মোটেই **প্রতিবিম্ব** নয়। এই ক্যামেরায় ফিলম লাগিয়ে ছবি তুলতে অনেক সময় লাগে, কারণ অনেকক্ষণ আলোকে ভিতরে প্রবেশ করাতে হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, বড়ো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে মাটিতে গোল গোল অসংখ্য আলোর পটি তৈরি করে। ওগুলো আসলে সূর্যের প্রতিকৃতি বা ছবি।

কোন ক্যামেরায় সূর্যের এই ছবি উঠল বলো তো?

জানালা বা ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে ঘরের মেঝেতে বা দেয়ালে ওইরকম গোল গোল সূর্যের প্রতিকৃতি তৈরি করে।

এখানে ক্যামেরা কোনটি বলো তো?

একটা লাঠিকে লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখো। সারাদিন লাঠির ছায়াটাকে লক্ষ রাখো। এবার নীচের প্রশ্ন দুটোর উত্তর দাও।

লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য—

কখন সবচেয়ে ছোটো?

কখন সবচেয়ে বড়ো?

অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখো। বাতিটার সামনে একটা থালা কীভাবে ধরলে দেয়ালে নীচের আকৃতির ছায়া পাবে?
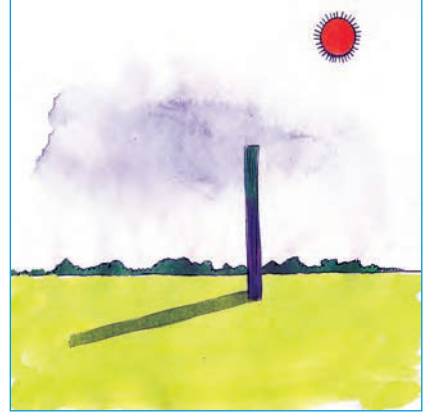
1) সম্পূর্ণ বৃত্তাকার 2) লম্বাটে গোল 3) একটা সরু দণ্ডের মতো।

অন্ধকার ঘরে, একটা টর্চ বা মোমবাতি জ্বালাও। এবার তার সামনে তোমার দু-হাতের তালু ও আঙুল নানাভাবে ধরো। এখন সামনের দেয়ালে তার ছায়াটিকে লক্ষ করো।
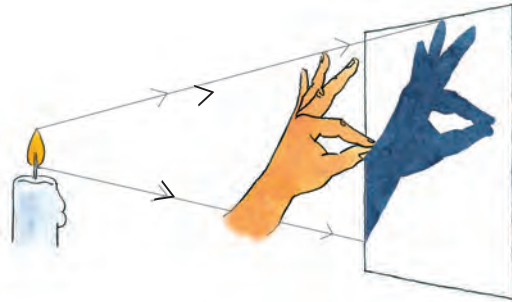
আলোর প্রতিফলন

হাতেকলমে 3

একটা ছোটো আয়না নাও। তোমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করা উজ্জ্বল রোদের মধ্যে আয়নাটাকে ধরো। এবার আয়নাটাকে খুব ধীরে ধীরে সামান্য একটু এদিক-ওদিক করে ঘোরাও।

দেয়ালে কী দেখতে পাচ্ছ? ওই দেয়ালটাতে আলো এল কোত্থেকে?

আয়নাটা সামান্য নাড়ালে দেয়ালের ওই আলোও নড়ে ওঠে কেন?

তাহলে কি সূর্যের আলো ওই আয়নাতে পড়ে ফিরে গিয়ে দেয়ালে পৌঁছেছে?

আয়নাতে পড়ে আলোর এই যে ফিরে আসা, এই ঘটনাকে বলে আলোর প্রতিফলন (Reflection of light)।

চলো একটা পরীক্ষা করা যাক:

একটা সাদা শক্ত কাগজে একটা সরলরেখাংশ XY নাও (ছবিতে দেখো)। এখন ওই রেখাংশে একটা চাঁদা বসিয়ে 0° থেকে 180° পর্যন্ত চিহ্নিত করো এবং 60° কোণটি আঁকো। (ছবি দেখো)।
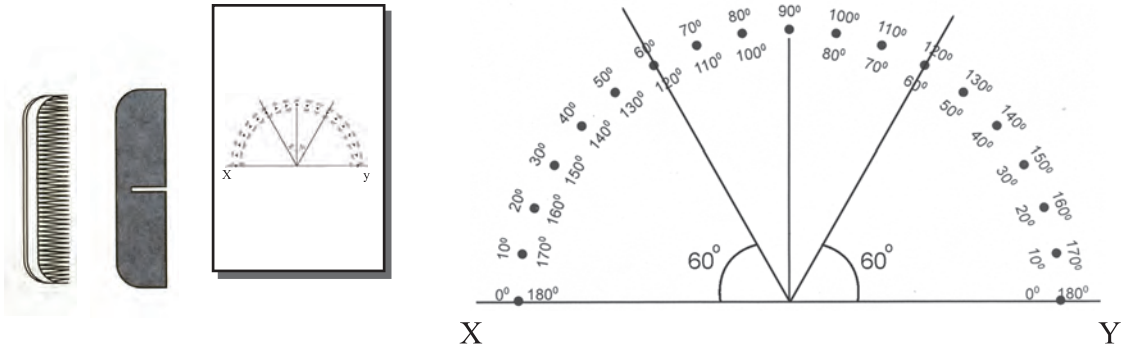
এবার কাগজটা টেবিলের ওপর পেতে দাও। একটা চিরুনি নাও, এবং ওই চিরুনির দাঁতগুলো কালো মোটা কাগজ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দাও যেন মাঝখানের একটামাত্র ফাঁক ঢাকা না পড়ে।

কাগজের উপর আঁকা সরলরেখা বরাবর একটা ছোট আয়না দাঁড় করাও। এমন একটি আয়না নিতে হবে যার চারদিকে কোনো ফ্রেম নেই।

এবার, চিরুনিটি কাগজের ওপর এমনভাবে দাঁড় করাও যাতে দাঁতগুলোর মাঝখানে ফাঁকা (না ঢাকা) জায়গাটি কোনো একটি কোণের (ধরি 60°) দাগের উপরে থাকে (ছবি দেখো)।

এবারে ঘর অন্ধকার করে সরু মুখওয়ালা টর্চটি জ্বালাও ও টর্চের আলো চিরুনির ওই ফাঁকা জায়গায় ফেলো। খেয়াল রাখো যাতে আলোর একটি রেখা চিরুনির ওপাশে আয়নার ওপর এমন জায়গায় পড়ে, যেখানে 90° চিহ্নিত রেখাটি আয়নাকে ছুঁয়েছে।
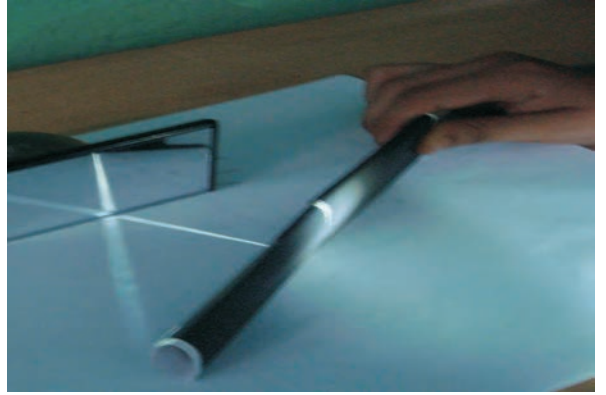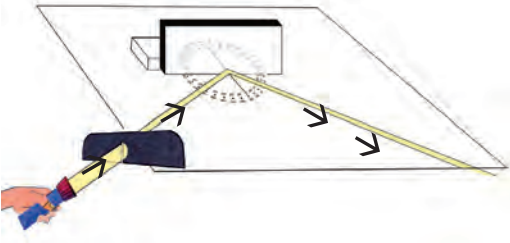
খেয়াল করে দেখো 60° (বা অন্য কোনো কোণ) করে আয়নায় পড়া আলো আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে উলটো দিকের 60° (বা অন্য কোনো কোণ) চিহ্নিত দাগের ওপর দিয়েই যাচ্ছে।

টেবিলে পাতা কাগজটা যদি উঁচুনীচু থাকে তাহলে আলোর রেখা কাগজের উপরে ভালোভাবে দেখা যাবে না। তাই সতর্ক থাকবে, যেন টেবিলে পাতা কাগজের তলে ঢেউ খেলানো না থাকে।

এবার, কাগজের উপর থেকে সব কিছু সরিয়ে দাও। একটা স্কেল দিয়ে আলোর আসার ও যাওয়ার পথ সরলরেখাংশ দিয়ে চিহ্নিত করো।
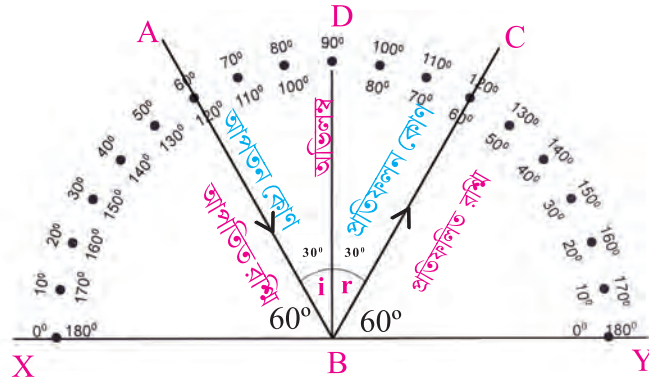
যে পথ ধরে আলো আয়নায় এসে পড়েছে তাকে **'আপতিত আলোকরশ্মি'** (Incident Ray) বলে (AB)।

আয়নায় পড়ে আলো যে পথ ধরে ফিরে যায় তাকে **'প্রতিফলিত আলোকরশ্মি'** (Reflected Ray) বলে (BC)।

আয়নার উপর যে বিন্দুতে আপতিত আলো এসে পড়েছে তাকে **আপতন বিন্দু** (Point of incidence) বলে (B)।

আয়নার অবস্থান যে সরলরেখাংশ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে (XY) তা **প্রতিফলক** (Reflector) বোঝাচ্ছে।

প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা লম্বকে (BD) **'অভিলম্ব'** (Normal) বলে।

অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মাঝের কোণকে **'আপতন কোণ'** (Angle of incidence, $\angle ABD = \angle i$) বলে। (এক্ষেত্রে $\angle i = 30^{0}$)

অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মাঝের কোণকে **'প্রতিফলন কোণ'** (Angle of reflection, $\angle CBD = \angle r$) বলে।

এবার ভালো করে দেখো তো আপতন ও প্রতিফলন কোণের মান, কোনটা কত?

উ: আপতন কোণ = 30^o

প্রতিফলন কোণ = ———— ^{o} [ফাঁকা স্থান পূরণ করো]

তাহলে বলা যায় আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের মান সমান হয়। — এটি প্রতিফলনের একটি নিয়ম।

এই পরীক্ষায় নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে কাগজের তলের ওপরেই আপতিত ও প্রতিফলিত আলোর রেখা অবস্থান করছে। কাগজে ঢেউ খেলানো থাকলে বা কোথাও উঁচুনীচু থাকলে রেখাগুলি কাগজে ভালোভাবে পড়ছে না।

তাহলে বলা যায়, আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। এটিও প্রতিফলনের অন্য একটি নিয়ম।

যখন মসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সেই প্রতিফলন হলো নিয়মিত প্রতিফলন (Regular Reflection of Light)। যেমন— আয়নায় প্রতিফলন, চকচকে স্টিলের মসৃণ বাটিতে প্রতিফলন।

সমতল দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতিত আলোর রশ্মিগুচ্ছ একটি বিশেষ ধরনের হলে প্রতিফলনের পরেও সেই রশ্মিগুচ্ছ ওই বিশেষ ধরনেরই হয় যেমন, সমান্তরাল বা অভিসারী বা অপসারী।

ধরো, তুমি অপসারী রশ্মিগুচ্ছ পাঠালে। প্রতিফলনের পর তা আয়না থেকে অপসারী হয়েই ফিরবে যদি আয়নাটি সমতল হয়। কিন্তু যদি আয়নাটির তল বক্র হয় তাহলে অবশ্য প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ অপসারী না হয়ে সমান্তরাল বা অভিসারীও হতে পারে। প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের ধরন কেমন হবে তা নির্ভর করে আয়নাটির বক্রতা কেমন তার ওপর।

যখন অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সেই প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection of light) বলে। যেমন — গাছপালা, মাটি, ঘরের দেয়াল, সিনেমার পর্দা ইত্যাদির উপর আলোর প্রতিফলন।
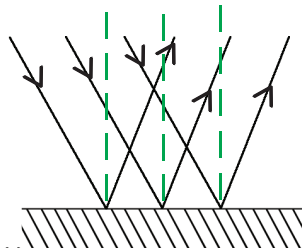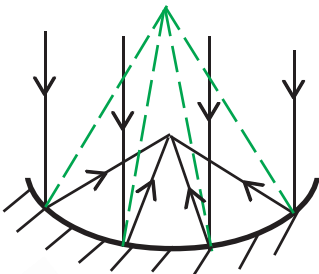
নিয়মিত প্রতিফলন

কোনো মসৃণ তলে প্রতিফলন সাধারণ ভাবে নিয়মিত প্রতিফলন। যেমন সমতল বা বক্রতল আয়নায় প্রতিফলন
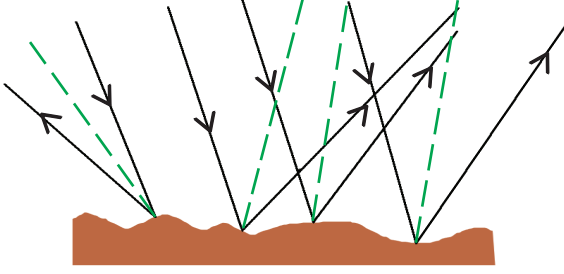
বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

এই প্রতিফলনে আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হলেও প্রতিফলনের পর তারা আর সমান্তরাল থাকে না। বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে দুই ক্ষেত্রেই প্রতিটি আলোকরশ্মি প্রতিফলনের দুটি সূত্রই মেনে চলে।

নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের কয়েকটি উদাহরণ খাতায় লিখে ফেলো।

আলোর প্রতিসরণ

হাতেকলমে 4

একটা কাচের গ্লাসে কিছুটা জল নাও। ওপর থেকে জলের যে তল দেখতে পাচ্ছ তা বায়ু ও জলকে আলাদা করেছে। জলের এই তল হলো **বায়ু ও জলের বিভেদ তল**। এবার ওই গ্লাসের মধ্যে ধীরে ধীরে গা চুঁইয়ে অল্প নীল কেরোসিন তেল নাও।

এবার গ্লাসের পাশ থেকে জলের ভিতর দিয়ে ওপরের দিকে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ?

যে নীলরঙের গোল তলটা দেখতে পাচ্ছ সেটা **‘কেরোসিন ও জলের বিভেদতল’**।

জল যেখানে শেষ হয়েছে আর কেরোসিন যেখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ দুই আলাদা আলাদা ঘনত্বের মাধ্যমের সংযোগস্থলে যে তল, তাকেই ওই মাধ্যম দুটোর ‘**বিভেদতল**’ বলে।

হাতেকলমে 5

নীচের পরীক্ষাটি তোমরা দেখবে, নিজে হাতে করবে না। তোমাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে করে দেখাবেন।

উপকরণ ঃ একটা কাচের ব্লক বা বুদবুদহীন নিরেট পেপারওয়েট বা কাচের ব্লক, একটা লেজার টর্চ, সাদা একটা পর্দা।
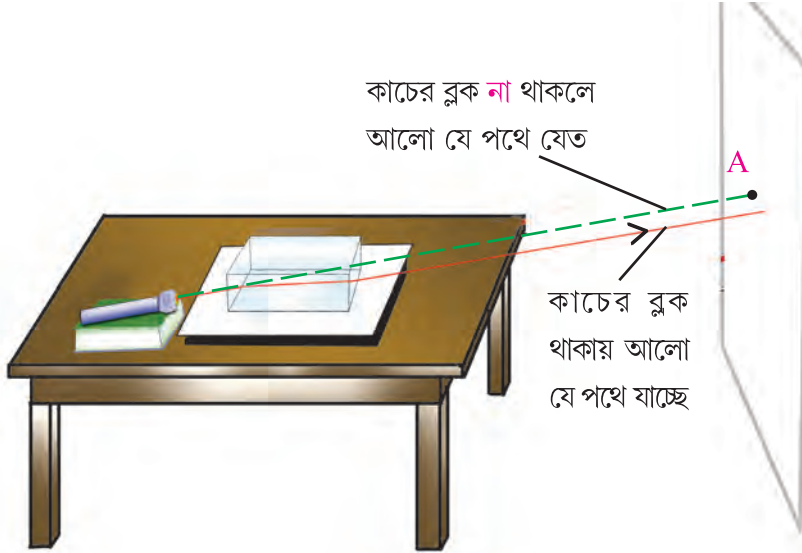
তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা লেজার টর্চটা জ্বালিয়ে দেয়ালের দিকে ধরলেন। ফলে দেয়ালে একটা আলোর বিন্দু তৈরি হলো। কিন্তু টর্চটা মাস্টারমশাই বা দিদিমণির হাতে থাকায় আলোক বিন্দুটা নড়ছে। তাই একটা টেবিলের ওপর টর্চটা রাখা হলো। এবার টর্চটা স্থির হলো। তাই আলোর বিন্দুটাও স্থির হলো। দেয়ালে বিন্দুটাকে 'A' লিখে চিহ্নিত করা হলো। এরপর কাচের ব্লক বা পেপারওয়েটটা ওই আলোর পথে ধরা হলো। আলো এবার কাচের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেয়ালে পড়েছে। এবার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখত আলোর বিন্দুটা দেয়ালে 'A' — চিহ্নিত জায়গাতেই পড়ল, না সরে গেল?

আলোক বিন্দুটা সরে গেল কেন? ভাবো।

তাহলে কি আলো তার গতিপথ পরিবর্তন করল? কেন করল? ভাবো।

এবার কাচের ব্লক বা পেপারওয়েট সরিয়ে দাও।

এবার কী দেখলে? আলোক বিন্দু কি আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেল?

তাহলে কি ওই কাচের ব্লক বা পেপারওয়েটটাই এজন্য দায়ী?

আলোকরশ্মি কোনো মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে যদি অন্য কোনো আলাদা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন ওই মাধ্যম দুটির বিভেদতল থেকে আলোর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।
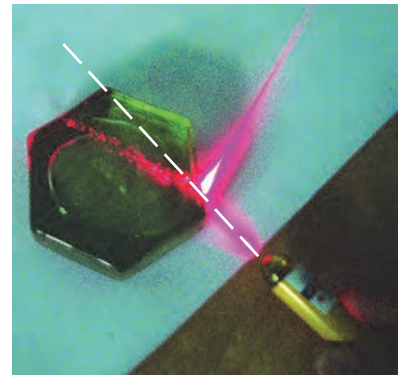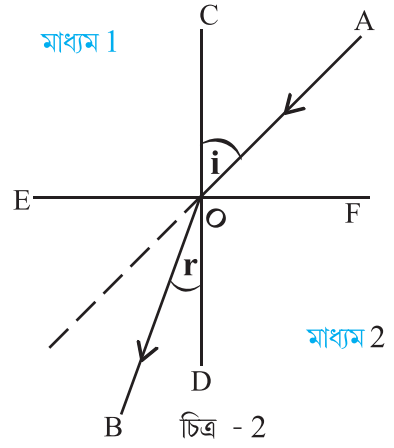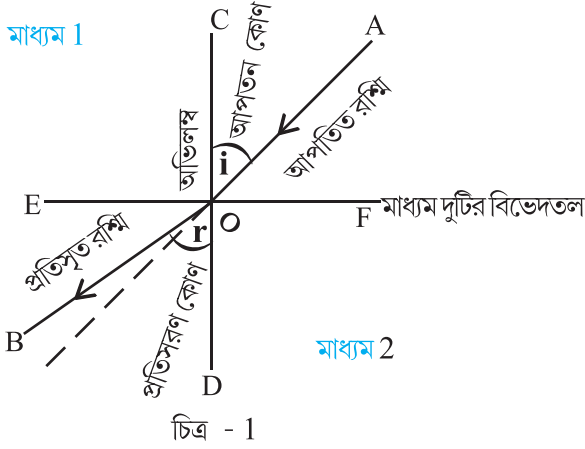
আলোর প্রতিসরণ

OB - প্রতিসৃত রশ্মি, ∠AOC -আপতন কোণ (i), ∠DOB -প্রতিসরণ কোণ (r), EOF -মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল, COD -অভিলম্ব।

চিত্র 1 -এ আলোকরশ্মি মাধ্যম 1 -থেকে মাধ্যম 2-তে প্রবেশ করেছে ও অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে। যে মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় সেই মাধ্যমটিকে আলোর ক্ষেত্রে লঘুতর মাধ্যম বলা হয়। এখানে মাধ্যম 2, মাধ্যম 1-এর চেয়ে লঘুতর।

চিত্র 2-এ আলোকরশ্মি মাধ্যম 2-তে প্রবেশ করার পর অভিলম্বের দিকে সরে গেছে। যে মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যায় সেই মাধ্যমকে আলোর ক্ষেত্রে ঘনতর মাধ্যম বলা হয়।

এক্ষেত্রে মাধ্যম 2, মাধ্যম 1-এর চেয়ে ঘনতর।

ধরা যাক, আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে দ্বিতীয় কোনো ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে যাত্রা করছে। দেখা যায় ওই আলোক রশ্মিগুচ্ছের কিছু অংশ মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল থেকে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাটাই **আলোর প্রতিফলন**।

আলোক রশ্মিগুচ্ছের বাকি অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশের পর আগেকার যাত্রাপথ থেকে সরে যায় ও নতুন সরলরেখা বরাবর চলে। এই ঘটনাকে বলে **আলোর প্রতিসরণ**।
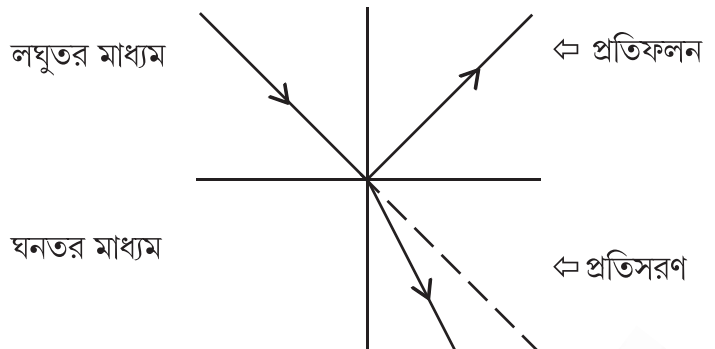
প্রতিবিম্ব

হাতেকলমে 6

একটা আয়নার সামনে একটু কোণ করে (ছবির মতো) একটা টর্চ ধরো।

এবার টর্চটা জ্বালাও।

কী দেখলে?

আয়নায় টর্চের আলোর প্রতিফলন ঘটে আলো যে দিকে বেরিয়ে এল, তোমার চোখকে সেদিকে নিয়ে যাও। এবার ওই দিক থেকে আয়নার মধ্যে তাকাও। **কী দেখতে পাচ্ছ?**

তোমার কি মনে হচ্ছে আলোটা আয়নার ভিতরে থাকা একটা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আলো আয়নার ভিতরে থাকা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আয়নার ভিতরে কোনো টর্চ আছে?

আয়নার ভিতরে যে টর্চটা তুমি দেখেছ, সেটা আসলে তোমার হাতে থাকা (আয়নার বাইরে) টর্চটার প্রতিবিম্ব। এই ঘটনাটা ঘটেছে আলোর প্রতিফলন ধর্মের জন্য।

যে-কোনো চকচকে তলের উপর বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মির প্রতিফলনের ফলে এমনই প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। বস্তুটি চকচকে তলটির যে দিকে থাকে, বস্তুর প্রতিবিম্ব ঠিক তার উলটোদিকে তৈরি হয়।

আলোকরশ্মির চিত্র এঁকে প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। P - বস্তু, P/ -প্রতিবিম্ব, MM/- আয়না।

যে -কোনো চকচকে তল — সানগ্লাসের কাচ, চকচকে পালিশ করা টেবিল, পুকুরের জল, জানালার গাঢ় রঙের চকচকে কাচ ইত্যাদির মধ্যে এমন প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া সম্ভব।
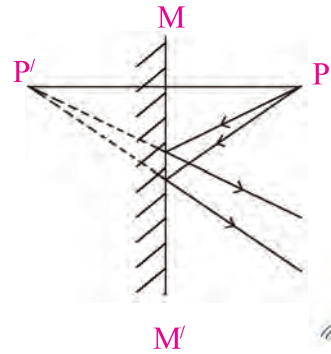
হাতেকলমে 7

তুমি একটা বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়াও। আয়নায় গঠিত হওয়া তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ করো।

তোমার আর তোমার প্রতিবিম্বের উচ্চতা কি এক?

এবার একটা পেন হাতে নিয়ে আয়নাটার উপর শুইয়ে দিয়ে, আঙুল দিয়ে চেপে ধরো।

এবার দেখত তোমার আঙুলে চাপা পেন (আয়নার বাইরে) আর আয়নার ভিতরকার পেনের প্রতিবিম্ব একেবারে সমান মাপের কিনা?

আয়নায় গঠিত **'প্রতিবিম্ব'**ও **'বস্তুর মাপ'** (Size) সমান।

এবার একটি আয়না থেকে তুমি ঠিক মেপে মেপে 'চার পা' পিছিয়ে এসে দাঁড়াও।

এবার এক পা এক পা করে আয়নার দিকে এগোতে থাকো, আর তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ রাখো।
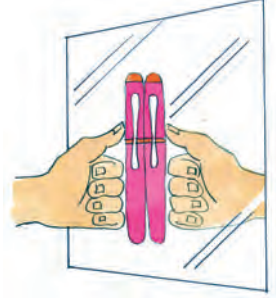
প্রতিবিম্বও কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে এক পা এক পা করেই তোমার দিকে এগোচ্ছে?

তুমি আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে যত দূরত্ব অতিক্রম করলে তোমার প্রতিবিম্বও কী আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে তত দূরত্বই অতিক্রম করল ?

তাহলে বলা যায়, **'বস্তু থেকে আয়না ও আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান'**।

তোমার ডান হাতটা দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করো।

—প্রতিবিম্ব কোন হাত দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করল?

তোমার বাঁ পা-টা একটু ওঠাও।

তোমার প্রতিবিম্বের কোন পা উঠল?

তবে বলা যায় **আয়নায় বস্তুর প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন হয়**। অর্থাৎ ডান দিকটা বাঁ দিক ও বাঁ দিকটা ডান দিক মনে হয়। কিন্তু উপরটা উপর দিকে এবং নীচেরটা নীচের দিকেই থাকে। অর্থাৎ আয়নায় গঠিত **প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ**।

আয়নায় প্রতিফলনের ফলে, A থেকে Z পর্যন্ত কোন কোন অক্ষরের প্রতিবিম্বের পার্শ্বপরিবর্তন হয় তা ভেবে লেখো।

AMBULANCE কথাটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে উলটে লেখা থাকে কেন? দলে আলোচনা করে উত্তর খাতায় লেখো।
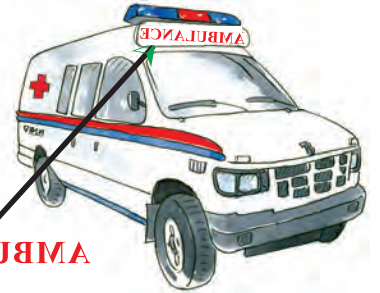
হাতেকলমে 8

একটা কাচের গ্লাসের মধ্যে একটা পেন বা সোজা কাঠি রাখো।

এবার গ্লাসটাতে কিছুটা জল ঢালো। পেন বা কাঠিটার কোনো অংশে কি কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ?

পরিবর্তন হলে সেটা কোন অংশে?

পেন বা কাঠিটার নীচের অংশ যেখান থেকে জলের ভেতরে আছে সেখান থেকে পেন বা কাঠিটাকে বাঁকা লাগছে কেন?

পেন বা কাঠিটাকে জল থেকে তুলে দেখো তো পেন বা কাঠিটা সত্যিই বেঁকেছে কিনা?

আসলে গ্লাসে জল ভরার পরই যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে, আবার জল থেকে পেন বা কাঠি তুলে নিলে পেন বা কাঠিটা যেহেতু সোজাই থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গ্লাসে জল ঢালাই এর কারণ।

আসলে গ্লাসে জল ঢালার পর গ্লাসের ভিতরে দুটো মাধ্যম থাকে। (1) জল (ঘনতর মাধ্যম) ও (2) বায়ু (লঘুতর মাধ্যম)।

পেন বা কাঠির জলের তলার অংশ থেকে আলো যখন জল (ঘনতর মাধ্যম) পেরিয়ে বায়ুতে (লঘুতর মাধ্যম) পৌঁছোয় তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতল থেকে আলো বেঁকে গিয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। তোমার চোখ তখন আসল পেন বা কাঠিটার নিমজ্জিত অংশ নয়, পেন বা কাঠির নিমজ্জিত অংশের প্রতিবিম্বটি দেখো। প্রতিসরণের জন্যও প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

হাতেকলমে 9

একটা খালি বালতি নাও। একটা পেনসিল দিয়ে বালতির ভিতরের দেয়ালে উপরের দিকে একটা দাগ দাও (ছবি দেখো)। এবার একটা সোজা লাঠি দিয়ে বালতির তলা থেকে ওই পেনসিলের দাগ অবধি মেপে লাঠির গায়েও একই উচ্চতায় পেনসিলের দাগ দাও। এরপর লাঠিটা তুলে নাও।

এবার বালতিতে ওই দাগ অবধি জল ঢালো। বালতির উপর থেকে তাকাও।

কী দেখছ? বালতিটার তল কিছুটা উপরে উঠে এসেছে বলে মনে হচ্ছে কি? বালতিটা কম গভীর লাগছে?
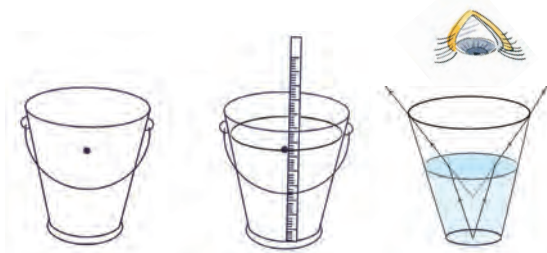
এবার জল থাকা অবস্থায় লাঠিটা দিয়ে বালতির দাগ অংশের উচ্চতা আবার মাপো।

কী দেখলে? কাঠির দাগের সঙ্গে বালতির দাগ মিলে যাচ্ছে। তবে বালতির তল কি সত্যি সত্যি উপরে উঠে আসেনি?

আসলে প্রতিসরণের জন্য এই ঘটনাটা ঘটেছে। বালতির তলদেশ থেকে আসা আলোক রশ্মিগুচ্ছ যখনই জল (ঘনতর মাধ্যম), পেরিয়ে বায়ুতে (লঘুতর মাধ্যম) প্রবেশ করে, সেইসময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল থেকে আলোক রশ্মিগুচ্ছ অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে বেঁকে যাওয়া প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ যখন তোমার চোখে এসে পড়ে তখন তুমি ওই তলের প্রতিবিম্বকে দেখো, যা প্রকৃত তলদেশের কিছুটা উপরে অবস্থান করছে বলে মনে হয়। তাই তোমার মনে হয়েছে তলটা উপরে উঠে এসেছে।

বর্ণালি

হাতেকলমে 10

জানালার ফাঁক দিয়ে তোমার ক্লাসরুমের মেঝেতে, যেখানে কড়া রোদ এসে পড়েছে, সেখানে একটা সাদা কাগজ বিছিয়ে দাও। এবার একটা প্রিজম নিয়ে ওই আলোর পথে সাদা কাগজটার কাছাকাছি ধরো।

কী দেখতে পাচ্ছ?

এত রং কোথা থেকে এল? ভালো করে দেখো কি কি রং তুমি ওই রঙিন আলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ।

সূর্যের আলো আসলে অনেক আলাদা রং-এর আলোর সমষ্টি। এধরনের আলোকে যৌগিক আলো বলে।

সূর্যের আলো কাচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই বিভিন্ন রং-এর আলো আলাদা হয়ে যায়। আমরা ওই রংগুলোর মধ্যে চোখে দেখে মোটামুটিভাবে সাতটা রং-এর আলো আলাদা করতে পারি। এই সাতটা আলাদা হওয়া আলোর পটিকে একসঙ্গে বলে **'বর্ণালি'**। আর যৌগিক আলো থেকে এইভাবে বিভিন্ন রং-এর আলোগুলোর আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে **বিচ্ছুরণ বলে**। 1666 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা এই সাতটা রং-এর আলোগুলো হলো—

1) বেগুনি (Violet)
2) নীল (Indigo)
3) আসমানি (Blue)
4) সবুজ (Green)
5) হলুদ (Yellow)
6) কমলা (Orange)
7) লাল (Red)

কিন্তু এই বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে বর্ণালির সাতটা রং-এর আলোর পটিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে না। তার কারণ হলো আলোর পটিগুলো একটার উপর আর একটা এসে পড়তে পারে। ফলে মাঝের বর্ণগুলো ভালোভাবে দেখা যায় না।

তুমি আকাশে কখনও রংধনু দেখেছ?

আকাশের **রংধনু** আসলে সূর্যের সাদা আলোর **বিচ্ছুরণের** প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র।

রংধনু সাধারণত বৃষ্টির পর বিকেলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকাশে ভাসমান জলকণা থাকে। ওই জলকণার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার সময় বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে যে সাতটা আলোর পটি গঠিত হয় সেটাই রংধনু।

অদৃশ্য আলোর ক্ষতিকারক প্রভাব

অতিবেগুনি রশ্মি : সূর্য থেকে যে আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে তার সবটুকু আমরা চোখে দেখতে পাই না, অদৃশ্য আলোও কিছু আছে। চোখে দেখতে না পেলেও অদৃশ্য আলো যে আছেই বিজ্ঞানীদের কাছে তার অনেক প্রমাণ আছে। অদৃশ্য আলোর একটা অংশ হলো অতিবেগুনি আলো, ইংরেজিতে আল্ট্রাভায়োলেটলাইট (ultraviolet light)। এর শক্তি দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক বেশি, তাই জীবন্ত কোশের পক্ষে অতিবেগুনি আলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সরাসরি চোখে পড়লে চোখের লেন্সের ক্ষতি হয়, চোখের মধ্যের যে আলোক সংবেদী স্তর (বা রেটিনা) আছে তারও ক্ষতি করে। এছাড়াও চামড়ায় সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি পড়লে চামড়ার ক্যানসারও হতে পারে। তাহলে জীবজগৎ সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে বাঁচবে কী করে? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরদিকে ওজোন গ্যাসের স্তর আছে। এই ওজোন স্তর সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মিকে আসতে বাধা দেয়। তা না হলে আমাদের খুবই বিপদ হতো।

ওজোন স্তর আছে বলে নিশ্চিন্ত হবার দিন আর নেই। মানুষের কর্মকাণ্ডে এমন সব গ্যাসীয় পদার্থ ওজোন স্তরে পৌঁছোচ্ছে যারা ওজোন অণুকে ভেঙে দেয়, বা তৈরি হতেও বাধা দেয়। এর ফলে ধীরে ধীরে ওজোন স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চামড়ার মেলানিন বলে একরকমের রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয়। চামড়ায় অতিবেগুনি রশ্মি এসে পড়লে তাকে শুষে নিয়ে মেলানিন আমাদের চামড়ার নীচের কোশগুলোকে বাঁচিয়ে দেয়। মেলানিন বেশি থাকলে চামড়া বাদামি বা কালো হয়ে যায়। লক্ষ করে দেখো, আফ্রিকা পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে, তাই সেখানে সূর্য রশ্মি খুব প্রখর। সেখানকার কালো মানুষদের চামড়ার মেলানিনের পরিমাণও তাই অনেক বেশি। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সাদা চামড়ার মানুষদের চামড়ায় কিন্তু মেলানিনের পরিমাণ অনেক কম। তাই সাদা চামড়ার মানুষদের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কোশের খুব দরকারি ডি.এন.এ অণুর (DNA) ক্ষতি হয়। ওজোন স্তর ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে চামড়ার ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

এক্স রশ্মি : তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে হাত ভাঙলে, বা পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেলে ডাক্তারবাবু ‘এক্স-রে’ করিয়ে আসতে বলেন। এক্স-রশ্মি (X-Ray) কী? ‘রে’ মানে রশ্মি বা আলো। এক্স রেও একরকমের অদৃশ্য আলো। এক্স-রশ্মি চামড়া আর মাংস ভেদ করে যেতে পারে। এক্স রশ্মি হাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে না তাই হাড়ের কোনখানটা ভেঙেছে বা ক্ষয়ে গেছে তা ছবি তুলে বোঝা যায়। এক্স-রশ্মিও কিন্তু দীর্ঘ ব্যবহারে ক্যানসার সৃষ্টি করে। এই কারণেই গর্ভস্থ শিশুর এক্স-রে করা উচিত নয়। যেসব কর্মী এক্স-রশ্মি মেশিন চালনা করেন উপযুক্ত সাবধানতা না নিলে তাঁদের ক্যানসার হতে দেখা যায়।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় আলোর ভূমিকা

টুকুন উঠোনের পাশে টবের মাটিতে কয়েকটা বীজ ফেলেছিল। দিন কয়েক পর লক্ষ করল বীজ থেকে একটা ছোটো চারা বেরিয়েছে। আর ক্রমশ ওই চারার ডগার দিকটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গা থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (ছবিতে লক্ষ করো আলো বামদিক থেকে আসছে আর গাছ সেদিকে বেঁকে যাচ্ছে)।

আলো ছাড়া গাছের খাদ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। অন্ধকারে উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না। ইটের নীচে বেশ কয়েকদিন চাপা পড়লে ঘাসগুলোর রং পরিবর্তন হয়। বেশিদিন চাপা পড়ে থাকলে মরেও যায়। উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গগুলো আলোকশক্তি শোষণ করে তাকে খাদ্যের শক্তি পরিণত করে। তারপর ওই খাদ্য ভেঙে পাওয়া শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদের নানা অঙ্গে সাড়া জাগে।

কেমন এই সাড়া এসো দেখা যাক।

বিভিন্ন দেশে শীত ও গরমকালে দিনের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে। এজন্য গরমকাল আর শীতকালে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফোটে।

গরমকালে ফোটে এমন কয়েকটি ফুলের নাম লেখো ।

শীতকালে ফোটে এমন কয়েকটি ফুলের নাম লেখো ।

টুকরো কথা

গম, ভুট্টা, পালং ও মুলোগাছে দিনের দৈর্ঘ্য 12 ঘন্টার বেশি হলে তবে ফুল ফোটে। আবার চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, আখ ও আলুগাছে দিনের দৈর্ঘ্য 12 ঘন্টার কম হলে তবে ফুল ফোটে। আর টম্যাটো, সূর্যমুখী গাছের ফুল ফোটা দিনের দৈর্ঘ্যের কমা-বাড়ার ওপর নির্ভরশীল ।

তোমার জানা দুটি করে গাছের নাম লেখো যাদের ফুল ফোটার জন্য —

12 ঘন্টার বেশি আলোর প্রয়োজন হয়।

12 ঘন্টার কম আলোর প্রয়োজন হয়।

প্রাণীজগতেও আলোর নানা প্রভাব দেখা যায়। আলো কম পেলে স্যামন মাছের বাচ্চারা মরে যায়। সূর্যের আলো কম পেলে গিরগিটি, সাপ ও আরো কত প্রাণী (ছুঁচো, ভালুক, ব্যাং) শীতঘুমে চলে যায়। ডানদিকের নীচের ছবিতে এক ধরনের ব্যাং কীভাবে নিজের পুরো দেহকে লুকিয়ে ফেলেছে দেখো। গুহাবাসী অনেক প্রাণীকে আলোতে আনলে তাদের চামড়ায় রঙিন পদার্থ তৈরি হতে শুরু হয়। সূর্য যখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে তখন পঙ্গপালের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো প্রাণী খোলস ছাড়া বা চামড়ার নীচে ফ্যাট জমা হওয়ার প্রক্রিয়াও আলোর প্রভাবে ঘটে। পরিযায়ী পাখিদের খুব শীতের জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় উড়ে যাওয়া সূর্যের আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে। জোনাকির মতো অনেক প্রাণী আবার আলো তৈরি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

এবার শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের প্রভাবগুলির উদাহরণ তোমার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন জীব থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো। (মাছ, পিঁপড়ে, পাখি, আরশোলা, ব্যাং, কেঁচো বা তোমার পরিচিত প্রাণী।)

আলোর প্রভাবে জীবের চলাফেরা।

আলোর প্রভাবে জীবের ডিম পাড়া।

আলোর প্রভাবে জীবের চোখের রং পরিবর্তিত হওয়া।

আলোর প্রভাবে জীবের চামড়ার রং বদলে যাওয়া।

চুম্বক

চুম্বকের বিভিন্ন ধর্ম

হাতেকলমে-1

উপকরণঃ একটা ইরেজার, একটা লোহার পেরেক, একটা প্লাস্টিকের স্কেল, একটা কাঠ পেনসিল, একটা পেনসিল কম্পাস, একটা এক টাকার কয়েন, একটা গাছের পাতা, একটা স্টেইনলেস স্টিলের চামচ, একটা ব্লেড, একটা কাচের গ্লাস ও একটা চুম্বক।
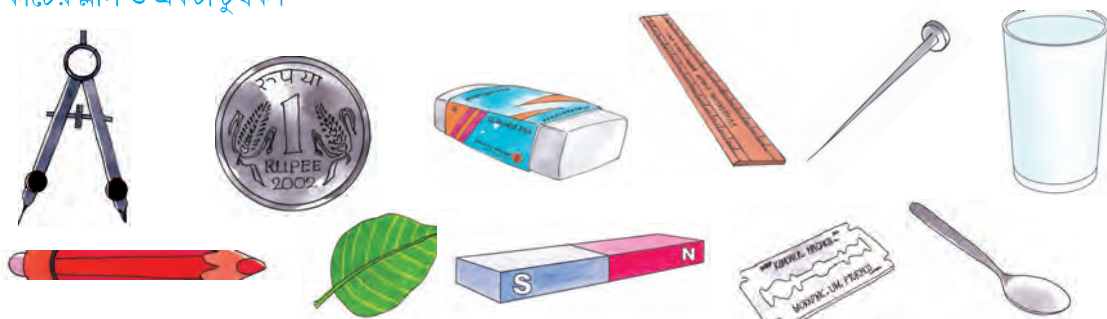
একটা কাঠের টেবিলের উপরে সবকটা উপকরণ রাখো। শুধু দণ্ড চুম্বকটা তোমার হাতে নাও। এবার দণ্ড চুম্বকটাকে টেবিলের উপর রাখা প্রতিটি জিনিসের কাছে নিয়ে যাও।

দণ্ড চুম্বক ঃ দণ্ড চুম্বক হলো একটা আয়তঘনাকার চুম্বকিত ইস্পাতের দন্ড। এই চুম্বক এক প্রকার কৃত্রিম চুম্বক।

খেয়াল করো, চুম্বকটা কোন কোন জিনিসকে আকর্ষণ করছে, আর কোন কোন জিনিসকে আকর্ষণ করছে না। এরপর নীচের সারণিটাকে পূরণ করো।

নাম	উপযুক্ত স্থানে '✓' চিহ্ন দাও		জিনিসগুলো যে উপাদানে তৈরি সেই উপাদানের নাম
	চুম্বক আকর্ষণ করছে	চুম্বক আকর্ষণ করছে না	
ইরেজার			
লোহার পেরেক			
প্লাস্টিক স্কেল			
কাঠ পেনসিল			
পেনসিল কম্পাস			
টাকার কয়েন			
গাছের পাতা			
স্টিলের চামচ			
ব্লেড			
কাচের গ্লাস			

চুম্বক যে যে পদার্থকে আকর্ষণ করে তাদের ‘চৌম্বক পদার্থ’ বলে। এদের বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

যেমন ঃ লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, কোনো কোনো ধরনের ইস্পাত ইত্যাদি।

যে যে পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে না তাদের ‘অচৌম্বক পদার্থ’ বলে।

যেমন ঃ প্লাস্টিক , রবার, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি।

একটা গল্প আছে। প্রায় 2500 বছর আগে ম্যাগনেস (Magnes) নামে এক মেষপালক পাহাড়ের কোলে এক তৃণভূমিতে মেষ পালন করছিল। হঠাৎ তার পায়ের জুতোয় একটা টান অনুভব করল। আসলে জুতোয় ছিল লোহার পেরেক। পেরেকটাকে একটা পাথর আকর্ষণ করার ফলেই ঘটনাটা ঘটেছিল। পরে জানা গেল, পাথরটা সব লোহাকেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

ম্যাগনেসিয়া নামক অঞ্চলে এরকম প্রচুর পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। চুম্বকের ইংরাজি নাম ম্যাগনেট (Magnet) হওয়ার এটাই কারণ। এই পাথরের নাম হলো ‘ম্যাগনেটাইট’। একে ‘প্রাকৃতিক চুম্বক’ বলে।

তাহলে জানা গেল, চুম্বক দুরকমের।

চুম্বক

প্রাকৃতিক চুম্বক বা ম্যাগনেটাইট	কৃত্রিম চুম্বক
এই চুম্বক প্রকৃতিতে পাওয়া যায় বলে একে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। এই চুম্বক সহজে বাজারে কিনতে পাবে না। যেসব জায়গায় এই খনিজ দ্রব্যের খনি আছে সেখানেই শুধু এই পাথর পাওয়া সম্ভব।	চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করে এই চুম্বক তৈরি করা হয়।
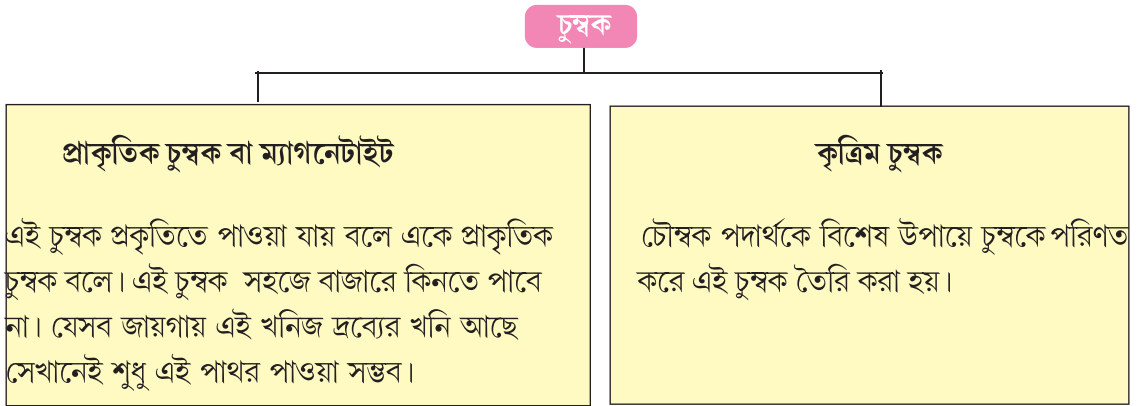
হাতেকলমে 2

একটা দণ্ড চুম্বক নাও। মেঝের উপর চক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটা সরলরেখাংশ আঁকো। এবার ওই রেখাংশের উত্তর প্রান্তে N ও দক্ষিণ প্রান্তে S লেখো।

এবার ছবির মতো করে SN রেখা বরাবর দণ্ড চুম্বকটাকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দাও। কাছাকাছি অন্য কোনো চুম্বক বা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এমন বস্তু যেন না থাকে।

এবার চুম্বকটাকে একটু নাড়িয়ে ছেড়ে দাও। অবশেষে চুম্বক যখন সাম্যাবস্থায় এল-

তুমি কী দেখতে পেলে ?
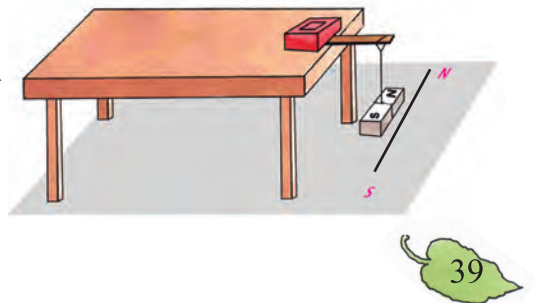
চুম্বকটা কি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে রয়েছে?

চুম্বকটাকে আবার একটু নাড়িয়ে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও।

এবার কী দেখতে পাচ্ছ?

প্রতিবারই কি চুম্বকটা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে?

তাহলে জানা গেল, চুম্বককে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলে তা সর্বদা 'উত্তর-দক্ষিণ' মুখ করে থাকে।

এবার ওই চুম্বকটাকে একটা থার্মোকলের টুকরোর উপর বসাও এবং থার্মোকলের টুকরোটা একটা প্লাস্টিকের জলভরা পাত্রে ভাসিয়ে দাও। জল স্থির হলে এবং চুম্বকসহ থার্মোকল সাম্য অবস্থায় এলে, চুম্বক কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ করো।

এবার চুম্বকসহ থার্মোকলকে আস্তে করে ঘুরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দাও। সাম্য অবস্থায় এলে লক্ষ করো চুম্বকটা কোন দিকে মুখ করে আছে।

স্বাধীনভাবে ভাসমান বা ঝুলন্ত চুম্বকের এই উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকার ধর্মকে চুম্বকের **দিক-নির্দেশক ধর্ম** বলে।

চুম্বক সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য এক ধরনের খুব দরকারি চুম্বক পাওয়া যায়। এধরনের চুম্বককে 'চুম্বক শলাকা' বলে। চুম্বক শলাকা হলো আসলে একটা ছোট্ট হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। দু-প্রান্ত সুচোলো এই চুম্বক একটা খাড়া দণ্ডের ওপর মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছোট্ট কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে। এই চুম্বক নানা মাপেও পাওয়া যায়।
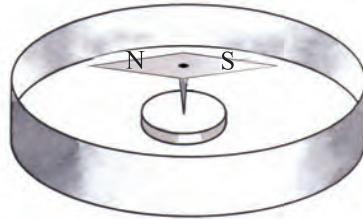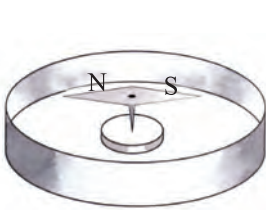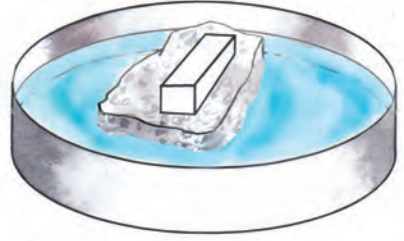
হাতেকলমে 3

একটা লম্বা দণ্ড চুম্বক, কিছুটা লোহাচুর, একটা সাদা কাগজ নাও।

কাঠের টেবিলের উপর সাদা কাগজটা পাতো। এবার লোহাচুরগুলো সাদা কাগজের ওপর রাখো।

এখন চুম্বকটার সারা গায়ে লোহাচুরগুলো মাখাতে চেষ্টা করো।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লোহাচুরগুলো কী চুম্বকের সব জায়গায় সমানভাবে আটকাচ্ছে?

চুম্বকের কোন জায়গায় লোহাচুর সবচেয়ে বেশি আটকেছে?

চুম্বকের কোন জায়গায় লোহাচুর সবচাইতে কম আটকেছে?
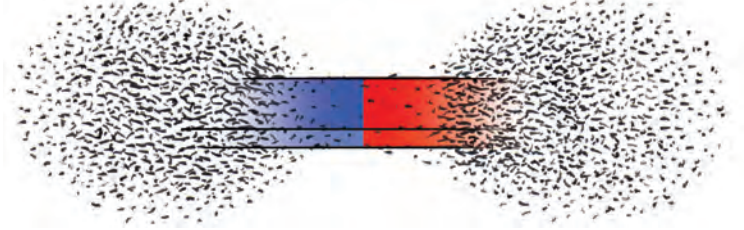
উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় সবচেয়ে বেশি বলে তোমার মনে হয়? চুম্বকের কোন জায়গায় আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম বলে তোমার মনে হয়?

জেনে রাখা দরকার

চুম্বকের দুই প্রান্তে যে দুই অঞ্চলে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, সেই দুই অঞ্চলকে চুম্বকের **'মেরু'** বলে। এই মেরু দুটিকে দুটি বিন্দু হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

চুম্বকের ঠিক মাঝখানে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ওই অঞ্চলকে চুম্বকের উদাসীন অঞ্চল বলে।

হাতেকলমে 4

একটা দণ্ড চুম্বক, দুটো চুম্বক শলাকা, একটা পেনসিল ও একটা সাদা কাগজ নাও। সাদা কাগজটা একটা টেবিলের উপর আটকে দাও। এবার দণ্ড চুম্বকটা কাগজের উপর রাখো। এরপর দণ্ড চুম্বকের N-মেরুর দুই কোণ বরাবর ছবির মতো করে চুম্বক শলাকা দুটি রাখো।
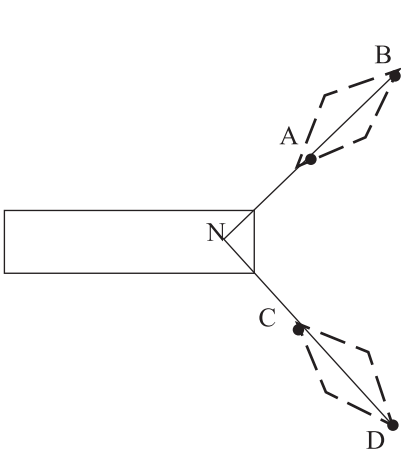
এখন পেনসিল দিয়ে দণ্ড চুম্বকটির ধার ঘেঁষে দাগ কাটো। তারপর চুম্বক শলাকাদুটোর দুই প্রান্তবিন্দুর অবস্থান পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজটায় বিন্দু এঁকে চিহ্নিত করো। বিন্দুগুলিকে A,B ও C,D নাম দাও।

এবার BA ও DC যুক্ত করে বাড়িয়ে দাও। ওই সরল রেখাংশ দুটো যে বিন্দুতে (N) ছেদ করল, সেই বিন্দুটাই জ্যামিতিক ভাবে দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর অবস্থান।
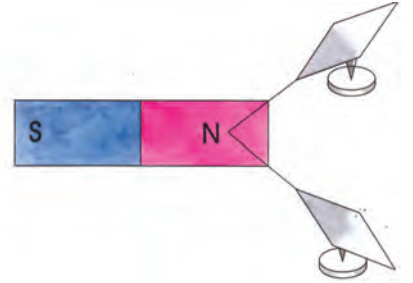
এরকম করে তুমি চুম্বকটার দক্ষিণ মেরুর অবস্থান নির্ণয় করো। চুম্বকের মেরুবিন্দু দুটি আসলে চুম্বকের দুই প্রান্তদেশের কাছাকাছি চুম্বকের ভেতরে অবস্থান করে।
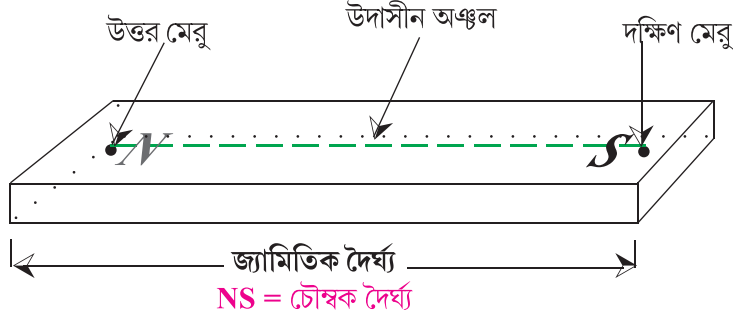
চুম্বকের এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে **চৌম্বক দূরত্ব** বলে। এই দৈর্ঘ্য চুম্বকের **জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের 0.86 গুণ**।

অর্থাৎ **চৌম্বক দৈর্ঘ্য = চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য × 0.86**।

অবাধে ঝুলন্ত বা ভাসমান অবস্থায় চুম্বকের যে মেরু মোটামুটি উত্তর দিকে মুখ করে থাকে তাকে **উত্তর সন্ধানী মেরু বা উত্তর মেরু** (N) বলে। আর যে মেরু মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে তাকে **দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু** (S) বলে।

চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যোগ করলে যে সরলরেখাংশ (NS) পাওয়া যায় তাকে **চৌম্বক অক্ষ** বলে।

একটা চুম্বকের চারধারে যে স্থান জুড়ে ওই চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম কাজ করে তাকে ওই চুম্বকের **চৌম্বক ক্ষেত্র** বলে।

হাতেকলমে 5

ছবির মতো করে বা অন্য কোনোভাবে সুতো দিয়ে একটা দণ্ড চুম্বককে ঝুলিয়ে দাও। খেয়াল রাখো যেন আশেপাশে কোনো চৌম্বক পদার্থ বা চুম্বক না থাকে।
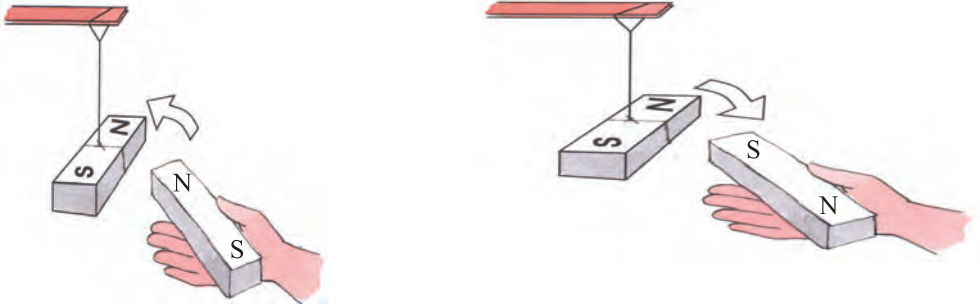
চুম্বকটাকে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও। এবার অন্য একটা দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু (N) ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরুর (N)- এর কাছে নিয়ে যাও।

কী দেখতে পেলে?

ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরু সরে গেল কেন?

তাহলে কী ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরুর উপর কেউ 'বল' প্রয়োগ করেছে?

এই বল কোথা থেকে প্রযুক্ত হলো?

কাছাকাছি দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরু ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। তবে কি দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরুই এই বল প্রয়োগ করেছে?

তাহলে বোঝা গেল, একটা চুম্বকের উত্তর মেরু অপর চুম্বকের উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ করে।

এবার সাম্য অবস্থায় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর (S) কাছে হাতের চুম্বকের দক্ষিণ (S) মেরুটাকে ধরো।

এক্ষেত্রে কী দেখতে পেলে? এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

অতএব বোঝা গেল চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ S-মেরু, S-মেরুকে এবং N-মেরু, N মেরুকে বিকর্ষণ করে।
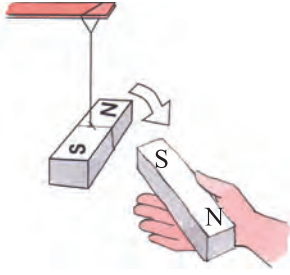
এবার ঝুলন্ত চুম্বকের N মেরুর কাছে, দ্বিতীয় **চুম্বকের** S-মেরু নিয়ে যাও।

কী দেখতে পাচ্ছ?

ঝুলন্ত চুম্বকের S মেরু তোমার হাতের চুম্বকের N মেরুর কাছে সরে এল কেন?

এই দুই বিপরীত মেরুর (N ও S) মধ্যে কোনো ধরনের বল কাজ করছে কি? (আকর্ষণ বল না বিকর্ষণ বল?)

এবার হাতের দণ্ড চুম্বকের N মেরু সাম্য অবস্থায় ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের S মেরুর কাছে ধরো।

এখন কী দেখতে পেলে?

এবারেও কি পরস্পর দুই বিপরীত মেরু (N ও S) পরস্পরকে আকর্ষণ করল?

অতএব জানা গেল চুম্বকের বিপরীত মেরু (N ও S) পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
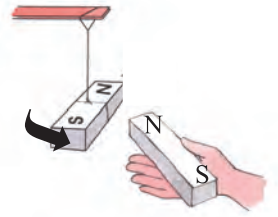
ঝুলন্ত চুম্বকটির কাছে অন্য চুম্বকের বিপরীত মেরু নিয়ে আসায় আকর্ষণ হলো। যদি কোনো একটি লোহার দণ্ড বা স্টিলের দণ্ড আনা হতো তাহলেও তো আকর্ষণই হতো। তাহলে আকর্ষণ হচ্ছে দেখে কি জোর দিয়ে বলা যাবে যে দ্বিতীয় বস্তুটিও চুম্বক?

এবার ভেবে দেখো যদি বিকর্ষণ হতো তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটির বিষয়ে তুমি কী বলতে? চুম্বক, না লোহা বা স্টিলের দণ্ড?

কোনো বস্তু চুম্বক কিনা তা জানতে আকর্ষণ, না বিকর্ষণ কোনটি বেশি নির্ভরযোগ্য বলে তোমার মনে হয়?

হাতেকলমে 6
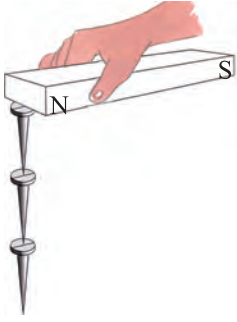
একটা শক্তিশালী দণ্ড চুম্বক, একটা লোহার দণ্ড, কয়েকটা ছোটো লোহার পেরেক আর একটা চুম্বক শলাকা নাও।

একটা লোহার পেরেক আর একটা পেরেকের সঙ্গে স্পর্শ করো।

কী দেখতে পেলে?

ওই পেরেক কি অন্য পেরেককে আকর্ষণ করল?

এবার ছবির মতো করে দণ্ড চুম্বকটাকে ধরো। এবার যে-কোনো মেরু, ধরা যাক 'N' মেরুর নীচে একটা লোহার পেরেক স্পর্শ করে ছেড়ে দাও। পেরেকটা দণ্ড চুম্বকের সঙ্গে আটকে যাবে।

এখন আর একটা পেরেক প্রথম পেরেকটার তলায় স্পর্শ করে ছেড়ে দাও।

এবার কী দেখতে পাচ্ছ?

দ্বিতীয় পেরেকটা প্রথম পেরেকটার তলায় স্পর্শ করে ঝুলছে কেন? কেন পড়ে যাচ্ছে না?

তবে কী প্রথম পেরেকটা দ্বিতীয় পেরেকটাকে আকর্ষণ করছে? কেন?

এভাবে আর কয়েকটা পেরেক নিয়ে দেখো তো একটা পেরেকের চেন তৈরি করতে পারো কিনা।

এবার খুব সাবধানে অন্য হাত দিয়ে প্রথম পেরেকটাকে ধরো (সাবধানে, যাতে নাড়াচাড়ায় পেরেকের চেন থেকে পেরেক খসে না পড়ে)। এখন আস্তে করে দণ্ড চুম্বকটাকে সরিয়ে নাও।

এখন কী দেখতে পাচ্ছ?

পেরেকগুলো সব খসে পড়ে গেল কেন?

তোমরা জানো, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। লোহা লোহাকে আকর্ষণ করে না। তাই প্রথম ক্ষেত্রে, একটা লোহার পেরেক আর একটা লোহার পেরেককে আকর্ষণ করেনি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রথম লোহার পেরেক দ্বিতীয়টাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রথম পেরেকটাকে দণ্ড চুম্বক আকর্ষণ করে রেখেছিল। দণ্ড চুম্বক সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পেরেকটার আকর্ষণ ক্ষমতাও চলে যায়। তাহলে নিশ্চয়ই দণ্ড চুম্বকটার জন্যই প্রথম পেরেকটা দ্বিতীয় পেরেককে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

আসলে, দণ্ড চুম্বকের প্রভাবে প্রথম পেরেকটা সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে '**চৌম্বক আবেশ**' বলে।

এভাবে 'আবেশের' ফলে চুম্বকে পরিণত হওয়া প্রথম পেরেকের প্রভাবে দ্বিতীয় পেরেকটিতে চুম্বকত্ব আবেশিত হয়, তার প্রভাবে তৃতীয় পেরেক চুম্বকে পরিণত হয়। এভাবেই পেরেকের চেনটা তৈরি হয়েছিল।

এই পরীক্ষা থেকে আমরা আরও জানতে পারলাম যে, **চুম্বক যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে, তার আগে ওই চৌম্বক পদার্থকে আবেশিত করে চুম্বকে পরিণত করে।** তাই বলা যায়, '**আকর্ষণের পূর্বে আবেশ হয়**'।

হাতেকলমে 7

একটা দণ্ড চুম্বক নাও। এর একপ্রান্তে উত্তর মেরু আর এক প্রান্তে দক্ষিণ মেরু।

এবার, চুম্বকটাকে মাঝখান থেকে দুই টুকরো করো।

দেখত চুম্বকটার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে আলাদা করা গেল কিনা?

একটা চুম্বকশলাকা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, টুকরোদুটোর প্রত্যেকটার দুই প্রান্তে বিপরীত মেরুর (N ও S) সৃষ্টি হয়েছে।

এবার ওই দুই টুকরোর প্রত্যেকটাকে দুই টুকরো করে দেখো, N ও S মেরুকে আলাদা করা যায় কিনা।
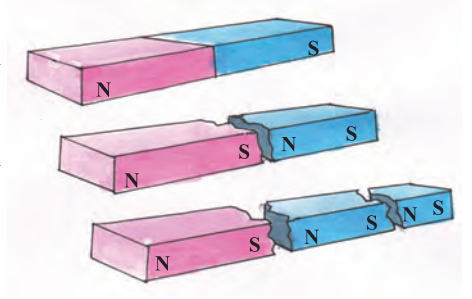
প্রতি টুকরো আলাদা করে চুম্বক শলাকা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, আবার ওই টুকরোতে N ও S মেরু সৃষ্টি হয়ে গেছে।

তাহলে বোঝা গেল, আলাদাভাবে শুধু একটা চৌম্বক মেরুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

এক নজরে চুম্বকের বিভিন্ন ধর্ম

চুম্বকের আকর্ষণ ধর্ম।

দিক নির্দেশক ধর্ম।

সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিপরীতমেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

আবেশী ধর্ম।

আগে আবেশ পরে আকর্ষণ হয়।

চুম্বকের সর্বদা দুটি বিপরীত মেরু থাকে।

একক মেরুর অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবী নিজেই কি একটি চুম্বক ?

একটি ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে আছে। পকেটে অন্য একটি চুম্বক নিয়ে তোমার বন্ধু যদি ওই ঝুলন্ত চুম্বকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কী হবে?

ঝুলন্ত চুম্বকটি কি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকবে?

তাহলে ভেবে দেখত কিসের প্রভাবে একটি ঝুলন্ত চুম্বক তার ঝুলে থাকার দিক পরিবর্তন করে?

এবার ভাবো, যখন আশেপাশে কোনো চুম্বক নেই তখন ঝুলন্ত চুম্বক দণ্ড যেমন তেমনভাবে না থেকে শুধু উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে কেন? তাহলে কি এমন অন্য কোনো চুম্বক আছে যা এইভাবে যে-কোনো ঝুলন্ত চুম্বক দণ্ডকে যেমন তেমনভাবে থাকতে দিচ্ছে না?— পৃথিবীই হলো সেই চুম্বক।

পৃথিবী যে নিজেই একটা চুম্বক তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে।
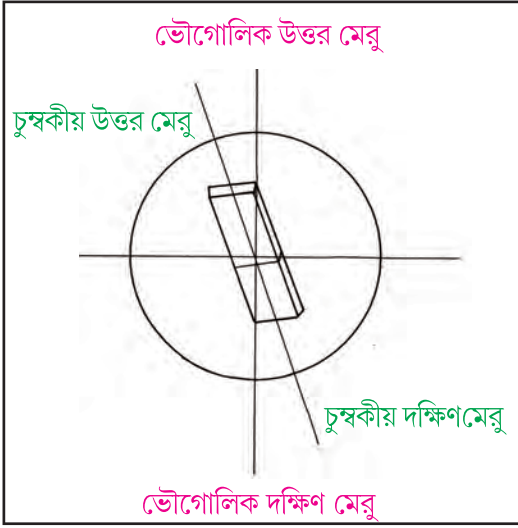
একটা লোহার দণ্ডকে বহুদিন ধরে পৃথিবীর উত্তর- দক্ষিণ দিক বরাবর রেখে দিলে দেখা যায় ওই দণ্ডের মধ্যে ক্ষীণ চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দণ্ডটার উত্তরমুখী প্রান্তে **'উত্তর মেরু'** আর দক্ষিণমুখী প্রান্তে **'দক্ষিণ মেরু'** সৃষ্টি হয়।

ভাবো তো, কোনো চুম্বককে অবাধে ঝুলে থাকতে দিলে তা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

আমরা জেনেছি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এবার ভেবে দেখো, পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে কি কোনো চুম্বক মেরু আছে? একইভাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতেও কি কোনো চুম্বক মেরু আছে?

আসলে, চুম্বকের উত্তর মেরু বলে আমরা চুম্বকের যে প্রান্তকে নির্দেশ করি তা হলো **'উত্তর সন্ধানী মেরু'**। আর অপরটি **'দক্ষিণ সন্ধানী মেরু'**। সংক্ষিপ্ত করার জন্য এদের আমরা যথাক্রমে **'উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু'** বলি।

তড়িৎ-চুম্বক

একটা লোহার দণ্ড, একটা লম্বা অন্তরিত (প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া) তামার তার, একটা সুইচ, একটা শক্তিশালী ব্যাটারি আর একটা চুম্বক শলাকা নাও। লোহার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে নাও। তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তে সুইচসহ ছবির মতো করে যোগ করো। শলাকাটিকে তার জড়ানো লোহার দণ্ডের সামনে এনে সুইচ অন করো। বোঝার চেষ্টা করো শলাকার কাছাকাছি থাকা প্রান্তটিতে কোন ধরনের মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত তারের প্রান্তদুটোকে উলটে দাও। এবার সুইচ অন করে আবার দেখো, শলাকাটির কোন মেরু দণ্ডটির কোন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হচ্ছে। চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটল কেন? চুম্বক শলাকার মেরুতে কে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করল? এবার সুইচ অফ করে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দাও। চুম্বক শলাকা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এল কেন?
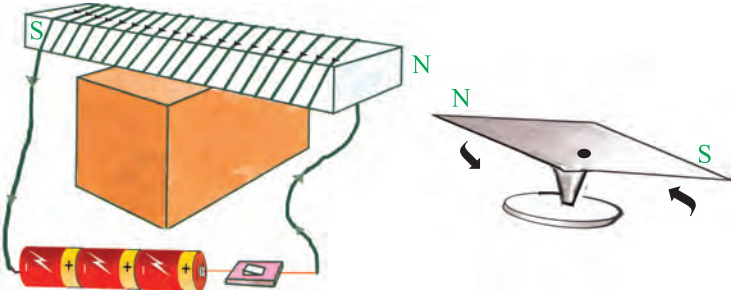
তাহলে কি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে লোহার দণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়েছিল?

এই ধরনের চুম্বককে তড়িৎ-চুম্বক বলে।

চুম্বক ও তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহার

নৌকম্পাস

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চুম্বকের **নানাবিধ ব্যবহার** আছে। তার কয়েকটা নীচে দেওয়া হলো।

সমুদ্রবক্ষে দিক নির্দেশের জন্য নাবিকরা '**নৌকম্পাস**' ব্যবহার করেন। এতে একটা সূক্ষ্মাগ্র ধাতবদণ্ডের উপর একটা চুম্বক শলাকা বসানো থাকে।

অডিয়ো ক্যাসেট

অডিয়ো বা ভিডিয়ো ক্যাসেটের মধ্যে যে প্লাস্টিকের টেপ থাকে তার উপর চুম্বকিত পদার্থের আস্তরণ থাকে।

A.T.M.(AUTOMATED TELLER MACHINE) কার্ডে ও ক্রেডিট কার্ডে চুম্বকিত স্ট্রিপ (Magnetic strip) -এর ব্যবহার হয়।

কমপিউটারের হার্ডডিস্কে (Hard disk) প্লাস্টিকের চাকতির উপর চুম্বকিত পদার্থের কোটিং বা আস্তরণ থাকে।

কমপিউটারের হার্ডডিস্ক

বিভিন্ন খেলনাতে চুম্বকের ব্যবহার দেখা যায়।

চোখের ভিতর থেকে লোহার সূক্ষ্ম চূর্ণ বার করতে ডাক্তাররা এক বিশেষ **তড়িৎ চুম্বক যন্ত্র** ব্যবহার করেন।

লাউড স্পিকারে চুম্বকের ব্যবহার আছে।

সাইকেলের ডায়নামোতে চুম্বকের ব্যবহার হয়।

ইলেকট্রিক মিটারে চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ফ্রিজের দরজায় চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রিক কলিংবেলে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রিক মোটরে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

কলিংবেল

চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিস খুব সাবধানে ব্যবহার করা দরকার।

চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোনো বস্তু কোনোভাবেই যেন খুব বেশি উত্তপ্ত না হয়। তাপের প্রভাবে চুম্বকের চুম্বকত্ব বিনষ্ট হতে পারে। দুটি ATM কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের যেদিকে চুম্বক স্ট্রিপ আছে সেই দিক মুখোমুখি একসঙ্গে যেন না থাকে।

লাউড স্পিকার, টি.ভি, রেডিয়ো, কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ইত্যাদির কাছে যেন কোনো শক্তিশালী চুম্বক না থাকে।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় চৌম্বক ক্ষেত্রের ভূমিকা

জীবজগৎকে ধরে রেখেছে যে পৃথিবী সে নিজেই একটা বিশাল চুম্বক। কোনো কোনো জীবের ওপর চৌম্বক শক্তির প্রভাব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন। অনেক জীবের ক্ষেত্রে এখনও এর প্রভাব আমাদের অজানা থেকে গেছে।
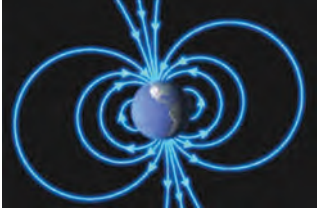
ভূচুম্বকের বলরেখা

ভূচুম্বকের বলরেখা উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা পরিযায়ী পাখিদের কথা জানি। পরিযায়ী কিছু কচ্ছপও আছে। তারা পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা অনুসরণ করে আদি বাসভূমি থেকে শীতে পাড়ি দেয় এমন কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেখানে গরম তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার শীতের শেষে ওইভাবেই উৎসে ফিরে আসে।

মহাবিশ্ব থেকে এক ধরনের রশ্মি — মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। এদের অধিকাংশই হলো তড়িৎযুক্ত কণিকা। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে মেরু অঞ্চল ঘিরে দুটি বিকিরণ বলয় (ভ্যান-অ্যালেন বিকিরণ বলয়) তৈরি হয় এবং উৎপন্ন হয় মেরু জ্যোতি বা অরোরা। এই জ্যোতি ওই অঞ্চলের জীবজগতের কাজে লাগে।

মেরুজ্যোতি

কী করে একটি প্রাণী সরাসরি এই চৌম্বক ক্ষেত্রকে চিনতে পারে?

পায়রার খুলি ও মস্তিষ্কের মাঝে একটা খুব ছোটো কালো গঠন আছে। এর মধ্যে ম্যাগনেটাইট নামে এক ধরনের চৌম্বকীয় বস্তু আছে। ঘরে ফেরা পায়রারা মেঘলা অন্ধকার দিনে কোনো পরিচিত চিহ্ন না দেখতে পেলেও ঠিকঠাক ঘরে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ওড়ার পর তারা সঠিক দিকে চলতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হলো, এদের মাথায় এক টুকরো চুম্বক লাগিয়ে দিলে চলার দিক পরিবর্তিত হয়। কোনো কোনো শামুক, মৌমাছিদের মধ্যেও ম্যাগনেটাইটের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে।

তড়িৎপ্রবাহ

তড়িৎ-এর সাহায্যে চলে এমন কয়েকটা জিনিসের নাম লেখো।

ধরো, রাত্রিবেলায় লোডশেডিং হয়েছে, অথবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে,

এসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলো পেতে মানুষ কী কী ব্যবহার করে?

তোমরা সবাই টর্চ দেখেছ। অন্ধকারে টর্চের আলোয় আমরা পথ চলি। টর্চের ভিতরে কী থাকে তা কি কখনও দেখেছ?
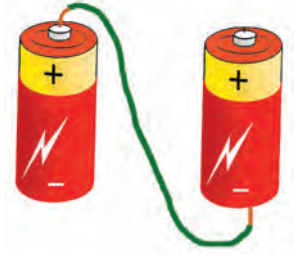
টর্চের ভিতর তোমরা যাকে ব্যাটারি বলে জানো তা হলো **Dry cell** বা **নির্জল কোশ**। চলতি কথায় একে শুধু, **সেল (cell)** - ই বলে। **একাধিক সেল -এর সমবায়ে তৈরি হয় ব্যাটারি।**

'সেল' ছাড়া টর্চ জ্বলে না। আবার 'সেল' যুক্ত করলেই টর্চ জ্বালালে জ্বলে। তাহলে, টর্চের বৈদ্যুতিক বালব জ্বালার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয় 'সেল'।

জেনে রাখা দরকার

টর্চের সেলের ভিতরে থাকে রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপ বদল করে। এই সেলকে বলে **'প্রাইমারি সেল'** বা **'ডিসপোজেবল সেল'**।

একটা সেল নাও। খুব ভালো করে সেলটাকে লক্ষ করো। এবার দেখো '+' **চিহ্ন** কোথায় আছে?

যে প্রান্তে '+' **চিহ্ন** আছে তার উলটো প্রান্তে কী চিহ্ন আছে?

এবার দেখো সেলের কোন প্রান্তে একটা ধাতুর তৈরি টুপি রয়েছে? '+' **চিহ্ন** দেওয়া প্রান্তে, না '–' **চিহ্ন** যুক্ত প্রান্তে?

দেখো তো সেলটির অপর প্রান্তে কী আছে?

দেখা গেল, একটা 'সেলের' দুটি প্রান্ত,

'ধাতব টুপি' প্রান্ত বা '+' চিহ্নিত প্রান্ত,

'ধাতব চাকতি' প্রান্ত বা '–' চিহ্নিত প্রান্ত।

জেনে রাখা ভালো

বাজারে আরো অনেক রকমের সেল আছে।

ইলেকট্রনিক হাতঘড়িতে যে 'সেল' থাকে তা দেখতে অনেকটা বোতামের মতো। একে **বোতাম সেল (Button Cell)** বলে।

গাড়ির শক্তিশালী ব্যাটারিতে থাকে ছটা বা তার বেশি সেল। এই ধরনের সেলকে **'সেকেন্ডারি সেল'** বলে।

বাড়ির বড়োদের সাহায্যে টর্চের বালবটাকে বার করো। ভালো করে লক্ষ করো।

টর্চের সুইচ অন করলে বালবের ভিতরে যে অংশটা জ্বলে ওঠে তাকে বলে **ফিলামেন্ট**। ফিলামেন্ট, দুটো মোটা ধাতব তারের মাঝে থাকে। ওই তার দুটোর একটা সেলের **ধনাত্মক প্রান্তে (+ চিহ্নিত প্রান্তে)** এবং অপরটি সেলের **ঋণাত্মক প্রান্তে (- চিহ্নিত প্রান্তে)** যুক্ত থাকে।
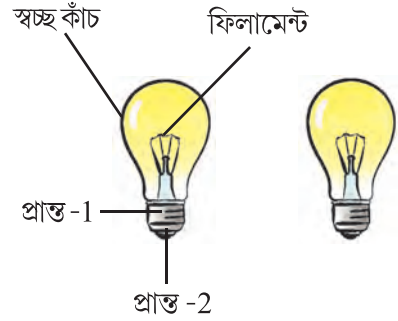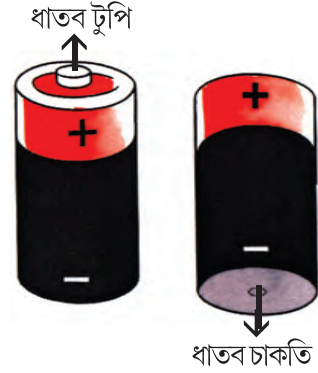
হাতেকলমে 1

একটা টর্চের বালব, এক বা একাধিক সেল, বিভিন্ন রঙের পাঁচটা প্লাস্টিক আবরণযুক্ত পরিবাহী তার, ব্ল্যাক টেপ ও রাবার ব্যান্ড (গার্টার) জোগাড় করো।

প্রতিটি তারের দু-প্রান্তে খানিকটা প্লাস্টিক আবরণ (প্লাস্টিক কোটিং) ছাড়িয়ে নিয়ে ধাতব অংশ বার করে রাখো।

সেলের দু-প্রান্তে একটা করে তার যুক্ত করো।

বালবটার দু-প্রান্তে একটা করে তার যুক্ত করো।

এবার পরের পৃষ্ঠার ছবিতে, যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইরকম বিভিন্নভাবে তারগুলো যুক্ত করো। দেখো কোন ক্ষেত্রে আলো জ্বলছে। (ছবির নীচে দেওয়া লেখা থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নাও)
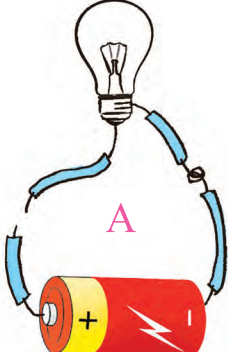
আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না
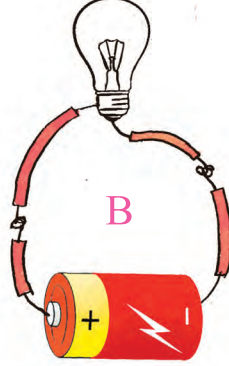
আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না
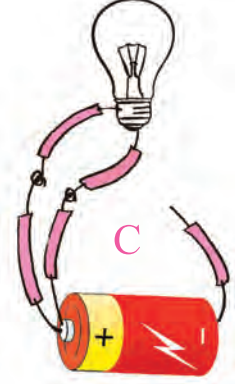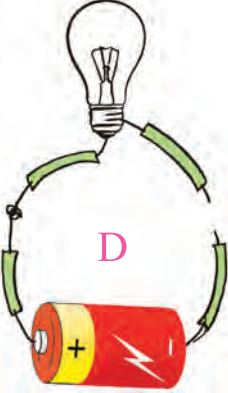
আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না
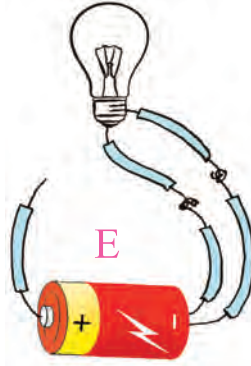
আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না
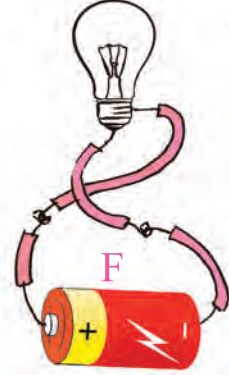
আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

হাতেকলমে 2

এবার দুটো সেল পাশাপাশি বসিয়ে নিয়ে বালবটা জ্বালাও।

কী দেখলে?

বালবটার আলো আরও বেশি জোরালো হলো কি?
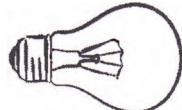
বোঝা গেল যে একটার বদলে দুটো সেল পাশাপাশি বসালে তড়িৎশক্তির পরিমাণ বাড়ে।

'হাতেকলমে 1' -এর পরীক্ষায় দুটি ক্ষেত্রে আলো জ্বলেছে (B ও F)।

এই দুই ক্ষেত্রেই বালবের দুই প্রান্তের সঙ্গে সেলের দুই প্রান্ত যুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় **সার্কিট বা বর্তনী**।
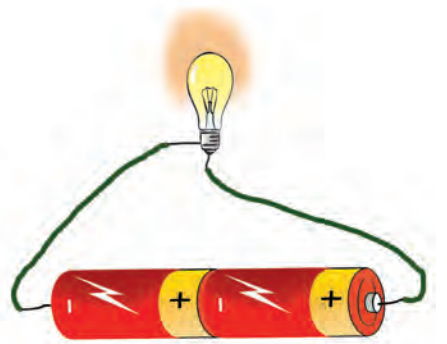
বর্তনী আঁকার জন্য কয়েকটি প্রতীক নীচের সারণিতে দেওয়া হলো।

	সেল		বড়োদাগটা (|) '+' প্রান্ত বোঝায় ছোটোদাগটা(।) '—' প্রান্ত বোঝায়
	ব্যাটারি (দুই সেলের)		×
	সুইচ		সুইচ 'অফ' অবস্থা
	সুইচ		সুইচ 'অন' অবস্থা
	তার		×
	বালব		×

হাতেকলমে 3

ছবির মতো করে একটা বর্তনী তৈরি করো।

বালবটা কি জ্বলছে?

যদি বালবটা জ্বলে তবে বর্তনী ঠিক আছে।

এবার একটা স্কেচ পেন নাও। সেলের '+' প্রান্ত থেকে তার বরাবর স্কেচ পেন দিয়ে বালব অবধি দাগ দাও।

সেল থেকে তড়িৎ তোমার পেনের দাগ বরাবর তারের মধ্যে দিয়ে বালবের এক প্রান্তে পৌঁছোয়।

বালবটা যেহেতু জ্বলছে, তাই তড়িৎ বালবের ভিতরের তার আর ফিলামেন্ট ধরে বালবের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছোয়।

এবার বালবের অপর প্রান্ত থেকে শুরু করে তার বরাবর সেলের '−' প্রান্ত অবধি স্কেচ পেন দিয়ে দাগ দাও।
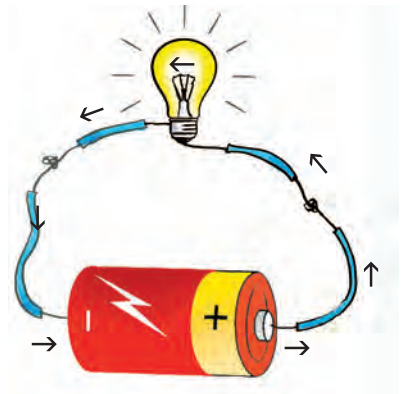
এবার প্রতীকের সাহায্যে বর্তনীটি পাশে আঁকা হলো। ভালোভাবে বর্তনীটি লক্ষ করো।

আগের পৃষ্ঠার সারণিতে দেওয়া প্রতীকের সাহায্যে কীভাবে পাশের বর্তনীটি আঁকা হয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝেছ।
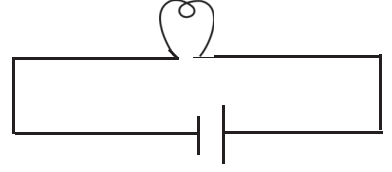
এবার নীচের বাঁ দিকের ছবি দেখে তার বর্তনীটি ডানদিকে আঁকো।
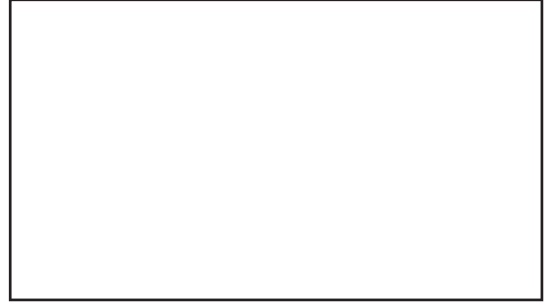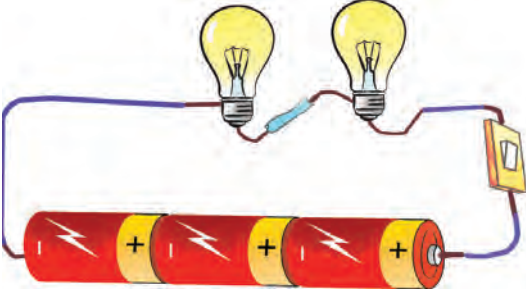
নীচের ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখো ও ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
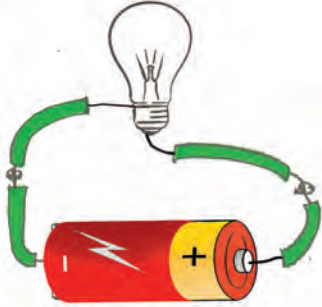
আলো কি জ্বলবে? ......
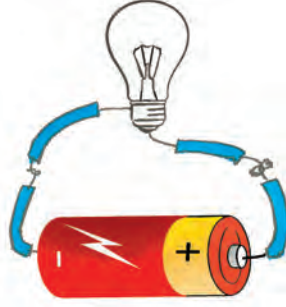
আলো কি জ্বলবে? ......
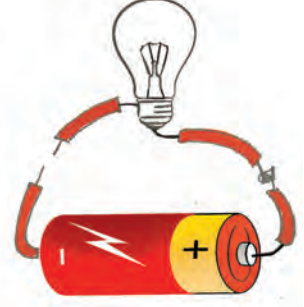
আলো কি জ্বলবে? ......
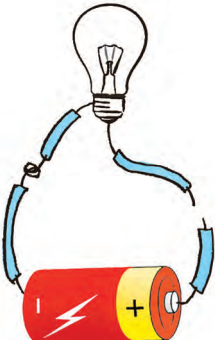
আলো কি জ্বলবে? ......

আলো কি জ্বলবে? ......

আলো কি জ্বলবে? ......

বর্তনী কোথাও ছিন্ন হয়ে গেলে, তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচলে বাধা পড়ে। তখন বর্তনী কাজ করে না।

তখন ওই বর্তনীকে **মুক্ত বর্তনী** বলে। আর যদি বর্তনী কোথাও ছিন্ন না হয় তখন ওই বর্তনীকে **বন্ধ বর্তনী** বলে।

হাতেকলমে 4

একটা থার্মোকলের টুকরো বা কাঠের টুকরো, একটা সেফটিপিন, আর দুটো বোর্ডপিন নাও। নীচের ছবির মতো ব্যবস্থা করো।
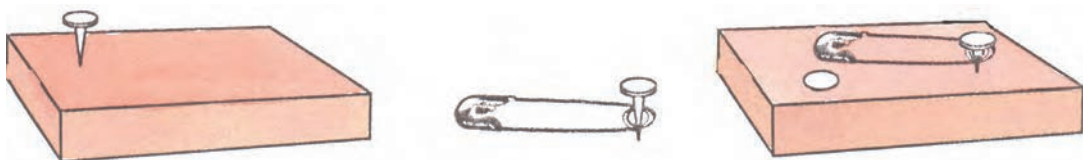
দুটো পিনের দূরত্ব এমন হবে, যাতে দ্বিতীয় পিনে গাঁথা সেফটিপিনকে ঘুরিয়ে প্রথম পিনে স্পর্শ করা যায়।

ব্যাস, তুমি বানিয়ে ফেলেছ একটা সুইচ।
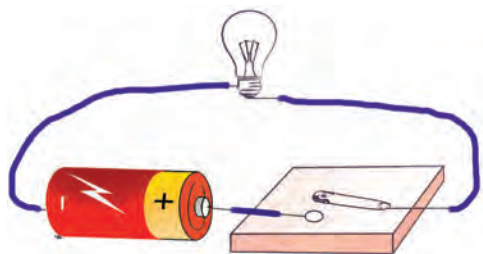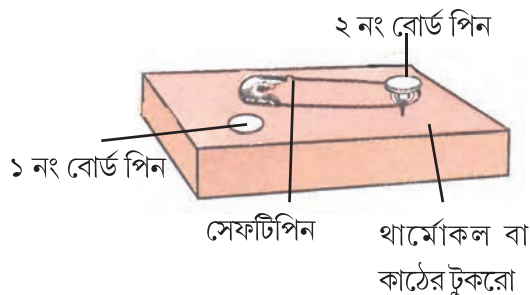
একটা বালব, তিনটে তার, আর একটা সেল নাও। এবার পাশের বর্তনীটি তৈরি করো।

সেফটিপিনটা ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমনভাবে রয়েছে।

বালবটা কি জ্বলবে?

এবার সেফটিপিনটা ঘুরিয়ে প্রথম পিনে স্পর্শ করা হলো।

বালবটা কি জ্বলবে?

তোমার বাড়িতে যে সব ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের মধ্যে সুইচ আছে তার মধ্যে প্রায় সব সুইচই এই নীতিতে কাজ করে।

হাতেকলমে 5

একটা সেল, একটা টর্চের বালব, আর তিনটে তার নাও। তারগুলোর দুই প্রান্তে প্লাস্টিক ছাড়িয়ে কিছুটা ধাতব তার বার করে রাখো।

এবার পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো করে তার, সেল ও বালব লাগাও। ব্যাস, তৈরি হলো তোমার বর্তনী পরীক্ষক বা টেস্টার।

এখন, একটা কাঠের ও একটা প্লাস্টিকের স্কেল ,একটা লোহার পেরেক, একটা সুতির কাপড়ের টুকরো, একটা স্টিলের চামচ, একটা চাবি, একটা কাগজের টুকরো, চিনে মাটির একটা কাপ নাও।

এবার তোমার তৈরি টেস্টারটা নাও। উপরের প্রতিটি জিনিসের দু-প্রান্তে তোমার টেস্টারের A ও B প্রান্ত স্পর্শ করো। লক্ষ করো, কোন ক্ষেত্রে বালবটি জ্বলছে।

যে যে ক্ষেত্রে বালব জ্বলছে, সেই বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

এই বস্তুগুলোকে বলে **'তড়িতের সুপরিবাহী'** ।
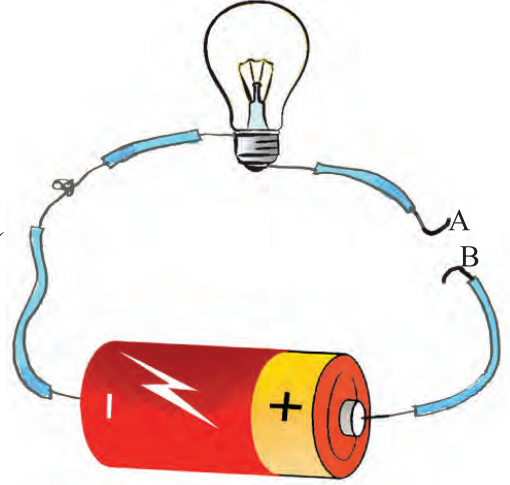
টেস্টার বা বর্তনী পরীক্ষক

যেসব ক্ষেত্রে বালব জ্বলছে না, সেই বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। তাই এদের **তড়িৎ-এর 'কুপরিবাহী'** বা অন্তরক বলে।

বস্তুর নাম	আলো জ্বলছে বা জ্বলছে না	এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যেতে পারে বা পারে না	তড়িতের সুপরিবাহী বা কুপরিবাহী
কাঠের স্কেল			
প্লাস্টিকের স্কেল			
লোহার পেরেক			
সুতির কাপড়			
স্টিলের চামচ			
চাবি			
কাগজের টুকরো			
চিনেমাটির কাপ			

উপরের সারণিটি পূরণ করো।

তোমার টেস্টারটা তো বায়ুর মধ্যে আছে। তাহলে টেস্টারের 'A' ও 'B' প্রান্ত বায়ুকে স্পর্শ করেই রয়েছে, তাই না? কিন্তু বালব তো জ্বলছে না!

তাহলে বায়ু কি সুপরিবাহী না কুপরিবাহী?

এক্ষেত্রে বর্তনীটি কি বন্ধ না মুক্ত?

ভেবে বলো তো।

ইলেকট্রিকের তার প্লাস্টিকের ভেতর ঢাকা থাকে কেন? আবার, বর্তনী তৈরির সময় ওই প্লাস্টিকের আবরণ ছাড়িয়ে নিতে হয় কেন?

ইলেকট্রিক সরঞ্জামে চিনেমাটি বা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় কেন?

ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিরা যখন চালু লাইনে কাজ করেন তখন তাঁরা কাঠের আসবাবপত্রের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন কেন?

মনে রেখো, প্লাস্টিক, চিনেমাটি, কাঠ প্রভৃতি তড়িৎ-এর কুপরিবাহী।

তড়িৎ প্রবাহের ফল

হাতেকলমে 6

একটা চুম্বক শলাকা নাও। চুম্বক শলাকাকে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও। এবার একটা শক্তিশালী ব্যাটারি, দু-টুকরো (একটা ছোটো ও একটা বড়ো) প্লাস্টিকের তার যাদের দু-প্রান্তে প্লাস্টিক ছাড়িয়ে ধাতব তারের কিছু অংশ বার করা আছে ও একটা সুইচ নাও। ছবির মতো করে বর্তনীটা তৈরি করো।
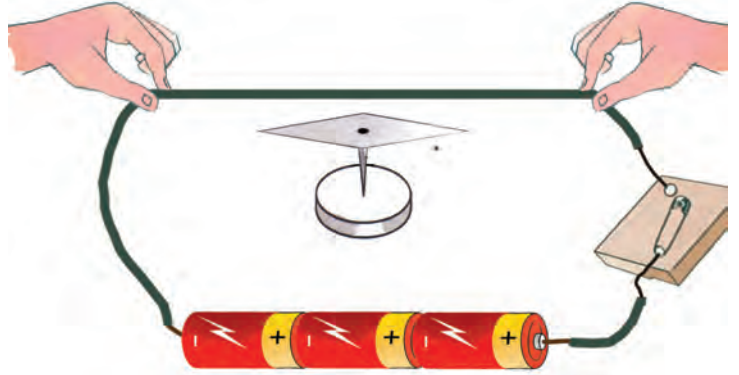
এবার, বড়ো তারটার দু-প্রান্ত হাত দিয়ে, চুম্বকশলাকার দুই সুচালো মুখ বরাবর চুম্বক শলাকার সামান্য একটু ওপরে টান টান করে ধরো। এবার বন্ধুকে বলো সুইচ অন করতে।

সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে, চুম্বকটার বিক্ষেপ হলো কেন?

কাছাকাছি তো কোনো চুম্বক নেই। তাহলে ওই চুম্বককে বল প্রয়োগ করল কে?

ভালো করে দেখো তো চুম্বকটা এখন কি আর উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে আছে?

এবার সুইচ অফ করে দাও।

কী দেখতে পেলে?

চুম্বকটার আবার বিক্ষেপ হলো। আর সাম্যাবস্থায় এসে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়াল।

তাহলে এই পরীক্ষা আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে চুম্বকের

ওপর তার প্রভাব পড়ে।

তোমরা দেখেছ, একটা চুম্বক শলাকার কাছে একটা দণ্ড চুম্বক নিয়ে এলে, শলাকাটির বিক্ষেপ হয়, কারণ শলাকাটির ওপর একটি চৌম্বক বল ক্রিয়া করে।

তাহলে ওপরের পরীক্ষায় চুম্বক শলাকার বিক্ষেপের জন্য যে চৌম্বক বল দায়ী তা এল কোথা থেকে? তড়িৎপ্রবাহের ফলে যে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয় ওপরের পরীক্ষা তার প্রমাণ। কারণ সুইচ অফ করার পর ওই বলের আর অস্তিত্ব থাকে না।

হাতেকলমে 7

একটা সেল, একটা বড়ো লোহার পেরেক, কয়েকটা ছোটো পেরেক, তোমার তৈরি একটা সুইচ বোর্ড ও চারটে তার নাও। ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো।

সুইচ 'অন' করো।

এবার বড়ো পেরেকটার কাছে ছোটো পেরেকগুলো ধরো।

কী দেখলে বলো?

ছোটো পেরেকগুলোকে বড়ো পেরেকটা আকর্ষণ করছে কেন?

এবার সুইচ 'অফ' করো।

এবার বড়ো পেরেকটা কি আর ছোটো পেরেকগুলোকে আকর্ষণ করছে?

সুইচ 'অন' করলে বড়ো পেরেকটা ছোটো পেরেকগুলোকে আকর্ষণ করছে।

আবার অফ করলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা চলে যাচ্ছে।

তবে কি তড়িৎ প্রবাহই ওই পেরেকটাকে চুম্বকে পরিণত করেছে?

কোনো চৌম্বক পদার্থের (লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি) ওপর তার জড়িয়ে ওই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পাঠালে ওই চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। এধরনের চুম্বককে **তড়িৎ চুম্বক** বলে। **তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে তা আর চুম্বক থাকে না।**
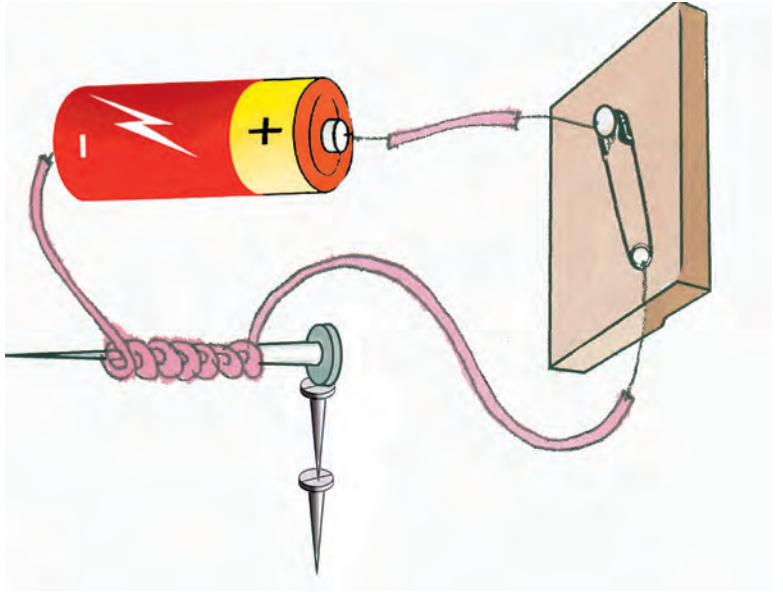
হাতেকলমে 8

হাতেকলমে 7 -এর বর্তনীর (সার্কিটের) সুইচ 'অন' করো। দেখো সবচেয়ে বেশি কটা ছোটো পেরেককে বড়ো পেরেকটা আকর্ষণ করতে পারছে।

ছোটো পেরেকের সংখ্যা = ...টি।

এবার বড়ো পেরেকটার উপর তারের পাক সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। সুইচ অন করো।

এবার দেখো বড়ো পেরেক সবচেয়ে বেশি কটা ছোটো পেরেককে আকর্ষণ করতে পারছে?

ছোটো পেরেকের সংখ্যা = ...- টি।

প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের ছোটো পেরেকের সংখ্যা বাড়ল কেন?
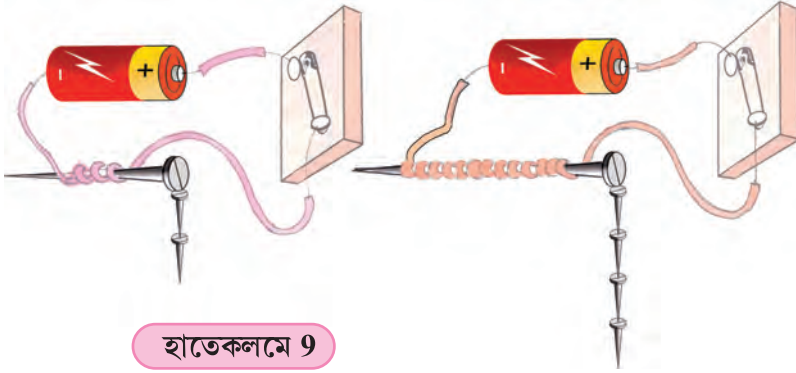
দ্বিতীয়বারে তড়িৎ চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়ল কেন?

তারের পাক সংখ্যা বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে।

হাতেকলমে 9

এবার তারের পাক সংখ্যা একই রেখে সেল সংখ্যা বাড়িয়ে পরীক্ষাটা করো। এবার দেখো আগের চেয়ে তড়িৎ চুম্বকটা (বড়ো পেরেক) আরও বেশি সংখ্যক ছোটো পেরেককে আকর্ষণ করছে কী?

তাহলে দেখা গেল সেল সংখ্যা বাড়লে অর্থাৎ তড়িতের পরিমাণ বাড়লে তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে।
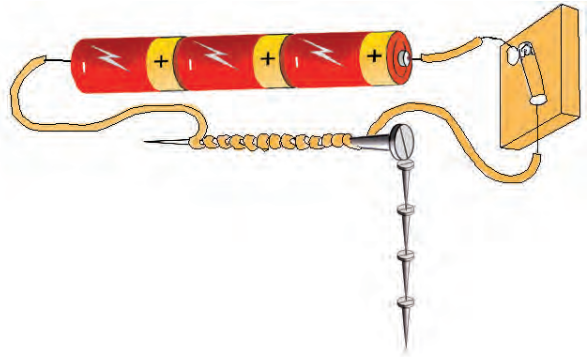
জেনে রাখা ভালো

আজকাল তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার ক্রমে বেড়ে চলেছে। কয়েকটা উদাহরণ জেনে রাখো।

- **ইলেকট্রিক কলিং বেলে** তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার হয়।
- **লাউড স্পিকার** তৈরি করতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

- **ইলেকট্রিক ক্রেনে** তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- চোখে কোনো চৌম্বক পদার্থের কণা পড়লে, তা তুলতে ব্যবহার হয় এক বিশেষ যন্ত্রের। সেই যন্ত্র তৈরিতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- **মোটর** তৈরিতে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
- **টেলিফোনে** তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

তড়িৎ প্রবাহের ফলে আলো উৎপন্ন হয়

হাতেকলমে 10

একটা **LED**(**L**ight **E**mitting **D**iode), একটা সেল, কয়েকটা দু-মুখ ছাড়ানো তার ও তোমার তৈরি একটা সুইচ নাও।

(**L**ight **E**mitting **D**iode)

LED

এমন এক ইলেকট্রনিক বস্তু যা সামান্য তড়িতেই আলো দেয়। এতে কোনো ফিলামেন্ট থাকে না। এর ধনাত্মক প্রান্তটা বড়ো আর ঋণাত্মক প্রান্তটা ছোটো। একটা LED কুড়ি বছরেও নষ্ট হয় না। বাজারে নানান রং-এর আলো নিঃসরণকারী LED কিনতে পাওয়া যায়।

নীচের ছবির মতো বর্তনী তৈরি করো।
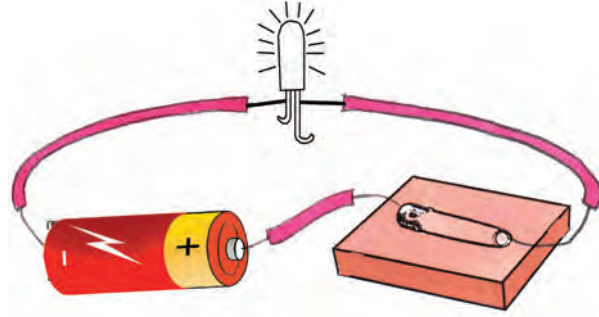
এবার সুইচটা অন করো।

কী দেখতে পেলে?

LED -তে উৎপন্ন এই আলোক শক্তির উৎস কী?

এবার সুইচটা অফ করো।

কী দেখলে?

LED - তে এবার আলো জ্বলল না কেন?

তাহলে দেখা যাচ্ছে LED -এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে, আলো জ্বলে। **তড়িৎ প্রবাহ না থাকলে আলো জ্বলে না।**

তাহলে কী তড়িৎ প্রবাহই LED -তে উৎপন্ন আলোর কারণ?

LED -এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হওয়ার সময় **তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে**। তাই সুইচ অন করলে LED -এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ ঘটার ফলে LED জ্বলে ওঠে।

হাতেকলমে 11

এখন 'হাতেকলমে-10' -এর বদলে দুটো সেল নিয়ে নীচের ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো। সুইচ 'অন' করো।

'হাতেকলমে-10' -এর চেয়ে এবার LED -এর আলো কি বেশি জোরালো? ভেবে বলো তো, হাতেকলমে-10-এর সার্কিটের সঙ্গে এবারের সার্কিটের পার্থক্য কোথায়? তাহলে কি সেলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আলোর জোর বেড়েছে? সেলের সংখ্যা বাড়লে সার্কিটে কিসের পরিমাণ বাড়ে?

তাহলে, LED -তে আলো জোরালো হওয়ার কারণ হলো .... ।[উপযুক্ত শব্দ বসাও]

তড়িৎ প্রবাহ বাড়লে আলোর জোরও বাড়ে।

তড়িৎ প্রবাহের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়

হাতেকলমে 12

একটা নাইক্রোম তার (যে-কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে পাওয়া যায়), দু-প্রান্ত ছাড়ানো কয়েকটা প্লাস্টিক তার, দুটো সেল, তোমার তৈরি একটা সুইচ, দুটো পেরেক ও একটা কাঠের ছোটো তক্তা নাও।

এবার ছবির মতো করে সার্কিট তৈরি করো। সুইচ 'অন' করার আগে নাইক্রোম তারটার উষ্ণতা হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করো। এবার, সুইচ 'অন' করো। এ অবস্থায় 10-11 সেকেন্ড রেখে দাও। আবার স্পর্শ করে দেখো।

দ্বিতীয়বারে নাইক্রোম তারের উষ্ণতা বেশি হলো কেন?

প্রথম ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারের মধ্যে দিয়ে কি তড়িৎ চলাচল করেছিল?

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারের মধ্যে দিয়ে কি তড়িৎ চলাচল করেছিল?

তাহলে তড়িৎ চলাচলের জন্যই কি নাইক্রোম তারের উষ্ণতা বেড়ে গিয়েছিল?

অতএব জানা গেল পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচল করলে পরিবাহীতে তাপ উৎপন্ন হয়।

আগের পরীক্ষাটিতে (হাতে কলমে 11) বাল্বটি কিছুক্ষণ জ্বলার পর তাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখবে বাল্বটি গরম হয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও বাল্বের ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচল করার ফলেই এই তাপ উৎপন্ন হয়েছে।

জেনে রাখা ভালো

তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফলের কয়েকটা প্রয়োগ জেনে রাখো।

1. **ইলেকট্রিক ইস্ত্রি:** এতে 'নাইক্রোম তার' অভ্রের উপর জড়ানো থাকে। ওর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলেই নাইক্রোম তার গরম হয়ে ওঠে।
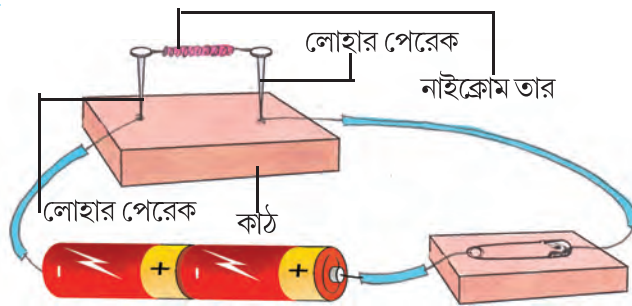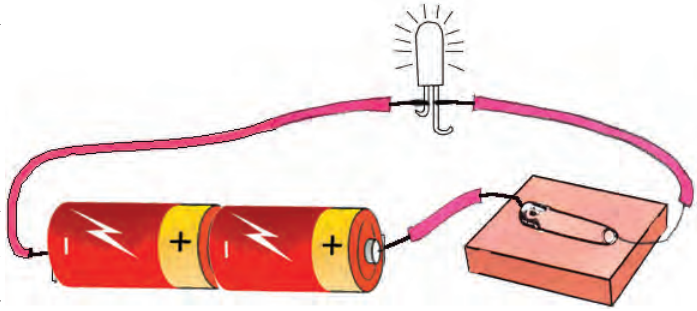
2. **ইলেকট্রিক বালব:** বালবের ফিলামেন্ট তৈরি হয় **টাংস্টেন ধাতু** দিয়ে। ফিলামেন্টে তড়িৎ চলাচল হলেই তার মধ্যে উৎপন্ন হয় তাপ। এই তাপ শক্তি আলোক শক্তিতে বদলে গেলে উৎপন্ন হয় আলো।

3. **ফিউজ তার:** যে-কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য **ফিউজ তার** ব্যবহার হয়। এই ফিউজের মধ্যে দিয়েই তড়িৎ ওই সার্কিটে প্রবেশ করে। ফিউজ তার খুব কম উষ্ণতায় গলে যায়। ফলে কোনো কারণে খুব বেশি পরিমাণ তড়িৎ এসে পড়লে ফিউজ তার খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গলে যায়। ফলে বর্তনী ছিন্ন হয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তাই সার্কিটের কোনো ক্ষতি হয় না। ফিউজ তার আবার পালটে দেওয়া যায়।
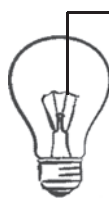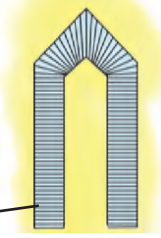
ফিউজ

আলো থেকে তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন

বলতে পারো ক্যালকুলেটার কোন শক্তিতে চলে? আর এই শক্তি ক্যালকুলেটার কোথা থেকে পায়?
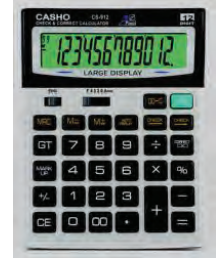
এবার ভেবে বলো, এমন ক্যালকুলেটারের কথা, যাকে চালু রাখতে 'সেল' বা 'ব্যাটারি' পালটাতে হয় না?

সোলার ক্যালকুলেটার

সোলার ক্যালকুলেটার হলো এক বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র । এই যন্ত্রও চলে তড়িৎ শক্তি দিয়ে। ওই তড়িৎ শক্তির উৎস কিন্তু বাজারে যে সেল বা ব্যাটারি পাওয়া যায় সেটা নয়।

তাহলে ওই তড়িৎ আসে কোথা থেকে?

আসলে, সোলার ক্যালকুলেটারের তড়িৎ জোগান দেয় সোলার প্যানেল। কতগুলো সোলার সেল দিয়ে এই প্যানেল তৈরি হয়। সূর্যের আলো ওই প্যানেলের উপর পড়লে ওই আলোক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে বদলে যায়।

সৌর শক্তিতে চলে এমন আর কোনো উদাহরণ কি তোমার জানা আছে?

সোলার কুকার, সোলার টেবিল ফ্যান, সোলার টিউবলাইট, সোলার স্ট্রিট লাইট ইত্যাদি সবই চলে সৌর শক্তিতে।

সোলার প্যানেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম। তবুও এখনও যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি সেখানে সৌরশক্তিচালিত যন্ত্রই একমাত্র ভরসা।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় তড়িৎ শক্তির প্রভাব

তড়িৎ শক্তির ও জীবজগতের সম্পর্কও বেশ গভীর। তোমরা জানো যে ইলেকট্রিকের খোলা তারে হাত দিলে আমাদের দেহের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা বলি ‘শক’ লেগেছে। সমস্ত জীবের দেহের তরলে তড়িৎযুক্ত নানান ধরনের পরমাণু আর পরমাণু জোট থাকে। এইসব তড়িৎযুক্ত কণার উপস্থিতির জন্য জীবদেহের তরল তড়িৎ পরিবাহী হয়।

জেলিফিশ, ইলেকট্রিক ইল (eel) মাছের কথা কী তোমরা শুনেছ? এদের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা আছে। এরা যথেষ্ট তীব্র তড়িৎ তৈরি করতে পারে। এই বিদ্যুৎ শত্রুকে হতভম্ব করে দেয় আর দূরে সরিয়ে রাখে।

হৃৎপিণ্ডের পেশিতে তড়িৎ উদ্দীপনা তৈরির জন্য এক বিশেষ ধরনের উপাদান থাকে। এদের তৈরি তড়িৎ উদ্দীপনা হৃৎস্পন্দন তৈরি করে। যা সারা দেহের বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

জেলি ফিশ

ইল
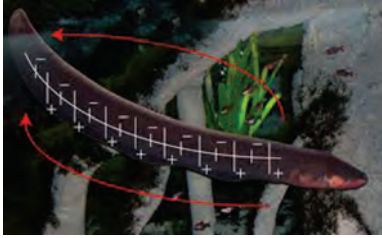
মস্তিষ্ক তরঙ্গও তড়িতীয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোশ নিয়ে গঠিত। স্নায়ুকোশের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য তড়িৎ উদ্দীপনার সাহায্যেই পরিবাহিত হয়। ফলে পেশির সংকোচন-প্রসারণ সম্ভব হয়। আমরা চলাফেরা ও নানা কাজ করতে পারি। জীবেরা উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

1930-এর দশকে একদল বিজ্ঞানী স্কুইড বলে একরকম অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুকোশ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা বুঝলেন যে স্নায়ুকোশের ভিতরে ও বাইরে তড়িৎবাহী কণাদের সংখ্যা ও প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। তড়িৎবাহী কণার পরিমাণে এই পার্থক্য থাকার জন্যই স্নায়ুকোশ বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে। এত প্রাণী থাকতে স্কুইড কেন?- মানুষের স্নায়ুকোশ খুব সরু তাই তা নিয়ে পরীক্ষা করা শক্ত। স্কুইডের স্নায়ুকোশের ব্যাস মানুষের স্নায়ুকোশের ব্যাসের প্রায় 25 গুণ। তাই তা নিয়ে পরীক্ষা করা সহজ।

স্কুইড

পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার

বিভিন্ন ধরনের শক্তি, তাদের উৎস ও রোজকার জীবনে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে তোমাদের একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা এতক্ষণে হয়ে গেছে।

আমাদের জীবনধারণ অনেকটাই বহু প্রচলিত কয়েকটি শক্তি-নির্ভর।

তাপ শক্তির ব্যবহার

- মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি পোড়াতে
- রান্না করতে
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে
- কামারশালায় লোহা পিটিয়ে নানারকম যন্ত্র বানাতে
- অপারেশন করার আগে ছুরি, কাঁচি নির্বীজ করতে
- ইস্ত্রি করতে
- স্টিম ইঞ্জিন চালাতে
- ইট বানাতে
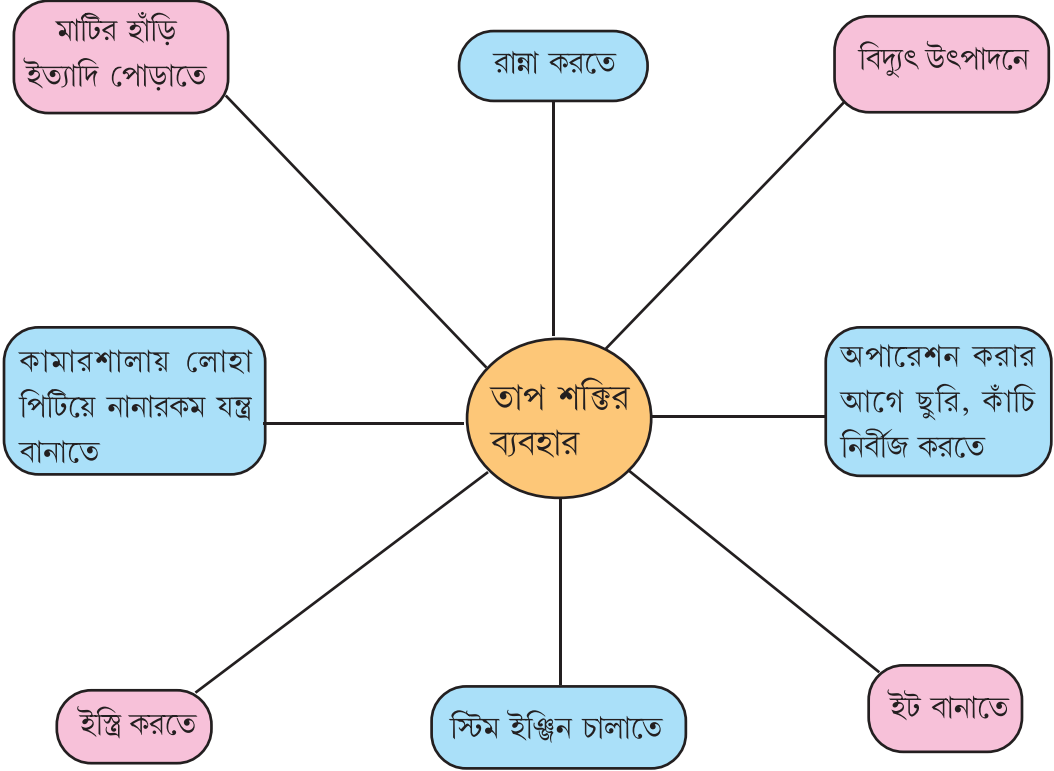
তুমি তাপশক্তির আরো কয়েকটি ব্যবহার নীচের ফাঁকা ঘরে লেখো—
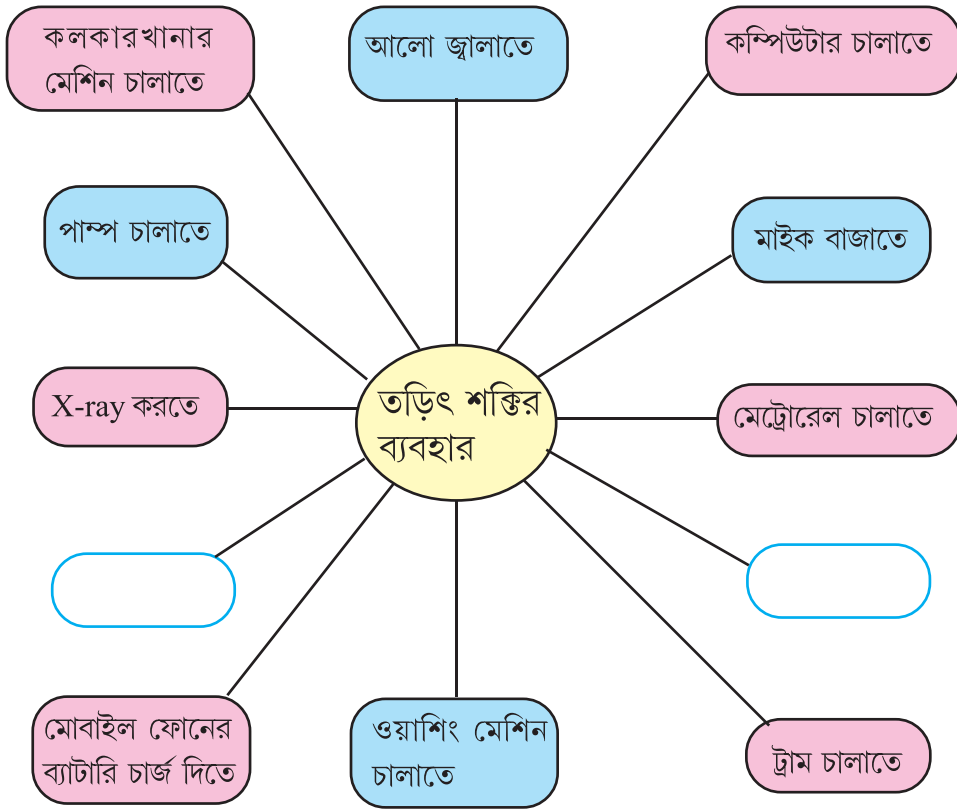
তড়িৎ শক্তির অন্য কোনো ব্যবহার তোমার জানা থাকলে ওপরের ফাঁকা জায়গায় তা লেখো। নীচে আমাদের পরিচিত জীবাশ্ম জ্বালানির অন্য কোনো ব্যবহার জানা থাকলে ফাঁকা জায়গায় তা লেখো।
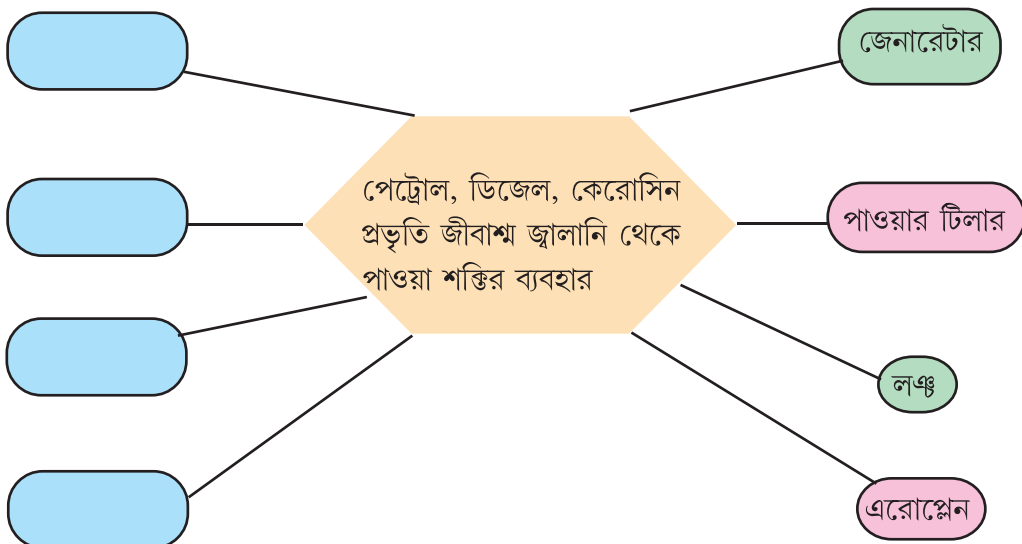
এভাবেই আরো অনেক উদাহরণ তোমরা নিজেরাই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারবে। এই ধরনের প্রচলিত শক্তির চাহিদা কি বছরের পর বছর একইরকম থাকছে?

মোটেই না। উপরন্তু দিনদিন তার চাহিদা বেড়েই চলেছে। তার একটা কারণ হলো জনস্ফীতি, আর অন্যান্য কারণ হলো নগরায়ন এবং যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা।

জনসংখ্যার সঙ্গে কোন কোন বিষয় সরাসরি যুক্ত?
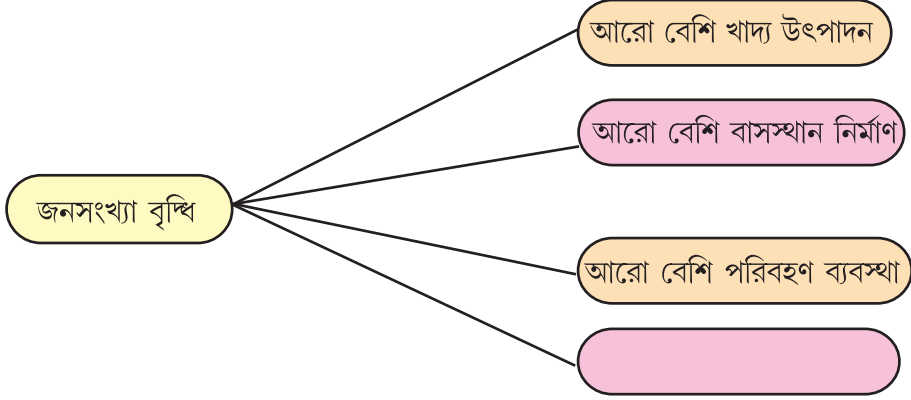
এই প্রতিটি চাহিদা পূরণের জন্যেই চাই শক্তি। আর শক্তির প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হিসাবে আমরা কী বেছে নিয়েছি?

মাটির তলায় থাকা জ্বালানির ভাণ্ডারকে; যেগুলো সবই জীবাশ্ম জ্বালানি। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়েই তৈরি করে নিয়েছি বিদ্যুৎ। আমাদের রাজ্যে বা দেশের মধ্যেও মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিংহভাগই কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎ।

ভেবে দেখো 100-150 বছর আগে লোকসংখ্যাই বা কত ছিল? তাহলে পরিবহণ, বিদ্যুতের ব্যবহার, যন্ত্রের ব্যবহার কত কম ছিল! আর এখন?

পুরোনো দিনের গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

বর্তমানে শহরের মানুষের জীবনযাত্রা

কিন্তু মাটির তলার এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ (জীবাশ্ম জ্বালানি), তার জোগান কি অফুরান?

কখনই নয়। এই কয়লা বা জ্বালানি তেল তৈরি হতে কত কোটি বছর সময় লেগেছে বলো তো?

যতদিন সময় লেগেছে এই সম্পদ তৈরি হতে, তার অনেক কম সময়েই মানুষ খরচ করে ফেলেছে তার অধিকাংশ। এইভাবে একদিন শেষ হয়ে যাবে মাটির তলার কয়লা বা খনিজ তেলের ভান্ডার।
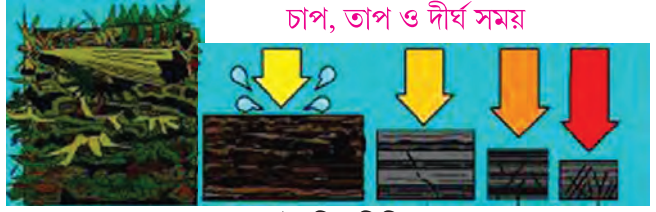
কয়লা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

জানো কি, মাটিতে ড্রিল করে প্রথম পেট্রোলিয়াম উৎপাদন শুরু হয় আমেরিকা মহাদেশে, 1859 সালে।

এই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার যত বেড়েছে, পরিবেশে বেড়েছে তার দহনে উৎপন্ন পদার্থগুলোর বহুমুখী ক্ষতিকারক প্রভাবও। এই ধরনের জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারে পরিবেশে যে যে ক্ষতিগুলো হতে পারে, তার কয়েকটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

তাহলে এর থেকে বাঁচতে গেলে আমরা কী করব? এখন যেসব প্রচলিত শক্তির ব্যবহার করছি, তার ব্যবহার কি বন্ধ করে দেবো? তখন আমাদের নীচের কাজগুলো চলবে কীভাবে?

বাড়িতে আলো জ্বালাতে হবে, পাখা, টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি চালাতে হবে।

জ্বালানি-নির্ভর পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

যন্ত্রচালিত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে যেখানে বিভিন্ন শক্তি লাগে। তবে কি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে? তাহলে এখনকার শিল্পগুলোর কী হবে?

সেজন্য আমাদের অন্য শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হবে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি করবে আমাদের। এগুলোই হলো পরিবেশবান্ধব শক্তি।

কী কী হতে পারে এই ধরনের শক্তির উৎস? এসো দেখা যাক।

সৌরশক্তি

আমরা প্রচলিত শক্তির উৎস হিসাবে যে জীবাশ্ম জ্বালানি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছি; তা আসলে উৎপন্ন হয়েছে কী থেকে?

তোমরা তো জানো সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। এই কাজে তারা কোন প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগায়? — সৌরশক্তি।

প্রাণীরাও বেশিরভাগই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রাণীরাও পরোক্ষভাবে কোন প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল? সৌরশক্তি।

এর থেকে কী বোঝা যাচ্ছে?

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে কোন শক্তি পরিবর্তিত হয়ে আবদ্ধ থাকছে? সৌরশক্তি।

উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষ কোটি কোটি বছর মাটির তলার তাপ ও চাপে থাকতে থাকতে পরিবর্তিত হয়ে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন করে।

তাহলে কয়লা বা জ্বালানি তেলে কোন শক্তি পরিবর্তিত হয়ে আবদ্ধ আছে? সৌরশক্তি।

আমরা পরোক্ষভাবে এই সৌরশক্তির উপর এভাবে নির্ভর না করে কি সরাসরি সৌরশক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না?

এই চিন্তা থেকেই ব্যবহার শুরু হয়েছে সৌরকোশের। দিনের বেলায় যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে অবিরাম এসে পৌঁছোয়, তাকে কাজে লাগিয়েই এই সৌরকোশে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তারপর সৌরপ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা যায়। রাতের বেলা বা কম সূর্যের আলোতেও তা ব্যবহার করা যায়।

নীচের ছবিগুলো লক্ষ করো। দেখো কত নানারকম ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার করা হয়।

বিদেশে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার হয়ে আসছে সৌরশক্তির। এখন আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে তার ব্যবহার। তুমি কোথাও এরকম ব্যবহার দেখেছ কি? জানলে নীচে তা উল্লেখ করো:

কোন জায়গায় সৌরশক্তির ব্যবহার হচ্ছে? ....।

কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে? ....।

আশা করা যায়, আগামী দিনে সৌরশক্তির আরও ব্যাপক ব্যবহার আমরা দেখতে পাব।

কিন্তু সৌরপ্যানেল থেকে আবার পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

অতটা হবে না, কারণ এমনিতেই এইসব প্যানেল 10-15 বছর ঠিক থাকে। তাছাড়াও এই প্যানেলের পুনর্নবীকরণ করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। তবে সৌরকোশ তৈরি করতে শুরুতে কিছুটা প্রচলিত শক্তি ব্যয় করতে হয়।

বায়ুশক্তি

আমাদের পরিচিত আরো একটা পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস প্রায় অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। তাহল বায়ু প্রবাহের শক্তি।

বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বড়ো মাপের বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা সম্ভব। আমাদের রাজ্যের বকখালিতে গেলে দেখতে পাবে— বড়ো বড়ো বায়ুকল (Wind mill) কীভাবে এইকাজে সাহায্য করছে।

বায়ুপ্রবাহের শক্তি ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা হতে পারে আমাদের?

1. বায়ুর কোনো অভাব নেই।
2. একবার বায়ুকল বসালে দীর্ঘদিন চলবে।
3. যেসমস্ত জায়গায় দূর থেকে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎ আনা সম্ভব নয়, সেখানে বায়ুশক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

আমাদের রাজ্যের অন্য কোনো জায়গায় অথবা ভিনরাজ্যের কোনো জায়গায় বায়ুকল দেখে থাকলে জায়গাটার নাম লেখো : ....।

জানার চেষ্টা করো বায়ু শক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

জৈবশক্তি

অন্য একটা অপ্রচলিত কিন্তু পরিবেশবান্ধব শক্তি-উৎস কী হতে পারে?

জৈব বর্জ্য বা জৈব উৎসজাত (উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ) পাওয়া জিনিস থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস।

ধরো, তোমার এলাকায় কারোর ছোটো বা বড়ো মাপের পশুখামার আছে। অথবা কারোর মুরগির পোলট্রি আছে। তাহলে তাদের মল ফেলা হলে তা পরিবেশে একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। কীভাবে তা কাজে লাগানো যায়?

এই সমস্ত গৃহপালিত পশু-পাখির মল বড়ো গর্তে পচিয়ে তার থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হবে, তা কাজে লাগানো যেতে পারে। কী কী কাজে?

একটু ভেবে, লেখার চেষ্টা করো (প্রয়োজনে শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নাও):

1. ....।
2. ....।

জৈব বর্জ্য থেকে জ্বালানি গ্যাস উৎপন্ন করার ব্যবস্থা

এভাবেই পৌরসভার পচনযোগ্য জৈব বর্জ্য বা কচুরিপানার মতো আগাছা কাজে লাগানো যাবে কিনা, তা আলোচনা করো। এগুলো কীভাবে কাজে লাগানো যাবে।..।

এই কয়েকটি পরিবেশবান্ধব শক্তি ছাড়াও আরো কয়েকটা অপ্রচলিত শক্তির বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন

বিজ্ঞানীরা। সেগুলো কী কী?

জোয়ারভাটার শক্তি, মাটির নীচের তাপশক্তি ইত্যাদি।

এরপরও সত্যিকারের পরিবেশবান্ধব হতে গেলে আমাদের আরো একটু সতর্ক হতে হবে। কী কী বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে?

যথাসম্ভব শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এখনকার মতোই যদি কয়লা বা খনিজ তেলের মতো জ্বালানির ব্যবহার চলতে থাকে, তবে হয়তো আরো 40 থেকে 50 বছর চলতে পারে অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে। কিন্তু তারপর কী হবে? তাই শক্তির অপব্যবহার কমাতে হবে।

উপযুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা বা খনিজ তেল থেকে অন্যান্য কম দূষক জ্বালানি তৈরি করা যেতে পারে। এভাবে কয়লা বা খনিজ তেলের প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের আয়ু দীর্ঘায়িত করা যাবে।

অন্য আরো একটা জ্বালানি কী হতে পারে বলো তো? ....।

মাটির তলায় বা পাহাড়ের ফাটলে আবদ্ধ জ্বালানি গ্যাসের উৎস থেকে যে গ্যাস আমাদের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা কাজে লাগাতে সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের মতো নদীমাতৃক দেশে গভীর নলকূপের জল সেচের কাজে বা পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহার না করে, এই সমস্ত কাজে নদীর জল ব্যবহার করলে মাটির তলা থেকে জল তোলার জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত শক্তির অনেকটাই বাঁচানো যায়।

যেখানে সুবিধা আছে সেখানে জলপথে পরিবহণের যন্ত্রহীন নৌকার ব্যবহার বাড়ানোর কথা ভাবা যেতে পারে। সাইকেলের মতো পরিবহণ — যার মধ্যে কোন জ্বালানি লাগে না, এরকম পরিবহণ আরো বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনে সাইকেলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। তার জন্য রাস্তায় সাইকেল যাবার আলাদা পথ নির্দিষ্ট করা আছে।

আমোদপ্রমোদে অতিরিক্ত পরিমাণ শক্তি ব্যবহার না করে, মানব কল্যাণের কথা ভাবা প্রয়োজন।

অপ্রচলিত পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সচেতনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

2 সময় ও গতি

গতির ধারণা

নীচের বর্ণনাগুলি থেকে উপযুক্ত উত্তর বেছে নিয়ে সারণিটি পূর্ণ করো।

1. সরলরৈখিক গতি
2. বৃত্তাকার পথে গতি
3. ঘূর্ণন গতি
4. ঘূর্ণন ও সরলরৈখিক গতির মিশ্রণ
5. বক্রপথে গতি।

বিভিন্ন ধরনের গতির উদাহরণ	কেমনভাবে গতিশীল
(1) রুলারের ধার বরাবর পেনসিল দিয়ে সোজা দাগ কাটার সময় পেনসিলের শিসের অগ্রভাগের গতি।	সরলরৈখিক গতি
(2) ঘড়ির কাঁটার অগ্রভাগের গতি।	
(3) ছাদ থেকে সামনের দিকে ছুড়ে দেওয়া পাথরের গতি	
(4) নাগরদোলার গতি	
(5) এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খেতে থাকা লাট্টুর গতি	
(6) ঘড়ির পেন্ডুলামের গতি	
(7) সোজা রাস্তা বরাবর চলন্ত গাড়ির গতি	
(8) সরলরেখা বরাবর চলন্ত সাইকেলের চাকার গতি	
(9) স্ক্রু-ডাইভারের গতি	
(10) বৈদ্যুতিক পাখার গতি	

পাশে যে পাতার চিত্রটি আছে একটি পিঁপড়ে তার ধার বরাবর A থেকে B -তে যাচ্ছে। খাতায় তার গতিপথের চিত্র অঙ্কন করো।

পিঁপড়েটি যদি পাতার কিনারা ধরে না গিয়ে পাতার মোটা শিরা বরাবর A থেকে B -তে যেত তাহলে তার গতিপথের চিত্র কেমন হতো তা খাতায় আঁকো।

তোমার আঁকা চিত্র থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজো :

প্রথমে A থেকে B -তে যাওয়ার সময় পিঁপড়ের গতিপথের অভিমুখ কি সবসময় একই দিকে ছিল?

দ্বিতীয়বার তার গতির অভিমুখ কি সবসময় একই দিকে ছিল?

এইরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ ভাবার চেষ্টা করো যেখানে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় বিভিন্ন পথে যাওয়া যায়। প্রত্যেকটি উদাহরণের কথা খাতায় লেখো ও তার গতিপথের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করো।
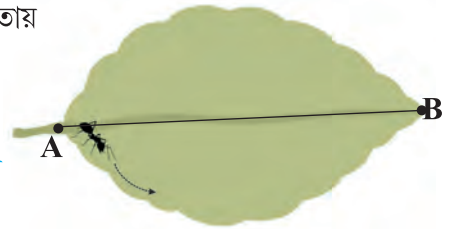
আগের আলোচনায় পিঁপড়েটি প্রথমে যে পথে পাতার কিনারা বরাবর A থেকে B -তে পৌঁছোল তার সমগ্র দৈর্ঘ্য হলো পিঁপড়ের প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব। এক্ষেত্রে পিঁপড়েটি যদিও AB সরলরেখা ধরে যায়নি, তবু AB সরলরেখার দৈর্ঘ্য এই যাত্রার একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়। A থেকে B এর দিকে AB সরলরেখার এই মাপকে বলে সরণ। এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব ও সরণের মাপ আলাদা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে A থেকে নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে সরাসরি B -তে যাওয়ার যে পথ, তার দৈর্ঘ্য এবং ওই নির্দিষ্ট দিক একত্রে উল্লেখ করলে তাকে বলা হয় সরণ। এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব আর সরণের মাপ একই, কারণ পিঁপড়েটি সত্যিসত্যি AB সরলরেখা ধরেই গিয়েছিল।

অতএব দেখলে যে, কোনো গতির সময় আসল যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য এবং সরণের দৈর্ঘ্য আলাদা হতে পারে বা একই হতে পারে। এই দুয়ের মধ্যে সরণ সরলরেখা বরাবর এবং তাই একটি নির্দিষ্ট দিক উল্লেখ করে গতির বর্ণনা দেওয়া যায়। যেমন A থেকে B -তে যাবার সময় যাত্রাপথ যখন পাতার ধার বরাবর, তখন পিঁপড়েটি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যাচ্ছে, ফলে এক এক সময় এক এক দিকে যাওয়ার প্রবণতা থাকছে। ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হচ্ছে। যেমন A থেকে P -তে বাঁকা পথে যাবার সময় AP সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হবে। P থেকে Q -তে বাঁকা পথে যাবার সময় PQ সরলরেখাংশ এঁকে সরণ বুঝতে হবে।

ফলে, A থেকে যাত্রা শুরুর সময় পিঁপড়েটির যাবার প্রবণতা P -এর দিকে, আবার P বিন্দু দিয়ে যাবার সময় যাবার প্রবণতা Q -এর দিকে .... ইত্যাদি। অতএব, আঁকাবাঁকা যাত্রাপথে, চলার দিক ঠিক কোনটি তা হয়তো ওই মুহূর্তে বলা যায়, কিন্তু শেষ অবধি ঠিক কোন দিকে যাওয়া হলো তা যাত্রাপথের শেষ বিন্দুটি না জানলে বলা যায় না। শেষ বিন্দুটি জানা হয়ে গেলে তখন বলা যায় যে, A থেকে B -এর দিকে যাওয়া হয়েছে। বোঝা গেল যে, সরণ জানা থাকলে তবেই যাত্রার অভিমুখ বলা যায়, অন্যথায় নয়।
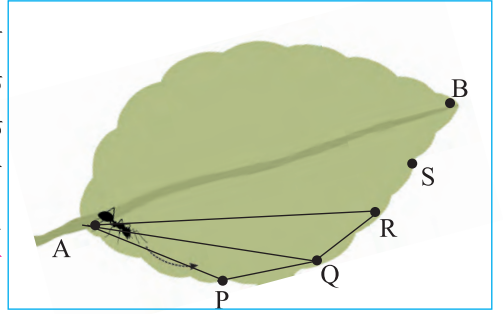
ছবিতে যেমন দাগ দেওয়া আছে সেইরকমভাবে A থেকে B -তে যাওয়া হলে সরণ AB এবং তা A থেকে B -এর দিকে, তেমনি A থেকে P -তে যাওয়া হলে সরণ AP এবং তা A থেকে P -এর দিকে।
একইভাবে P থেকে Q -তে যাবার সময়, সরণ PQ এবং তা P থেকে Q -এর দিকে ইত্যাদি।

তাহলে, কোনো একটি বস্তু যদি একটি বিন্দু M থেকে অন্য একটি বিন্দু N পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে যাত্রা করে, আমরা বস্তুটির যাত্রাপথের দু-রকম দৈর্ঘ্যের হিসাব করতে পারি। একটি হলো আঁকাবাঁকা পথটির মোট দৈর্ঘ্য, আর অন্যটি হলো MN সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য, যদিও বস্তুটি MN সরলরেখা ধরে সত্যি সত্যি যাত্রা করেনি। এই MN সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য হলো বস্তুটির সরণের মাপ।
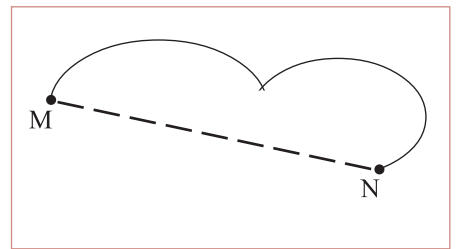
দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ

যে-কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে একটা সময় লাগে। ঘড়ি ধরে সেই সময় মাপাও যায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন, দূরত্ব
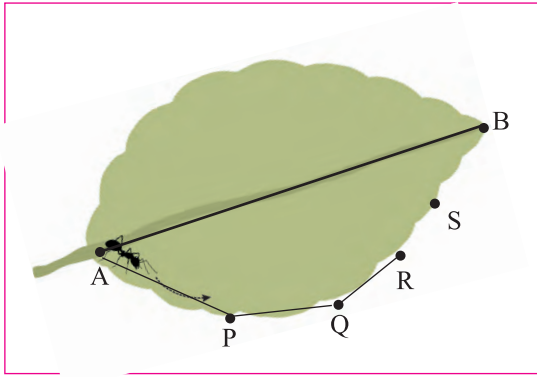
বলতে আমরা ঠিক কি বুঝব? A থেকে P -তে যাবার সময় পাতার ধার ধরে গেলে বাঁকা রাস্তার পরিমাপ, না কি, A থেকে P পর্যন্ত সরলরেখাংশ AP -র পরিমাপ? একইভাবে A থেকে B -তে যাওয়ার সময় পাতার ধার বরাবর আঁকাবাঁকা পথটির পরিমাপ, না কি AB সরলরেখাংশের পরিমাপ? — আমরা যদি বক্র পথটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে সেই দূরত্বকে আমরা বলি প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং যদি সরলরেখাংশ বরাবর দৈর্ঘ্য মাপি তাকে বলি সরণ। এবার যদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব কীভাবে বদলাচ্ছে তা হিসাব করতে চাই তাহলেও দু-ভাবে তা করতে পারি— সময়ের সঙ্গে প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব কীভাবে বদলাচ্ছে এবং সরণ কীভাবে বদলাচ্ছে। দুটি হিসেব কিন্তু এক না-ও হতে পারে।

একটি উদাহরণ

যাত্রাপথের মাপ		যেতে সময় লেগেছে
প্রকৃত দূরত্ব (সেমি)	সরণ (সেমি)	
A থেকে P = 5	AP = 2	5 সেকেন্ড
A থেকে Q = 10	AQ = 3	10 সেকেন্ড
A থেকে R = 15	AR = 4	15 সেকেন্ড
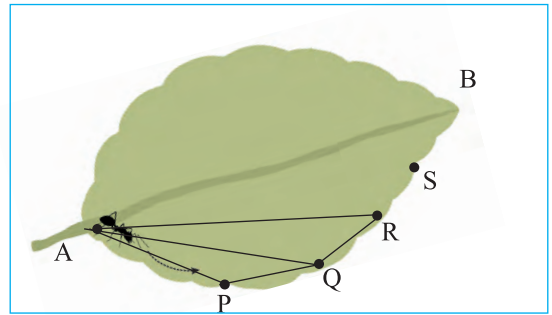
এখন যদি কেউ জানতে চায় যে প্রতি সেকেন্ডে পিঁপড়েটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তাহলে দুটি উত্তর হতে পারে— একটিতে দূরত্ব বলতে প্রকৃত দূরত্ব, আর অন্যটিতে দূরত্ব বলতে সরণের মাপ ধরলে উত্তর আলাদা হবে, যদিও একই পিঁপড়ের একই গতি নিয়ে হিসেব হচ্ছে।

5 সেকেন্ডে পিঁপড়ের প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব 5 সেমি

অতএব 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব $= \frac{5 \text{সেমি}}{5} = 1$ সেমি

একই সঙ্গে বলা যায়, 5 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির সরণ 2 সেমি

অতএব 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটির সরণ $= \frac{2 \text{সেমি}}{5} = 0.4$ সেমি

প্রথম হিসেবটিকে বলে গড় দ্রুতি এবং দ্বিতীয়টি হলো গড়বেগ। 'গড়' বলার কারণ এই যে, আমরা কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই হিসেবে করছি না। সময়ের একটি ব্যবধানে এই হিসেবে করছি। এই 5 সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিটি 1 সেকেন্ডে পিঁপড়েটি কি সমান দূরত্ব গেছে? না কি প্রথম 1 সেকেন্ডে যতটা গেছে, পরের 1 সেকেন্ডে তার চাইতে বেশি গেছে, তারপরের 1 সেকেন্ডে একটু কম গেছে .... এরকম বিভিন্ন 1 সেকেন্ডে আলাদা আলাদা দূরত্ব গেছে? আমরা যে হিসেবে উপরে অঙ্ক কষে বের করলাম তাতে কিন্তু একটি হিসেবই বেরিয়েছে— প্রতি 1 সেকেন্ডে সরণ হয়েছে 0.4 সেমি এবং সেটা ওই 5 সেকেন্ডের ভেতরকার সব 1 সেকেন্ডের জন্য একই। প্রকৃত দূরত্বের বেলাতেও তাই। প্রতি 1 সেকেন্ডে 1 সেমি করে। এই যে আমরা একটা সার্বিক হিসেব পেলাম, ভেতরের আসল খুঁটিনাটি জানতে পারলাম না, সেজন্য এই হিসেব হলো গড় হিসেব।

কোনো গতিশীল বস্তু এক সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করল (তা সে প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্বই হোক বা সরণই হোক) তা থেকে বস্তুটি কত দ্রুত চলছে তার হিসেব পাওয়া যায়।

ট্রেনে বা বাসে চড়ার সময় তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, প্রথম চালু হবার পর ট্রেন বা বাসের গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে অর্থাৎ আরো বেশি জোরে চলতে থাকে। এই সময় ট্রেন বা বাসের বেগ আগে যা ছিল পরে তার চাইতে বেশি হয়। ঠিক তেমনি যখন স্টেশনে বা বাস স্টপে থামার দরকার হয় তখন গাড়িটির গতি ক্রমশ কমতে থাকে। এক সেকেন্ডে আগে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করছিল পরে তার চাইতে কম দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ আগে যা বেগ ছিল পরে সেই বেগ কমে যায়।

বেগ বাড়তে অথবা কমতে থাকার সময় এক সেকেন্ডে বেগ কতটা বাড়ল বা কতটা কমল তার পরিমাণকে বলে ত্বরণ (Acceleration)। তুমি একটা সাইকেলে চড়ে এক সেকেন্ডে 5 মিটার বেগে চলছিলে। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখে তুমি বুঝতে পারলে বৃষ্টি আসছে। বৃষ্টি নামার আগে বাড়িতে পৌঁছোতে হলে বেগ বাড়াতে হবে। অবশেষে বেগ বাড়িয়ে 1 সেকেন্ডে 8 মিটার করলে। এই বেগ বাড়াতে তোমার সময় লাগল 3 সেকেন্ড।

তাহলে, প্রথমে তোমার বেগ ছিল প্রতি সেকেন্ডে 5 মিটার অর্থাৎ 5 মি/সেকেন্ড

3 সেকেন্ড পর তোমার বেগ হলো প্রতি সেকেন্ডে 8 মিটার অর্থাৎ 8 মি/সেকেন্ড

3 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন = (পরের বেগ) – (আগের বেগ) = (8 মি/সেকেন্ড) - (5 মি/সেকেন্ড) = 3 মি/সেকেন্ড

অতএব, 1 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন $= \frac{3 \text{ মি/সেকেন্ড}}{3}$ = 1মি/সেকেন্ড।

∴ এক্ষেত্রে বেগ পরিবর্তনের হার = 1 মি/সেকেন্ড^2।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার ত্বরণ = 1 মি/সেকেন্ড^2।

যখন তুমি বাড়ির অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তখন সাইকেলের ব্রেক কষলে সাইকেলের বেগ কমতে থাকল। এইভাবে 2 সেকেন্ড পর সাইকেল নিয়ে তুমি বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লে।

অর্থাৎ এখন তোমার সাইকেলের বেগ হলো শূন্য (zero)।

এক্ষেত্রে প্রথমে তোমার বেগ ছিল 8 মি/সেকেণ্ড।

2 সেকেণ্ড পর তোমার বেগ হলো 0 মি/সেকেণ্ড।

2 সেকেণ্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন = (পরের বেগ) – (আগের বেগ)

= 0 মি/সেকেন্ড – 8 মি/সেকেন্ড

= – 8 মি/সেকেন্ড

অতএব, 1 সেকেন্ড সময়ে বেগের পরিবর্তন = $\frac{-8 \text{ মি/সেকেন্ড}}{2}$

= – 4 মি/সেকেন্ড

∴ এক্ষেত্রে বেগ পরিবর্তনের হার = – 4 মি/সেকেন্ড^2

এক্ষেত্রে ত্বরণ ঋণাত্মক। একে **ঋণাত্মক ত্বরণ** বা **মন্দন** (Retardation) বলে।

এই যে আমরা ত্বরণ হিসেব করলাম, এটাও কিন্তু গড় হিসেব। একটি সময়ের ব্যবধানে করা সামগ্রিক হিসেব, নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তের হিসেব নয়।

বলের ধারণা ও নিউটনের গতিসূত্রের ধারণা, বলের পরিমাপ

একটা রবারের বলকে সমান মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে দাও। এবার ফিতে বা স্কেল দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গেল।

এখন ঘাস আছে এমন মাঠের উপর দিয়ে ওই বলটাকে একই জোরে গড়িয়ে দাও। এবারও মেপে দেখো বলটা কতদূর গেল।
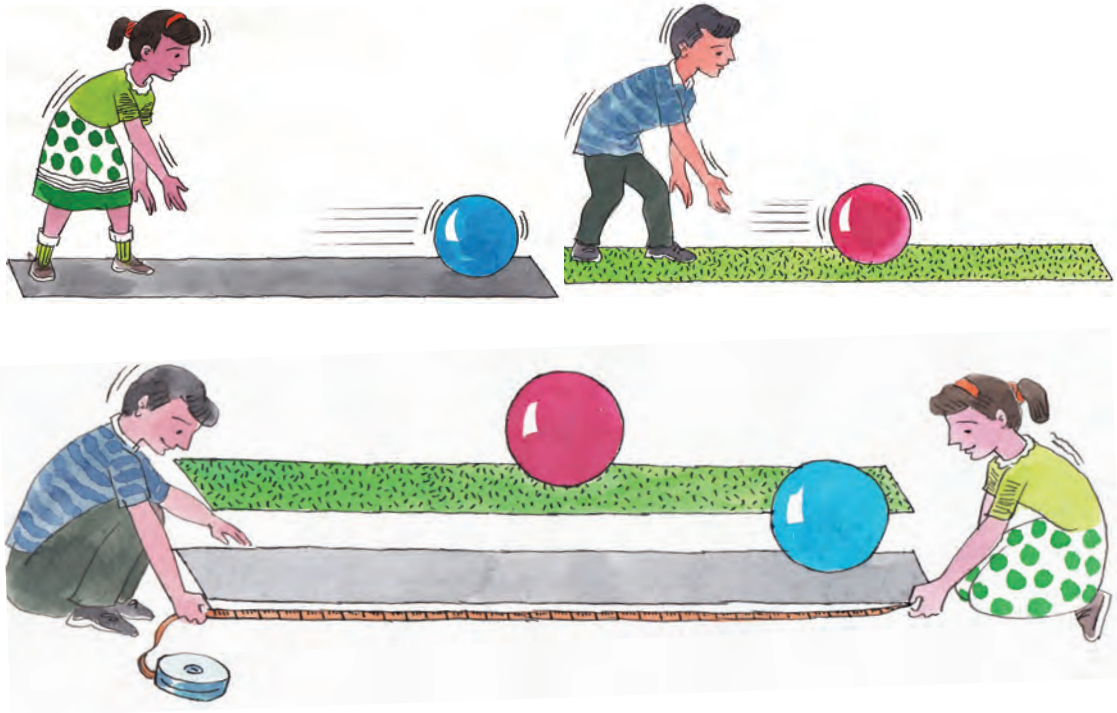
মেঝের উপর দিয়ে বলটা যতদূর গেল, ঘাসের উপর দিয়ে ততটা যেতে পারল না কেন?

বলটা (Ball) দুই ক্ষেত্রেই এক সময় থেমে গিয়েছিল। তাহলে কি বলটা গড়াবার সময় বাধা পেয়েছিল? বলটা চলতে বাধা পেয়েছিল বলেই কি থেমে গেল?

কোন ক্ষেত্রে বলটা (Ball) বেশি বাধা পেয়েছিল?

ভেবে বলো তো বল (Ball)টা যদি কোনো বাধা না পেত তবে কী হতো?

হাতেকলমে 1

টেবিলের উপর একটা বাঁধানো বই রাখো।
এবার বইটাকে বাঁ হাত দিয়ে পাশ থেকে ডানদিকে ঠেলো।

বইটা কোন দিকে সরে গেল?

এবার একইরকমভাবে বইটাকে ডান হাত দিয়ে উলটোদিকে ঠেলো।

এবার বইটা কোন দিকে সরলো?

এবার, দু-হাত দিয়ে বইটার দু-পাশ থেকে পরস্পর উলটো দিকে ঠেলো। এমনভাবে ঠেলো যাতে বইটা কোনো দিকেই সরে না যায়।

ভেবে দেখো বইটা কোনোদিকেই না সরে যাওয়ার কারণ কী?

যদি কোনো একদিকের ঠেলা, অন্য দিকে ঠেলার চেয়ে বেশি জোরালো হতো, তবে কী হতো? এরকম ঠেলা বা ধাক্কা-কে আমরা বলি **বল (force)**।

তাহলে দেখা গেল, কোনো বস্তুর ওপর পরস্পর বিপরীত দিক থেকে সমমানের বল (force) প্রয়োগ করলে, বস্তুটার ওপর '**সার্বিক বল**' শূন্য হয়ে যায়।

রঞ্জনা পড়ার টেবিলে পড়তে বসে ভাবে ওর বিজ্ঞান বইটাকে যদি ও কোনোদিন না সরায় এবং অন্য কেউও যদি তা না করে তবে ওর বিজ্ঞান বইটা কী চিরকালই ওই অবস্থায় থাকবে?

ভেবে দেখো, রঞ্জনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারো কিনা।

টেবিলের উপরে রাখা তোমার বিজ্ঞান বইটা তুমি সরাতে চাইলে তোমাকে কী করতে হবে?

বল প্রয়োগে বস্তুর গতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন। চলো ওই সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

স্যার আইজাক নিউটন

1642 খ্রিস্টাব্দে 25 ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের উলসথর্প গ্রামে এক চাষির পরিবারে জন্ম। 1665 খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ। 1669 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 27 বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন।

তাঁর গতিসূত্র, মহাকর্ষসূত্র, সূর্যরশ্মির বর্ণালি, আলোর কণিকাতত্ত্ব, দ্বিপদ উপপাদ্য, ক্যালকুলাস বিজ্ঞান ও গণিতের জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তিনি 1672 খ্রিস্টাব্দ থেকে টানা 25 বছর রয়্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। 1727 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'প্রিন্সিপিয়া'**।
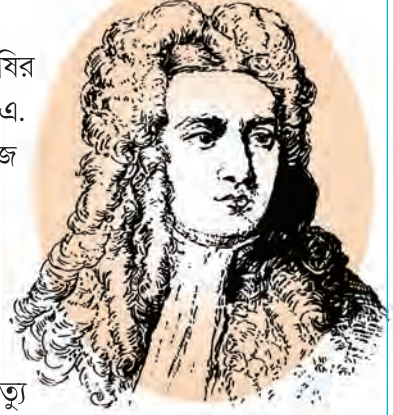
নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের ধারণা :

কোনো বস্তুর ওপর যদি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে—

(i) স্থির বস্তু চিরকাল স্থিরই থেকে যাবে,

(ii) আর গতিশীল বস্তু আগে থেকেই যে দিকে যে বেগ নিয়ে চলছিল সেদিকে সেই বেগ নিয়ে চিরকাল চলতে থাকে।

তাহলে দেখা গেল যে,

বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হলে, কোনো স্থির বস্তু হয় চিরকাল স্থির, বা সমবেগে সরলরেখা বরাবর গতিশীল কোনো বস্তু চিরকাল ওই একই গতিতে একই সরলরেখা ধরে চলতে থাকে। স্থির থাকা বা একই বেগে চলতে থাকার এই ধর্মকে বলে বস্তুর **জাড্য**। স্থির থাকার ধর্মকে **স্থিতিজাড্য**। আর সমবেগে গতিশীল থাকার ধর্মকে **গতিজাড্য** বলা হয়। আর বাইরে থেকে যা প্রয়োগ করলে এই অবস্থা বদলে দেওয়া যায় তাকে বলে **বল**।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জাড্য

(1) স্থির বাস হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলে কোনো কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রী পিছনদিকে হেলে পড়ে। কোনো কিছু ধরে থাকা যাত্রীদেরও ওই একইরকম অনুভূতি হয়। থেমে থাকা বাসে যাত্রীরাও থেমে থাকে। সব কিছু তখন স্থির অবস্থায় রয়েছে। বাস হঠাৎ চলতে শুরু করল, ফলে বাসের স্থির অবস্থা পালটে গেল। বাসের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের পা চলতে শুরু করল কারণ পা বাসের মেঝের সংস্পর্শে আছে। কিন্তু যাত্রীদের বাকি শরীর স্থির থাকতে চাইল। অতএব পায়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোল না। যাত্রীরা তাই পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

(2) তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ কাক (বা অন্য কোনো পাখি) উড়তে উড়তে ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দিয়েও দিব্যি ডানা মেলে বাতাসে ভাসতে ভাসতে অনেকটা এগিয়ে যায়—

ডানা ঝাপটানো বন্ধ করেও কাকটা কি করে ভাসতে ভাসতে অতটা এগিয়ে গেল বলো তো?

পাখিটা যখন উড়ছে তখন সে গতিশীল, ফলে পাখি উড়তে উড়তে ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দিলেও তার গোটা শরীরটা গতিজাড্যের জন্য তখনও সমবেগ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, ফলে পাখিটা শুধু ডানা মেলে (না ঝাপটিয়েও) অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারে।

হাতেকলমে 2

তোমার টেবিলের ফাঁকা ড্রয়ারটার বেশিরভাগ অংশটা খোলো। এবার একটা পেনসিল পাশের ছবির মতো করে রাখো।

পেনসিলটাকে দেখা যায় এমনভাবে রেখে ড্রয়ারটা একটু জোরে বন্ধ করো। আবার খোলো।

কী দেখতে পেলে?

বন্ধ করার সময় পেনসিলটা কোন দিকে গড়াচ্ছে?

খোলার সময় পেনসিলটা কোন দিকে গড়াচ্ছে?

কেন এমন হলো?

হাতেকলমে 3

একটা খাতার পাতা যত বড়ো হয় তত বড়ো কাগজ নাও। ছবির মতো করে কাগজটা টেবিলের ওপর রাখো। এবার ওই কাগজের ওপরে তোমার পেনসিল বাক্সটা রাখো। এখন ওই কাগজের একটা প্রান্ত ধরে কাগজটাকে এক ঝটকায় এমনভাবে টানো যাতে পেনসিল বাক্সটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকে এবং নড়ে না যায়।
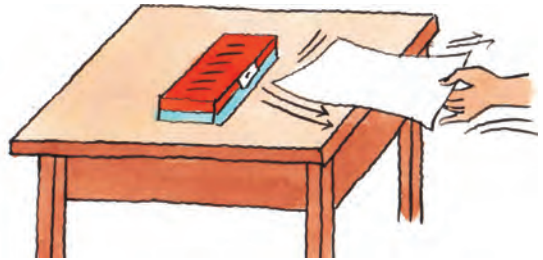
ভেবে বলো তো এরকম হলো কেন? নিউটনের প্রথম সূত্রে তোমরা জাড্য ধর্মের কথা জেনেছ। ওই সূত্র ব্যবহার করে এই ঘটনা কেন ঘটল বলতে পারো কি?

ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো তো নীচের ঘটনাগুলোতে জাড্য ধর্ম (গতিজাড্য বা স্থিতিজাড্য) খুঁজে পাও কিনা? বিষয়গুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

কুলো দিয়ে চাল ঝাড়া (চাল থেকে ধানের তুষ বার করা) হয়।

চলন্ত অটোরিকশা হঠাৎ বাধ্য হয়ে ব্রেক কষে থেমে গেলে, যাত্রীরা সামনের দিকে (অটোরিকশার গতির দিকে) ঝুঁকে পড়ে।

সাইকেল চালাতে চালাতে পা চালানো থামিয়ে দিলেও সাইকেল সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় না, পা না চালিয়েও বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

কোটের ধুলো ঝাড়তে কোটকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

ধুলোমাখা কোটের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলে (খুব জোরে নয়) ধুলো কোট থেকে আলাদা হয়ে পড়ে।

স্পোর্টসের মাঠে লং জাম্প দেবার সময়, প্রতিযোগী অনেকটা দূর থেকে দৌড়ে আসে।

দেয়ালের গায়ে ডাস্টার ঝাড়া হয়।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের ধারণা :

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা জেনেছি, বাইরে থেকে 'বল' প্রয়োগ করা হলে একটি বস্তুর বেগ বদলে যায়। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসরণ করে বলা যায় , (i) একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা বল যত বাড়ানো হবে, 1 সেকেন্ডে বস্তুটির বেগের পরিবর্তনও (অর্থাৎ ত্বরণ) তত বাড়বে। প্রযুক্ত বলের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে, উৎপন্ন ত্বরণও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ বল ও ত্বরণ -এর মধ্যে সরল সম্পর্ক রয়েছে।

(ii) বল প্রয়োগের অভিমুখ যে দিকে, উৎপন্ন ত্বরণের অভিমুখও সেই দিকে। অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের দিকেই বস্তুর বেগ বৃদ্ধি পায়।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসরণ করে প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয়ের সমীকরণ :

প্রযুক্ত বল = বস্তুর ভর × এক সেকেন্ডে বস্তুর বেগের পরিবর্তন

= বস্তুর ভর × বস্তুতে উৎপন্ন ত্বরণ (যেহেতু, 1 সেকেন্ডে বেগের পরিবর্তন = ত্বরণ)

$F = m \times a$ [F-বল, m-ভর, a- ত্বরণ]

SI পদ্ধতিতে বলের (Force) একক 1 নিউটন। 1 নিউটন = 1kg × 1 মিটার/সেকেন্ড^2

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের ধারণা :

রেশমা দিদিমণির সঙ্গে গিয়েছিল কলকাতায়। বাড়িতে ফেরার পথে রেশমা যখন সবার শেষে লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামল তখন রেশমা অবাক হয়ে গেল — কী আশ্চর্য, নৌকাটা জলে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন?

দিদিমণি বললেন, ভালো করে ভেবে দেখো, নৌকাটা তো আর এমনি এমনি সরে যায়নি।

রেশমা বলল, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নৌকাটাকে পিছনদিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে কে ঠেলল? আমিই তো সব শেষে নামলাম।

তবে তুমিই বল প্রয়োগ করেছ। কারণ তুমি আর নৌকা ছাড়া সেখানে তৃতীয় কেউ তো ছিল না।

আমি তো লাফ দিয়ে নেমেছিলাম! ও ! বুঝতে পেরেছি আমি লাফ দিয়ে নামার সময় নৌকাটাকে তো পিছনদিকে ঠেলেছিলাম।

ঠিক ধরেছ, ওই ঠেলাই নৌকাটাকে পিছনদিকে সরিয়ে দিয়েছে।

তাহলে আমি কীভাবে সামনের দিকে লাফাতে পারলাম? আমাকে তো কেউ সামনের দিকে ঠেলে দেয়নি!

দিদিমণি হেসে বললেন, তোমার প্রশ্নেই তোমার উত্তর লুকিয়ে আছে।

আমার প্রশ্নে কী উত্তর লুকিয়ে আছে দিদি, আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন।

তার মানে তোমাকে কেউ ঠেলেছেই ঠেলেছে।

আমার পিছনে নৌকা ছাড়া আর তো কেউ ছিল না! তাহলে কি নৌকাটাই আমাকে ঠেলল।

একদম ঠিক। ওই নৌকাই, তোমার দেওয়া বলের ঠিক উলটো দিকে, সমান জোরে, তোমার পায়ে বলপ্রয়োগ করেছে। আর ওই বল তোমাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভারি মজার ব্যাপার তো। তাহলে আমি যেখানেই বল প্রয়োগ করি না কেন, সেও আমায় সমান জোরে আমার দেওয়া বলের উলটোদিকে বল প্রয়োগ করবে?

স্যার আইজাক নিউটন তাঁর তৃতীয় গতিসূত্রে সে কথাই তো বলেছেন।

কী রকম?

নিউটন বলেছেন — '**প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী একটা প্রতিক্রিয়া বল আছে।**'

তাহলে দিদি আমার আর নৌকার বলের মধ্যে কোনটা '**ক্রিয়া**' আর কোনটা '**প্রতিক্রিয়া**'?

আসলে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া ওভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ 'ক্রিয়া' আর 'প্রতিক্রিয়া'

সবসময় একসঙ্গেই ঘটে। একটা আগে আর একটা পরে, এভাবে নয়। তাই যে-কোনো একটা 'ক্রিয়া' হলে, অন্যটা হবে তার 'প্রতিক্রিয়া'।

তাহলে দিদি এই **'ক্রিয়া' আর 'প্রতিক্রিয়া' আলাদা আলাদা বস্তুর উপর কাজ করে**, তাই না।

ঠিক ধরেছ, তোমার বল প্রয়োগ হয়েছে নৌকার ওপর, আর নৌকার বল প্রয়োগ হয়েছে তোমার পায়ের উপর।

নীচের ঘটনাগুলোতে নিউটনের তৃতীয় সূত্র কীভাবে কাজ করছে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো।

1. আমরা যখন হাঁটি
2. জলে মাছ সাঁতার কাটে।

শক্তি ও কার্য

তুমি অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে, তোমার কাজ করার সামর্থ্য কমে যায়।

এরপর যখন তুমি খাবার খাও তখন আবার কাজ করার 'সামর্থ্য' ফিরে পাও কি?

খাবার থেকে আমরা নিশ্চয়ই এমন কিছু পাই যা আমাদের **'কাজ করার সামর্থ্য'** জোগায়। খাবার থেকে আমরা পাই শক্তি। **কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি**।

1) মোটামুটি ভারী 10টা বই আর 10টা খাতা জোগাড় করো। তোমার স্কুলের ব্যাগের মধ্যে 10টা বই আর 10টা খাতা ভরো। এবার ব্যাগটা মেঝে থেকে চেয়ারের উপর তোলো। তারপর ব্যাগটা মেঝে থেকে আলমারির উপর তোলো।

এখন বলো (i) পৃথিবীর টানের (মানে ব্যাগের ওজনের) উলটোদিকে ব্যাগটাকে ওঠাতে দুই ক্ষেত্রেই কী তোমাকে সমান **'বল'** প্রয়োগ করতে হয়েছে?

(ii) কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি **'পরিশ্রম'** করতে হয়েছে?

2) তুমি তোমার ওই স্কুল ব্যাগে আবার 10টা বই 10টা খাতা নাও। এখন ব্যাগটা মেঝে থেকে টেবিলে তোলো। এবার ব্যাগ থেকে 10টা খাতা ও 5 টা বই নামিয়ে রাখো। তারপর আবার মেঝে থেকে ব্যাগটা টেবিলে তোলো।

এখন বলো (i) ব্যাগের ওজনের উলটোদিকে কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি **'বল'** প্রয়োগ করতে হলো?

(ii) কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি '**পরিশ্রম**' করতে হলো?

1 নং পরীক্ষায় দেখা গেল একই ওজনের বস্তুকে যত বেশি উঁচুতে তোলা যায় তত বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যদিও দুই ক্ষেত্রেই সমান সমান বল প্রয়োগ করতে হয়েছে।

2 নং পরীক্ষা থেকে দেখা গেল বিভিন্ন ওজনের বস্তুকে একই উচ্চতায় তোলার সময় যে বস্তু যত বেশি ভারী তার জন্য তত বেশি বল লাগে ও পরিশ্রমও বেশি করতে হয়।

1 ও 2 নং পরীক্ষা দুটির অভিজ্ঞতা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে সাধারণভাবে যে কাজে '**পরিশ্রম বেশি**' সে কাজের জন্য তোমার **শক্তিও বেশি খরচ করতে হয়**।

যেখানে '**শক্তি বেশি**' খরচ করতে হয় সেখানে কাজের পরিমাণও বেশি হয়।

তাহলে দেখা গেল যে ক্ষেত্রে বেশি উঁচুতে বস্তুকে তোলা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণও বেশি হচ্ছে (1 নং পরীক্ষা)।

আবার যেখানে '**বেশি বল**' প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানেও '**কাজের পরিমাণ**' বেশি হচ্ছে (পরীক্ষা নং 2)

তাহলে ভেবে দেখত কাজের পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে?

পদার্থবিজ্ঞানে কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্যে নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয় -

কাজের পরিমাণ = (প্রযুক্ত বল) × (প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর সরণের পরিমাণ)

$$W = F \times d$$

W = কাজ

F = বল

d = সরণ

SI পদ্ধতিতে কাজ মাপার একক

এক নিউটন বল প্রয়োগ করে যদি একটি বস্তুকে বল প্রয়োগের দিকে এক মিটার সরানো হয় তবে এক জুল পরিমাণ কাজ করা হয়েছে বলা হয়। এক জুল হলো কাজ পরিমাপের SI একক।

$$W = F \times d$$

1জুল = 1নিউটন × 1মিটার

আরো কিছু পরীক্ষা :

উপকরণ: দুটো দুই কিলোগ্রামের আর একটা এক কিলোগ্রামের বাটখারা, দুটো সমান উচ্চতার টেবিল।

1) তুমি আর তোমার বন্ধু মেঝেতে রাখা একটা করে 2 কিলোগ্রামের বাটখারা নিয়ে একই টেবিলের উপর

তুলে রাখলে। — তাহলে তুমি আর তোমার বন্ধু **'সমান পরিমাণ'** কাজ করলে।

2) এবার মেঝেতে একটা 2kg আর একটা 1kg -র বাটখারা রাখো। এখন, তুমি 2kg -র বাটখারাটি নিয়ে টেবিলের উপর তুলে রাখলে। আর তোমার বন্ধু 1kg -র বাটখারাটি টেবিলের উপর তুলে রাখল।— তাহলে তুমি, তোমার বন্ধুর কাজের 2 গুণ কাজ করেছ।

3) একটা টেবিলের উপর আর একটা সম উচ্চতার টেবিল বা সম উচ্চতার টুল উঠিয়ে রাখা হলো। মেঝের উপর দুটো 2 kg -র বাটখারা আছে।

এবার তুমি মেঝে থেকে একটা বাটখারা নিয়ে নীচের টেবিলে তুলে রাখো।

তোমার বন্ধু অন্য বাটখারাটি নিয়ে উপরের টেবিলের উপর রাখল।
—স্বভাবতই এখানে তোমার বন্ধু তোমার কাজের 2-গুণ কাজ করেছে।

4) একটা স্প্রিং নিয়ে দু-দিক থেকে টান দাও ।

কি দেখতে পেলে?

স্প্রিংটা কি সামগ্রিকভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করল? না কি স্প্রিংটা ব শুধুমাত্র আকৃতির পরিবর্তন হলো?
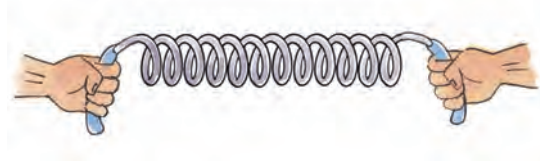
এক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ফলে কাজ হলো কি?

বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন না হলেও যদি বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হয় তাহলেও বলা হয় প্রযুক্ত বল কাজ করেছে।

5) ছবির মতো দেখতে একটি পিচকিরি নাও, সেটির মুখে একটি বেলুন ছবির মতো করে আটকাও। এবার পিচকিরির হাতলটি ভেতর দিকে ঠেলো।

কী দেখতে পেলে?

বেলুন লাগানো সমগ্র পিচকিরিটি কি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে গেল?

বেলুনটা ফুলল কেন?

তোমার বল কিসের ওপর প্রযুক্ত হলো?

তোমার প্রযুক্ত বলের দ্বারা কি কোনো কাজ হলো?
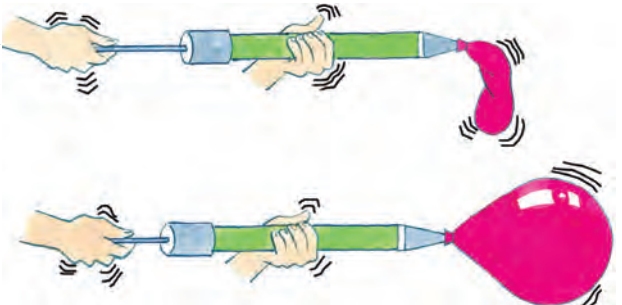
এক্ষেত্রেও দেখা গেল বল প্রয়োগের ফলে বস্তু সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করল না কিন্তু তোমার প্রযুক্ত বল পিচকিরির ভিতরে বায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করায় বায়ু সংকুচিত হয়ে পিচকিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে বেলুনের ভেতর প্রবেশ করেছে। ছোটো ছোটো সরণের ফলে বেলুনের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে বেলুন ফুলে উঠেছে। তাই এখানেও বল প্রয়োগের ফলে কাজ হয়েছে।

স্প্রিং -এর ক্ষেত্রেও স্প্রিং -এর সামগ্রিক সরণ না হলেও তার ভিতরকার ছোটো ছোটো অংশের স্থান পরিবর্তনের ফলে কাজ হয়েছে ($W=F\times d$), যা স্প্রিংটির আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

6) একটা চেয়ারে বসে জোরে শ্বাস নাও।

কিছু অনুভব করতে পারলে?

তোমার বুক কি উঠছে নামছে মনে হচ্ছে?

এই ওঠানামার জন্য **'বল'** কে প্রয়োগ করছে? কোথায় প্রয়োগ করছে?

এই বলের প্রভাবে কোনো কাজ হচ্ছে কি?

বুকে হাড় ও পেশি দিয়ে তৈরি একটা খাঁচা আছে, যার ভেতর থাকে ফুসফুস। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বিভিন্ন পেশির সংকোচন প্রসারণের ফলে ফুসফুসেরও সংকোচন-প্রসারণ হয়। ফলে ফুসফুসের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয়।
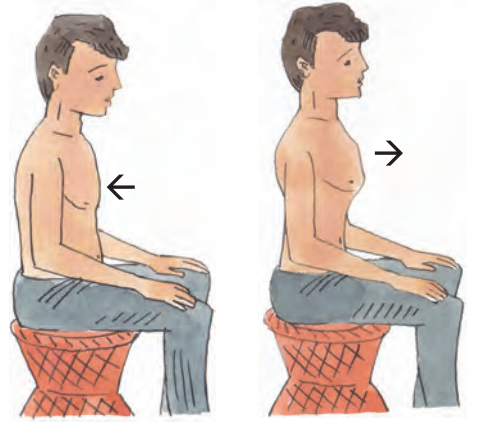
এখানে পেশির বলের দ্বারা কাজ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ফুসফুসের সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন অর্থাৎ সরণ হয় না — কিন্তু **'কাজ'** হয়ে থাকে।
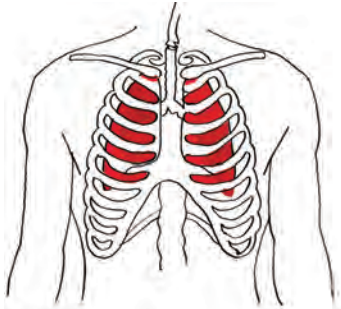
যদি ভালোভাবে খেয়াল করো তবে বুঝতে পারবে যে, পেশির বল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল হয় ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর উপর। ফলে বায়ু শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে অথবা ভেতরে প্রবেশ করে এবং এভাবে **'কাজ'** সংঘটিত হয়। কিন্তু এসবের কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না বলে আমরা তা বুঝতে পারি না।

7) তুমি একটা দেয়ালকে অনেকক্ষণ ধরে ঠেললে।

তোমার দেওয়া বলের অভিমুখে দেয়ালের কি কোনো সরণ হয়েছে?

দেয়ালের আকার বা আয়তনের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

তুমি কি ক্লান্ত হয়েছ?

ঠেলার সময় তোমার হৃৎস্পন্দন কি বেড়ে গিয়েছে?

ঠেলার সময় কি তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে গিয়েছিল?

তোমার শরীরের কোনো অংশ কি গরম হয়ে গিয়েছিল?

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার জন্য তোমার কি শক্তি খরচ করতে হয়েছে?

শরীরের ক্লান্তি, হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি, গা গরম হওয়া ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে যে শরীরের ভেতর শক্তি খরচ হয়েছে।

আবার যেহেতু কাজ করার সামর্থ্যকেই শক্তি বলে সেহেতু শক্তি যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন অবশ্যই কাজ হয়েছে।

এবার একটা চক নিয়ে দেয়ালের একটা অংশে ভালো করে ঘষো যাতে ওই জায়গাটা সাদা হয়ে যায়।

এখন ওই সাদা অংশে দেয়ালটাকে ঠেলো।

- দেয়ালটা কি সরলো?
- দেয়ালের ওই স্থানটা (যেখানে বল প্রয়োগ করেছিলে) কি ভেতরে ঢুকে গেল?
- দেয়ালের ওই স্থানের চকের গুঁড়োর কিছু অংশ কি উঠে গেছে? কোথায় উঠে গেছে?
- এবার তোমার হাতটা ভালো করে দেখো তো সেখানে (তালুতে) চকের দাগ লেগেছে কিনা?
- তুমি যখন দেয়ালটাকে ঠেলছিলে তখন কি তোমার হাতের তালুর মাংসপেশি কিছুটা চেপটে গিয়েছিল?
- এবার ভেবে বলো তো দেয়ালটা যদি রাবারের তৈরি হতো, তবে ঠেলার স্থানটা কি ভেতরে ঢুকে যেত?

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার সময় যেমন হাতের তালুর মাংস পেশির আকারের পরিবর্তন হয়, তেমনই দেয়ালের ওই স্থানেও (চাপ দেওয়া স্থানে) আকৃতিগত কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন এত সামান্য যে তা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। সে কারণেই চকের গুঁড়ো ব্যবহার করে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে বল প্রয়োগে সেখানেও সরণ হয়। তাই তোমার হাতে চকের দাগ দেয়াল থেকে উঠে এসেছিল।

দেয়ালে বল প্রয়োগ করার জন্যে পেশিকোশে দরকার হয়ে পড়ে অতিরিক্ত শক্তি। কোশে কোশে শ্বসন কার্য বেড়ে যায়, ফলে খাদ্য ও অক্সিজেনের চাহিদাও বেড়ে যায়। এর ফলে বেড়ে যায় হৃৎস্পন্দন, বেড়ে যায় রক্তবাহে রক্তচাপ, বেড়ে যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার। পেশিকোশের দরকার শক্তি কিন্তু সেখানে অক্সিজেনের জোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম। শক্তির চাহিদা মেটাতে কোশে কোশে শুরু হয় এক বিশেষ ধরনের শ্বসন। তারফলেই পেশিকোশে জমতে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড। আর পেশিকোশে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড জমার ফলে পেশিতে ব্যথার অনুভূতি জাগে। শ্বসনের হার বেড়ে যাওয়ার জন্য তাপ শক্তিও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তাই আমাদের শরীরও গরম হয়।

কিন্তু এতসব কি আমাদের চোখে পড়ে? তাই ওসব কাজ আমরা দেখতে পাই না, ঠিক যেমন পিচকিরির ভেতরকার কাজ, ফুসফুসের ভেতরকার কাজ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

3 পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা কিছু মৌলিক পদার্থের নাম ও চিহ্নের কথা জেনেছি। মৌলের চিহ্ন দিয়েই মৌলের সংক্ষেপে নাম বোঝায়। এখন তোমরা তার উপর ভিত্তি করে নীচের সারণিতে দেওয়া মৌলগুলোর নাম থেকে চিহ্ন লেখার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

সারণি - 1

মৌলের নাম	নামের বানান	চিহ্ন
অ্যালুমিনিয়াম	Aluminium	....
নিকেল	Nickel	....
আর্সেনিক	Arsenic	....
সিলিকন	Silicon	....
জিঙ্ক	Zinc	....
বোরন	Boron	....

সারণি - 2

মৌলের নাম	ইংরাজি নাম	ল্যাটিন নাম	নামের বানান	চিহ্ন
টিন	Tin	স্ট্যানাম	Stannum	....
পারদ	Mercury	হাইড্রার্জিরাম	Hydrargyrum	Hg
সিসা	Lead	প্লাম্বাম	Plumbum	....

এবার আমরা এমন কিছু মৌলিক পদার্থের নাম ও চিহ্ন শিখব, যেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নাম, মৌলগুলোর আবিষ্কারের স্থান বা যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন তাঁর দেশের নাম অথবা বিশেষ কিছু গ্রহের নামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে তুমি নীচের তিনটে সারণি পূরণ করো।

সারণি - 1

মৌলের নাম	নামের বানান	বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম	চিহ্ন
কুরিয়াম	Curium	....	....
আইনস্টাইনিয়াম	Einsteinium	....	....

সারণি - 2

মৌলের নাম	নামের বানান	স্থানের নাম	চিহ্ন
আমেরিসিয়াম	Americium	....	....
পোলোনিয়াম	Polonium	....	....

সারণি - 3

মৌলের নাম	নামের বানান	গ্রহের নাম	চিহ্ন
ইউরেনিয়াম	Uranium	....	....
নেপচুনিয়াম	Neptunium	....	....
প্লুটোনিয়াম	Plutonium	....	....

শব্দভাণ্ডার: Pu, America, Po, Uranus, Am, Madame Curie, Pluto, Es, No, Neptune, Albert Einstein, Np, U, Poland.

মৌলের পরমাণু জুড়ে মৌল অণু বা যৌগ অণু তৈরি হয়। তাহলে এসো আমরা দেখি, পরমাণু কীভাবে তৈরি।

পাশের ছবিতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়াম পরমাণুর গঠন কেমন তা দেখানো হয়েছে। পরমাণুর এই ছবির মধ্যে কত রকমের কণা তোমরা দেখতে পাচ্ছ?

হাইড্রোজেন
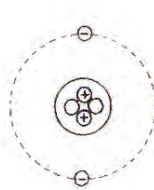
হিলিয়াম
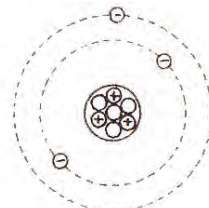
লিথিয়াম

— তিনরকমের অতিক্ষুদ্র কণা পরমাণুতে থাকতে পারে। পরমাণুর মধ্যে এই তিনরকমের কণার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

⊕ দিয়ে দেখানো কণাগুলো প্রোটন, এগুলো ধনাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণা।

⊖ দিয়ে দেখানো কণাগুলো ইলেকট্রন। এগুলো ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা।

○ দিয়ে দেখানো কণাগুলো নিউট্রন। এদের কোনো তড়িৎ নেই।

একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের তড়িতের বা চার্জের পরিমাণ সমান। একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক চার্জ একত্রে থাকলে তড়িৎবিহীন বা নিস্তড়িৎ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ছবিতে আরো লক্ষ করো, প্রোটন আর নিউট্রনগুলো পরমাণুর কেন্দ্রে একটা ছোটো জায়গায় জোট বেঁধে আছে। ওই জায়গাটা হলো পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন পথে ঘোরে। যে পথগুলোতে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে তাদের কক্ষপথ বলে।

সাধারণ অবস্থায় সব মৌলের পরমাণুতেই প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হয়। তাই মৌলের পরমাণু নিস্তড়িৎ। কোনো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা তার পারমাণবিক সংখ্যা বলে।

একটি ইলেকট্রনের ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের প্রায় 2000 ভাগের এক ভাগ। তাই নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভরই মোটামুটিভাবে কোনো পরমাণুর ভর — একথা বলা যেতেই পারে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাই ওই পরমাণুর ভরসংখ্যা।

এবার তোমরা আগের পাতার হিলিয়াম পরমাণুর গঠনের ছবি থেকে নীচের সারণি পূরণ করো।

হিলিয়াম পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা			পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক	ভরসংখ্যা
প্রোটন	ইলেকট্রন	নিউট্রন		

এবার এসো আমরা আরো কয়েকটা পরিচিত মৌলের পরমাণুর গঠনের ছবি দেখি: ছবিতে ⊕6 মানে 6টি প্রোটন, ○6 মানে 6 টি নিউট্রন এইভাবে বুঝতে হবে।
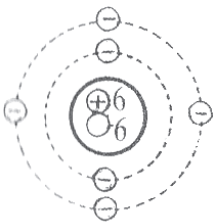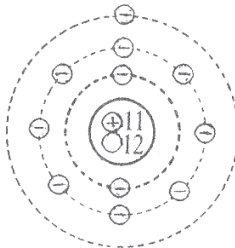
কার্বন সোডিয়াম

ক্লোরিন

আগের পাতার ছবিগুলো দেখে নীচের সারণিটি পূরণ করো :

মৌলের নাম	প্রোটন সংখ্যা	ইলেকট্রন সংখ্যা	নিউট্রন সংখ্যা	পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক	ভর সংখ্যা
কার্বন					
সোডিয়াম					
ক্লোরিন					

মৌলের পরমাণু থেকে এক বা একের বেশি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে প্রোটন সংখ্যার থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হয়ে যায়। তখন ধনাত্মক (Positive) আধানযুক্ত আয়ন বা ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয়। পরমাণু এক বা একের বেশি ইলেকট্রন নিয়ে নিলে কী হবে?

— তখন প্রোটন সংখ্যার থেকে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এবং ঋণাত্মক (Negative) আধানযুক্ত আয়ন তৈরি হবে। একে অ্যানায়ন বলা হয়।

সাধারণত ধাতু ও অধাতু জুড়ে যৌগ তৈরি হবার সময় ধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে আর অধাতুর পরমাণুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

যেমন — সোডিয়াম পরমাণু একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে যে ক্যাটায়ন তৈরি হবে তাকে Na^+ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তেমনি ক্যালশিয়াম পরমাণু 2টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে Ca^{2+} ক্যাটায়ন তৈরি করবে।

আবার ক্লোরিন পরমাণু একটা ইলেকট্রন নিয়ে নিলে যে অ্যানায়ন উৎপন্ন হবে তাকে Cl^- দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে ক্লোরাইড আয়ন বলে।
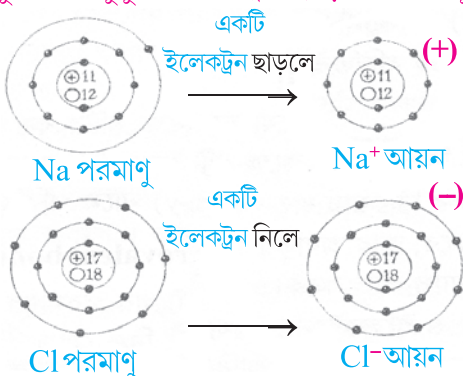
তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কোন মৌলের পরমাণু	মৌলের চিহ্ন	কটি ইলেকট্রন নিলে বা ছেড়ে দিলে	তৈরি হওয়া ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চিহ্ন ও নাম
পটাশিয়াম	K	1 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	K^+ (পটাশিয়াম)
ম্যাগনেশিয়াম	....	2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	....
জিঙ্ক	....	2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	....
লেড	....	2 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	....
অ্যালুমিনিয়াম	....	3 টি ইলেকট্রন ছাড়লে	....
ফ্লুওরিন	F	1 টি ইলেকট্রন নিলে	F^- (ফ্লুওরাইড)
অক্সিজেন	....	2 টি ইলেকট্রন নিলে	.... (অক্সাইড)
সালফার	....	2 টি ইলেকট্রন নিলে	.... (সালফাইড)
ব্রোমিন	....	1 টি ইলেকট্রন নিলে	.... (ব্রোমাইড)

আমরা জানি একাধিক মৌলের পরমাণু যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। কখনো কখনো একই মৌলের এক বা একাধিক পরমাণু অথবা বিভিন্ন মৌলের পরমাণু জোটবদ্ধ অবস্থায় আয়নরূপে অবস্থান করে; তখন সাধারণভাবে তাদের মূলক বলা হয়। জোটবদ্ধ অবস্থাতেই ওই মূলকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। মূলকের আধানের পরিমাণই প্রাথমিকভাবে ওই মূলকের যোজ্যতা বলে ধরা যেতে পারে। পরে আমরা অন্য পদ্ধতিতে মূলকগুলোর যোজ্যতা কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা জানব।

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

মূলকের নাম	সংকেত	তার আধান বা চার্জ	যোজ্যতা
নাইট্রেট	NO_3^-	-1	1
সালফেট	SO_4^{2-}	....	....
কার্বনেট	CO_3^{2-}	....	....
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	+1	1
বাইকার্বনেট	HCO_3^-	....	....
ফসফেট	PO_4^{3-}	....	....
হাইড্রক্সাইড	OH^-	....	....

এবার আমরা অন্য পদ্ধতিতেও মূলকগুলোর যোজ্যতা কীভাবে জানা যায় তা দেখব। আমরা জানি যে দুটো মৌলের পরস্পর যুক্ত হবার ক্ষমতাকে ওই মৌলদের যোজন ক্ষমতা বলা হয়।

নীচের সারণিতে একক যোজ্যতাবিশিষ্ট ধাতু সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের সঙ্গেও বিভিন্ন মূলক যুক্ত হয়েছে এমন কয়েকটি যৌগের সংকেত ও তাদের মধ্যে উপস্থিত মূলকের সংকেত দেওয়া হলো। সংকেতে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের পরমাণুর সংখ্যা থেকে মূলকগুলোর যোজ্যতা লেখো:

যৌগের সংকেত	তার মধ্যে উপস্থিত অ্যানায়নের নাম ও সংকেত	অ্যানায়নের যোজ্যতা
Na_2S	সালফাইড (S^{2-})	2
$NaHCO_3$	বাইকার্বনেট (HCO_3^-)	....
$NaCN$	সায়ানাইড (CN^-)	....
$NaOH$	হাইড্রক্সাইড (OH^-)	....
NaF	ফ্লুওরাইড (F^-)	....
$NaBr$	ব্রোমাইড (Br^-)	....
$NaNO_2$	নাইট্রাইট (NO_2^-)	....
Na_2SO_3	সালফাইট (SO_3^{2-})	....
$KMnO_4$	পারম্যাঙ্গানেট (MnO_4^-)	....
$K_2Cr_2O_7$	ডাইক্রোমেট ($Cr_2O_7^{2-}$)	....
$NaAlO_2$	অ্যালুমিনেট (AlO_2^-)	....
Na_2ZnO_2	জিঙ্কেট (ZnO_2^{2-})	....
$NaHSO_4$	বাইসালফেট (HSO_4^-)	....

ষষ্ঠ শ্রেণিতে হাইড্রোজেনের যোজ্যতাকে 1 ধরে হাইড্রোজেন যুক্ত বিভিন্ন যৌগ থেকে তোমরা জেনেছ যে অক্সিজেনের যোজ্যতা 2, ক্লোরিনের যোজ্যতা 1।

এবার আমরা ক্লোরিনের বিভিন্ন যৌগ থেকে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুদের যোজ্যতা নির্ণয় করব।

নীচের সারণিতে বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে যুক্ত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যাই হলো ওই মৌলের যোজ্যতা।

যৌগের নাম	সংকেত	যৌগে ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত ধাতু	যৌগে ধাতুর পরমাণু পিছু ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা	ধাতুর যোজ্যতা
সোডিয়াম ক্লোরাইড	$NaCl$	Na	....	....
পটাশিয়াম ক্লোরাইড	KCl	K	....	....
ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড	$CaCl_2$	Ca	2	2
ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড	$MgCl_2$	Mg	....	....
ফেরাস ক্লোরাইড	$FeCl_2$	Fe	2	....
ফেরিক ক্লোরাইড	$FeCl_3$	Fe	3	3
অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড	$AlCl_3$	Al	....	....
জিঙ্ক ক্লোরাইড	$ZnCl_2$	Zn	....	....
কিউপ্রাস ক্লোরাইড	$CuCl$	Cu	1	....
কিউপ্রিক ক্লোরাইড	$CuCl_2$	Cu	2	....
সিলভার ক্লোরাইড	$AgCl$	Ag	....	....
লেড ক্লোরাইড	$PbCl_2$	Pb	....	....

ওপরের সারণির যৌগগুলোর সংকেত লক্ষ করলে তোমরা দেখবে আয়রন, কপার প্রভৃতি মৌলের একাধিক যোজ্যতা রয়েছে। এইসব মৌলগুলো যোজ্যতা পরিবর্তন করে একই মৌলের বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন যৌগ তৈরি করতে পারে। এইরকম যোজ্যতাকে মৌলের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বলে। সারণিটি ভালো করে লক্ষ করে দেখবে যে সব যৌগে মৌলের যোজ্যতা কম সেই যৌগে তাদের নামের শেষে 'আস' যুক্ত হয়েছে আর যে যৌগে ওই মৌলেরই যোজ্যতা অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের নামের শেষে 'ইক' যুক্ত হয়েছে। যেমন ধরো ফেরাস ও ফেরিক যৌগে আয়রনের যোজ্যতা যথাক্রমে 2 ও 3।

সংকেত লেখার কৌশল

বিভিন্ন মৌল কিংবা মূলকের যোজ্যতাকে ব্যবহার করে কীভাবে যৌগের সংকেত লেখা যায় তা দেখা যাক। ধরা যাক, A ও B দুটি মৌল বা মূলক যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা m এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা n হলে A এবং B দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে A_nB_m। A মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যা (m)কে B মৌলের বা মূলকের ডানদিকে একটু নীচে এবং B মৌলের বা মূলকের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যা (n)-কে A মৌলের বা মূলকের ডানদিকে লিখে প্রকাশ করলে সেটি হবে A ও B মৌল বা মূলক দ্বারা তৈরি যৌগের সংকেত।

যেমন: (i) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত লিখতে হবে। Al-এর যোজ্যতা 3 ও O-এর যোজ্যতা 2। সংকেত তৈরির সময় চার্জের + বা – লেখা হয়না।
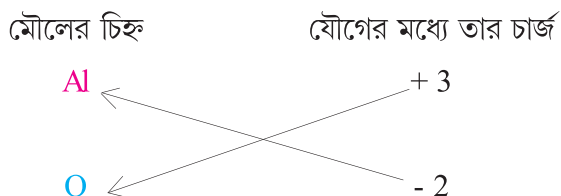
তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত এইরকমভাবে লেখা হলো: Al_2O_3।

(ii) অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো।

NH_4^+ মূলকের যোজ্যতা 1 ও SO_4^{2-} মূলকের যোজ্যতা 2।
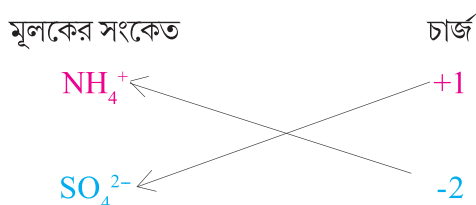
অতএব অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত $(NH_4)_2SO_4$।

(iii) মিথেনের সংকেত লেখার পদ্ধতি নীচে দেওয়া হলো:

কার্বনের (C) যোজ্যতা 4 এবং হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1।
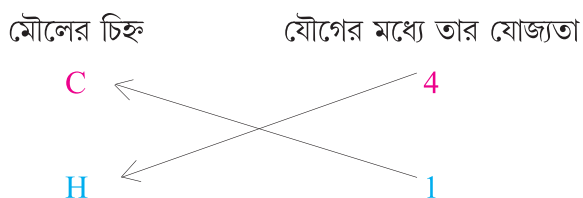
তাহলে মিথেনের সংকেত C_1H_4। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার C-এর নীচে 1 লেখার দরকার হয় না। তাই মিথেনের সংকেত CH_4।

(iv) হাইড্রোজেন সালফাইডের সংকেত লেখার পদ্ধতি:

হাইড্রোজেন (H) যোজ্যতা 1 এবং সালফারের যোজ্যতা 2।
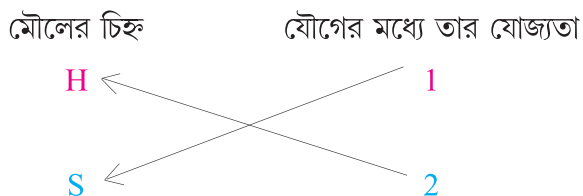
অতএব হাইড্রোজেন সালফাইডের সংকেত H_2S।

নীচে কতকগুলো মৌলের চিহ্ন ও যোজ্যতা দেওয়া আছে। আগের পৃষ্ঠার পদ্ধতিকে ব্যবহার করে যৌগগুলোর সংকেত লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

যৌগের নাম	যৌগে উপস্থিত একটা মৌলের চিহ্ন	ওই মৌলের যোজ্যতা	যৌগে উপস্থিত অন্য মৌলের চিহ্ন	ওই মৌলের যোজ্যতা	যৌগের সংকেত
কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড	C	4	Cl	1	
ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড	P	5	Cl	1	
অ্যামোনিয়া	N	3	H	1	
সালফার টেট্রা ফ্লুওরাইড	S	4	F	1	

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো এবং মৌল ও মূলকের যোজ্যতা ব্যবহার করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

যৌগের নাম	যৌগে উপস্থিত ধাতব আয়ন	যৌগে উপস্থিত ধাতব মৌলের যোজ্যতা	যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন বা মূলক	অ্যানায়ন বা মূলকের যোজ্যতা	যৌগের সংকেত
সোডিয়াম ফ্লুওরাইড	Na^+	1	F^-	1	....
....	K^+	1	Br^-	1	....
লেড ক্লোরাইড	Pb^{2+}	2	Cl^-	1	....
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড	Al^{3+}	3	OH^-	1	....
....	Na^+	....	HCO_3^-	1	....
ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট	Ca^{2+}	2	HCO_3^-	...	....
জিঙ্ক নাইট্রেট	Zn^{2+}	....	NO_3^-	...	....
সোডিয়াম ফসফেট	Na^+	1	PO_4^{3-}	3	....

এই উপায়ে জিঙ্ক অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড, জিঙ্ক সালফাইড বা ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সংকেত লিখবে কী করে?

এইভাবে জিঙ্ক অক্সাইডের সংকেত হবার কথা Zn_2O_2 কিন্তু ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন উভয়ের পাশেই 2 থাকায় তা বাদ দিয়ে যৌগের সরলীকৃত সংকেত ZnO রূপে লেখা হয়। এই উপায়ে বাকি তিনটে যৌগের সংকেত লেখো।

এবার একটা অন্য পদ্ধতি লক্ষ করো যা থেকেও তুমি যৌগের সংকেত নিজেই লিখতে পারবে। এটা একটা খেলার মতো। খেলার নিয়ম হলো এমন সংখ্যার ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন নিতে হবে যাতে তাদের থেকে তৈরি যৌগের মোট চার্জ শূন্য হয়। এর মানে হলো তুমি যতগুলো ক্যাটায়ন নেবে তাদের মোট পজিটিভ চার্জ অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জের সমান হতে হবে।

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

যৌগের নাম	যৌগে উপস্থিত ক্যাটায়ন	যৌগে উপস্থিত অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে	যৌগের সংকেত
সোডিয়াম ক্লোরাইড	Na^+	Cl^-	প্রত্যেক Na^+-এর 1টি (+) চার্জের জন্য 1টি (-) চার্জের দরকার	+1-1=0	NaCl
সোডিয়াম সালফেট	Na^+	SO_4^{2-}	SO_4^{2-}-এর চার্জ যেহেতু -2 তাই দুটি Na^+ ক্যাটায়ন দরকার	+2-2=0	Na_2SO_4
ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড	Mg^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Mg^{2+}-এর জন্য 2টি Cl^- দরকার	....	....
ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড	Ca^{2+}	Cl^-	....	....	....
জিঙ্ক অক্সাইড	Zn^{2+}	O^{2-}	....	....	ZnO
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	Al^{3+}	O^{2-}	2টি Al^{3+}-এর মোট চার্জ যেহেতু +6 তাই 3টি O^{2-}-এর মোট চার্জ – 6 প্রয়োজন	2(+3)+3(-2)=0	Al_2O_3
ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড	Mg^{2+}	O^{2-}	....	....	....
ফেরিক অক্সাইড	Fe^{3+}	O^{2-}	....	....	Fe_2O_3
সোডিয়াম সালফাইড	Na^+	S^{2-}	....	....	Na_2S
পটাশিয়াম ফ্লুওরাইড	K^+	F^-	....	....	....

রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ

করে দেখো 1: একটা গ্লাসে জল নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা মিউরিয়েটিক অ্যাসিড (বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য এই অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়) মেশাও। তার মধ্যে এক চিমটে কাপড় কাচার সোডা যোগ করো। (শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে কাজ করো)

2: ওপরের মতো একইরকম অ্যাসিড দ্রবণ তৈরি করে তার মধ্যে কয়েকটা নতুন পেরেক (দস্তার প্রলেপ দেওয়া) ফেলে দাও। (এক্ষেত্রে পেরেকের পরিবর্তে জিঙ্কের টুকরো ব্যবহার করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।)

3 : একটা গ্লাসে জল নিয়ে ছোটো এক টুকরো পাথুরে চুন তার মধ্যে সাবধানে ফেলে দাও। কী দেখতে পেলে নীচে লেখো।

কোন ক্ষেত্রে	কী করলে	কী দেখলে
করে দেখো 1		
করে দেখো 2		
করে দেখো 3		

কেন এমন হলো বলো তো?

প্রথম ক্ষেত্রে: কাপড় কাচার সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3), লঘু মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl) সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করেছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে: লোহার পেরেকের ওপর প্রলেপ দেওয়া দস্তার সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (মিউরিয়েটিক অ্যাসিড) বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করেছে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে: পাথুরে চুন জলের সংস্পর্শে এসে সম্পূর্ণ নতুন একটা পদার্থে পরিণত হলো। এই নতুন পদার্থটার ধর্ম, চুনের ধর্ম থেকে একেবারেই আলাদা। লক্ষ করো জল গরম হয়ে গেছে।

এরকম ঘটনাকেই আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে থাকি। পাথুরে চুন জলে দিলে দেখতে পাবে গ্লাসটা বেশ কিছুটা গরম হয়ে গেছে। অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়েছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ যেমন উৎপন্ন হতে পারে তেমনি এমন রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় যেখানে বিক্রিয়া মিশ্রণের তাপমাত্রা কমে গেছে। অর্থাৎ, তাপের শোষণ ঘটেছে। পাথুরে চুন জলে দিলে একটা সাদা রঙের পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে কলিচুন বলা হয়। এর রাসায়নিক নাম ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড।

এই বিক্রিয়ায় পাথুরে চুন ও জল অংশ নিয়েছে। তাই এদের বিক্রিয়ক বলে। আর বিক্রিয়ার ফলে কলিচুন উৎপন্ন হয়েছে। তাই একে বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলা হয়।

তোমরা নীচের সারণিতে পাথুরে চুন বা ক্যালশিয়াম অক্সাইড, জল ও কলিচুনের সংকেত লেখো।

কেমন পদার্থ	যৌগের নাম	যৌগের সংকেত
বিক্রিয়ক	পাথুরে চুন বা ক্যালশিয়াম অক্সাইড	
	জল	
বিক্রিয়াজাত	কলিচুন বা ক্যালশিয়াম হাইড্রক্সাইড	

পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কলিচুন উৎপন্ন হয়। লক্ষ করে দেখো কতটা জায়গা লাগল কথাটা বোঝাতে। আমরা যদি বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়াটাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করি, তখন তাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। রাসায়নিক সমীকরণ লেখার সময় একের বেশি বিক্রিয়ক পদার্থ থাকলে তাদের সংকেতের মাঝখানে (+) চিহ্ন দিয়ে পরপর লেখা হয়। আবার একের বেশি বিক্রিয়াজাত পদার্থ থাকলে তাদের সংকেতের মাঝেও (+) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। এতে বোঝা যায় যে বিক্রিয়কগুলো একসঙ্গে বিক্রিয়া করেছে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোও একসঙ্গে তৈরি হয়েছে। তাহলে পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হবে:

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

আবার চুনাপাথর (ক্যালশিয়াম কার্বনেট)-কে তাপ দিলে পোড়াচুন (ক্যালশিয়াম অক্সাইড) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় : $CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$

এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর নাম ও সংকেত নীচের সারণিতে লেখো। তারপর সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়াকে প্রকাশ করো।

বিক্রিয়ক পদার্থের নাম	বিক্রিয়কের সংকেত	বিক্রিয়াজাত পদার্থের নাম	বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত

বিক্রিয়ার সমীকরণ হবে: ....

সমীকরণের সমতাবিধান করা

হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) মিলিত হয়ে জল (H_2O) উৎপন্ন করে।
বিক্রিয়াটিকে সমীকরণের আকারে কীভাবে লেখা যাবে?

$$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$$
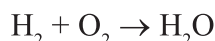
লক্ষ করে দেখো সমীকরণের বাঁ ও ডান দুই দিকেই H পরমাণু সংখ্যা দুটি করে। কিন্তু O পরমাণুর সংখ্যা বাঁ দিকে দুটি হলেও ডানদিকে O পরমাণুর সংখ্যা একটি। অর্থাৎ O পরমাণুর সংখ্যা দু-দিকে আলাদা।

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার সময় একটা বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত দিয়ে বিক্রিয়ার সমীকরণ প্রকাশ করার পর প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমীকরণের বাম ও ডান দিকে সমান হলো কিনা তা দেখতে হবে। যদি কখনও কোনো মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান না হয়, তাহলে কী করতে হবে?

সমীকরণের মধ্যে লেখা বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেতের আগে উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে দু-দিকে প্রত্যেক মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে হবে। এই পদ্ধতিকেই বলে সমীকরণের সমতাবিধান (Balance) করা।

তাহলে জল তৈরির বিক্রিয়ার সমীকরণকে সমতাবিধান করলে কী পাওয়া যাবে?

সমতাবিধান করে সমীকরণ হবে —

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$
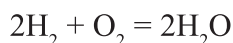
(1) মারকিউরিক অক্সাইডকে (HgO) উত্তপ্ত করলে পারদ (Hg) এবং অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন হয়।

$$HgO \rightarrow Hg + O_2$$
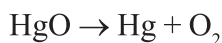
এই বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে, ডান দিকে অক্সিজেন পরমাণু আছে 2টি। তাহলে বাঁদিকে যদি 2HgO লিখি? তখন আবার বাঁ দিকে Hg পরমাণুর সংখ্যা 2 হয়ে যাবে। তাই ডান দিকের Hg-এর সামনে 2 লিখতে হবে।

$2HgO = 2Hg + O_2$, এটা সমতাযুক্ত সমীকরণ। কোনো রাসায়নিক সমীকরণে মৌল বা যৌগের সংকেতের আগে 2 বা 3 লেখা হলে তার মানে কী দাঁড়ায়? তার মানে হলো সেই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বা যৌগে উপস্থিত সব মৌলের পরমাণু সংখ্যাই 2 বা 3 গুণ হয়ে গেল।

(2) আবার নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গঠন করে। ঘটনাটিকে বিক্রিয়ক মৌল ও বিক্রিয়াজাত যৌগের সংকেতের সাহায্যে লিখলে নীচের মতো করে লেখা যায়।

$$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$$
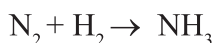
ভালো করে লক্ষ করে দেখো, বাঁ দিকে দুটি করে N ও H পরমাণু আর ডান দিকে একটি N পরমাণু ও 3টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। আমরা জানি, 2 ও 3-এর ল.সা.গু. হলো 6। তাহলে বাঁ দিকে H_2-এর আগে 3 আর ডান দিকে NH_3-এর আগে 2 লিখে দেখো তো।

N_2	+	$3H_2$	=	$2NH_3$
2টি N পরমাণু		$3 \times 2 = 6$ টি H পরমাণু		2টি N পরমাণু + 6 টি H পরমাণু
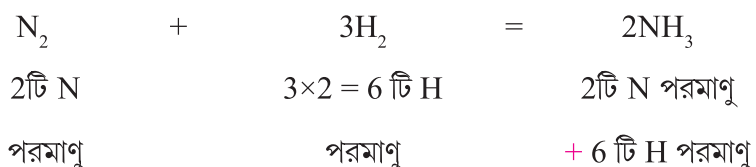
তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় ঠিকমতো সংখ্যা বসিয়ে রাসায়নিক সমীকরণগুলোর সমতাবিধান করো।

	বিক্রিয়ক				বিক্রিয়াজাত পদার্থ		
(i)	C	+	O_2	=	.....CO		
(ii)	Fe_2O_3	+	C	=	.....Fe	+ .....CO	
(iii)	Na_2CO_3	+	.....HCl	=	.....$NaCl$	+ CO_2	+ H_2O
(iv)	$2Pb(NO_3)_2$			=	.....PbO	+ .....NO_2	+ O_2
(v)	.....$AgNO_3$	+	H_2S	=	Ag_2S	+ .....HNO_3	
(vi)	P_4	+	.....I_2	=	.....PI_3		
(vii)	CH_4	+	.....O_2	=	CO_2	+ ..... H_2O	
(viii)	.....$KClO_3$			=	.....KCl	+ .....O_2	
(ix)	.....KI	+	Cl_2	=	.....KCl	+ I_2	
(x)	.....$NaOH$	+	H_2SO_4	=	Na_2SO_4	+ ...H_2O	

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা ওপরে দেখতে পেলাম তারা সবই কি একই ধরনের?

সব বিক্রিয়া যে একই ধরনের নয়, তা বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো লক্ষ করলে কিছুটা বুঝতে পারবে। কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক পদার্থ একটাই। আবার কোনো ক্ষেত্রে একাধিক। বিক্রিয়াজাত পদার্থের ক্ষেত্রেও একইরকম ব্যাপার। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়া নানাধরনের।

তোমরা দেখেছ যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন করে।

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$
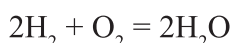
নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়।

$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$
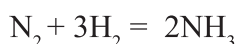
এই দুটো বিক্রিয়াতেই বিক্রিয়ক পদার্থগুলো মৌলিক পদার্থ। আর বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো হলো ওই সমস্ত মৌলের সংযোগে উৎপন্ন যৌগ। তাই এরকম বিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়া বলে।

পরের পৃষ্ঠায় কিছু প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিক্রিয়াজাত যৌগের নাম ও সংকেত এবং বিক্রিয়াগুলোর সমিত সমীকরণ লেখো। (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।)

বিক্রিয়ক মৌল	বিক্রিয়াজাত যৌগের নাম ও সংকেত	সমিত সমীকরণ
ম্যাগনেশিয়াম ও অক্সিজেন		
হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন		

কোনো কোনো বিক্রিয়ায় একটা যৌগ ভেঙে গিয়ে একাধিক পদার্থ (মৌল বা যৌগ) উৎপন্ন হয়।

চুনাপাথর ($CaCO_3$)-কে উত্তপ্ত করলে পোড়াচুন (CaO) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়। এটা তোমরা আগেই জেনেছ। আবার সামান্য অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে জল ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। এই দুটো বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো :

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2 \qquad 2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$
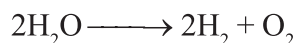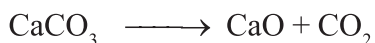
ওপরের দুটো বিক্রিয়াতেই আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

তাপ বা তড়িতের প্রভাবে একটা যৌগ ভেঙে একাধিক পদার্থে পরিণত হয়েছে। এরকম বিক্রিয়াকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোর প্রভাবেও বিয়োজন বিক্রিয়া ঘটতে পারে।

নীচের কয়েকটা বিয়োজন বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও কোনো ক্ষেত্রে একটা বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত দেওয়া আছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত লেখো। [প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও]

বিক্রিয়ক পদার্থ		বিক্রিয়াজাত পদার্থ
$2KClO_3$	→	.... + $3O_2$
$2HgO$	→	.... + ...
$2H_2O_2$	→	.... + O_2

করে দেখো: একটা পাত্রে সামান্য জল ও তুঁতে মিশিয়ে তুঁতের দ্রবণ তৈরি করো। এই দ্রবণের মধ্যে একটা পরিষ্কার লোহার ছুরি ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দাও। কী করলে ও কী দেখতে পেলে তা নীচে লেখো।

কী করলে	কী দেখলে

এখানে কী ঘটল?

— তুঁতের (কপার সালফেট, $CuSO_4$) দ্রবণ থেকে কিছুটা তামা এসে লোহার ছুরির গায়ে লালচে বাদামি আস্তরণ তৈরি করল। তাহলে তুঁতের দ্রবণ থেকে যখন তামা এভাবে জমা হলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আর কী হলো?

— লোহার ছুরি থেকে কিছুটা লোহা ওই দ্রবণের মধ্যে গুলে গেল; যদিও তা পরিমাণে এত কম যে চোখে দেখে বোঝা যাবে না। এই বিক্রিয়াটাকে সমীকরণের আকারে লিখলে কী লেখা যাবে? আমরা লিখব:

$$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$$
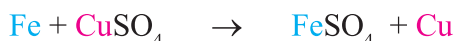
আবার কিউপ্রিক ক্লোরাইড দ্রবণে দস্তা (জিঙ্ক) যোগ করলে লালচে বাদামি রং-এর তামা (কপার) থিতিয়ে পড়বে।

$$Zn + CuCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Cu$$

এরকম বিক্রিয়া, যেখানে একটা মৌল অন্য মৌলের যৌগ থেকে তাকে সরিয়ে সেই জায়গা নেয়, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে।

করে দেখো: একটা পাত্রে কিছু জলের মধ্যে খাবার লবণ মিশিয়ে খাবার লবণের খুব পাতলা একটা দ্রবণ তৈরি করো। ওই দ্রবণের মধ্যে কয়েক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মেশাও। কী করলে ও কী দেখলে তা লেখো।

কী করলে	কী দেখলে

এখানে কী ঘটল?

— সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) বিক্রিয়া করে সাদা রঙের যে যৌগটা থিতিয়ে পড়ছে তা হলো সিলভার ক্লোরাইড (AgCl)।

$$NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$$
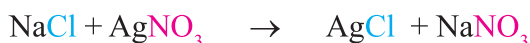
— ওপরের সমীকরণটা লক্ষ করো। বিক্রিয়াটাকে যদি এভাবে দেখা হয়:

কোন যৌগের	কোন আয়ন (বা মূলক) আলাদা হয়েছে	কোন আয়ন (বা মূলক) যুক্ত হয়েছে
সোডিয়াম ক্লোরাইড	Cl^-	NO_3^-
সিলভার নাইট্রেট	NO_3^-	Cl^-

তাহলে এই বিক্রিয়াতে দুটো বিক্রিয়ক পদার্থের মধ্যে উপস্থিত আয়ন (বা মূলক) (Cl^- ও NO_3^-) বিনিময় ঘটে বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলো উৎপন্ন হয়েছে। তাই এটা একটা বিনিময় বিক্রিয়া।

আবার ফেরাস সালফেট দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড যোগ করলে সাদা রং-এর বেরিয়াম সালফেট থিতিয়ে পড়ে। আর ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো:

$$FeSO_4 + BaCl_2 \rightarrow FeCl_2 + BaSO_4$$
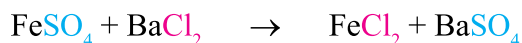
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কীভাবে এই বিক্রিয়াটিকে আগের বিক্রিয়াটির মতোই ব্যাখ্যা করা যায় তা নীচের সারণিতে লেখো।

কোন যৌগের	কোন আয়ন (বা মূলক) আলাদা হয়েছে	কোন আয়ন (বা মূলক) যুক্ত হয়েছে

নীচের সারণিতে দেওয়া বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণ দেখে বিক্রিয়াগুলো কেমন ধরনের তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কেমন ধরনের বিক্রিয়া
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	
$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$	
$CaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2NaCl$	
$2Ag_2O \xrightarrow{\text{তাপ}} 4Ag + O_2$	
$PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2$	
$Fe + S \xrightarrow{\text{তাপ}} FeS$	
$2AgBr \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} 2Ag + Br_2$	
$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$	
$2FeSO_4 \xrightarrow{\text{তাপ}} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$	
$2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2PbO + 4NO_2 + O_2$	
$Na_2CO_3 + Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbCO_3 + 2NaNO_3$	
$HgCl_2 + Cu \longrightarrow CuCl_2 + Hg$	
$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$	

পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা

জীবদেহ গঠনে অজৈব ও জৈব পদার্থের ভূমিকা

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

ওপরের ফাঁকা জায়গায় তোমার জানা ছটি মৌলের নাম লেখো যাদের চারটি হলো অধাতু ও দুটি হলো ধাতু। প্রায় 92টি মৌল দিয়েই পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিস তৈরি হয়েছে। জীবদেহে কিন্তু 92টি মৌলের প্রত্যেকটি পাওয়া যায় না। মাত্র 16টি মৌল নানান যৌগের আকারে জীবদেহে থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ আর মানবদেহের মধ্যে উপাদানে কী তফাত তা বুঝতে নীচের তালিকাটি দেখো। এখানে প্রতি 100 গ্রাম ওজনে কোন কোন প্রধান মৌল কত গ্রাম করে আছে তা দেখানো হয়েছে।

মানুষের দেহে মৌলের ওজনানুপাতিক শতাংশ		পৃথিবীর পৃষ্ঠে মৌলদের ওজনানুপাতিক শতাংশ	
অক্সিজেন	61.42	অক্সিজেন	46.6
কার্বন	22.85	কার্বন	< 1
নাইট্রোজেন	2.57	অ্যালুমিনিয়াম	8.1
হাইড্রোজেন	9.99	আয়রন	5
ক্যালশিয়াম	1.43	ক্যালশিয়াম	3.6
ফসফরাস	1.11	সিলিকন	27.7
সোডিয়াম	0.14	সোডিয়াম	2.8
পটাশিয়াম	0.14	পটাশিয়াম	2.6

তালিকা থেকে তুমি এমন তিনটি অধাতব মৌলের নাম লেখো যাদের পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠের চেয়ে মানবদেহে বেশি।

(1) ...., (2) ...., (3) ....।

আরো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মানবদেহের ওজনের প্রায় 97 শতাংশ হলো চারটি মৌলের মিলিত ভর। এরা কী কী বলতে পারো? (1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....।

শুধু মানবদেহ নয়; ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, সপুষ্পক উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণীদের দেহের উপাদান নিয়ে পরীক্ষা করলে সেখানেও এই চারটি মৌলের (C, H, O এবং N) প্রাধান্য দেখা যায়। এই চারটি মৌল দিয়ে নানা ধরনের জৈব যৌগ তৈরি হয় যা পৃথিবীপৃষ্ঠে পাওয়া যায় না। সেখানে আবার নানা অজৈব যৌগ (ধাতুর খনিজ পদার্থ) পাওয়া যায়।

একটা সবুজ পাতাওয়ালা গাছের কথাই ধরো — সে বাতাস থেকে নেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটি থেকে নেয় জল আর কিছু খনিজ লবণ। এসবই অজৈব যৌগ। এসব যৌগ আর সূর্যের আলোর শক্তি কাজে লাগিয়ে গাছ তৈরি করে গ্লুকোজ। এটা একধরনের জৈব যৌগ যা পৃথিবীপৃষ্ঠে যৌগদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই যে নতুন যৌগ তৈরি করার ক্ষমতা — এ হলো জীবের ধর্ম। শুধু গ্লুকোজ নয়, নানাভাবে গাছ আরো অনেক জৈব যৌগ তৈরি করতে পারে। তার অনেকগুলোই আমাদের ওষুধ। কোনোটা সুগন্ধি, কোনোটা পোকা তাড়ায়। আবার কোনোটা বা রং। এই নানারকমের জৈব যৌগ তৈরির ক্ষমতাই জীব আর জড়জগতের তফাত করে দিয়েছে।

জীবদেহের নানা যৌগ

জীবদেহ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ হলো জল। মানুষের দেহে এই জলের পরিমাণ প্রায় 70 শতাংশ। এই জলের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ কোশের মধ্যে থাকে। বাকি জল কোশের বাইরে আর রক্তে থাকে।

স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের দেহে প্রায় 10 শতাংশ জল বেশি থাকে।
ওজনের শতাংশের বিচারে বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের দেহে জলের পরিমাণ বেশি থাকে।
ওজনের শতাংশের বিচারে রোগা লোকদের দেহে মোটা লোকদের তুলনায় জল বেশি থাকে।

জীবদেহে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকলে জলের শতাংশ পরিমাণ কমে যায়।

প্রাণরক্ষা করার জন্য অক্সিজেনের পরই গুরুত্বপূর্ণ হলো জল। কয়েকদিন জলপান না করলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও প্রোটিন হজম হওয়ার পর তাদের সারাংশ জলের মাধ্যমেই সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। আবার দেহে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ জলের মাধ্যমেই দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে জল দ্রাবকের ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও জল দেহের নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (খাদ্যসংশ্লেষ, পরিপাক, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করে।

শামুক, ঝিনুকদের দেহের বাইরে শক্ত খোলস থাকে। এটি ক্যালশিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি। জলে দ্রবীভূত ক্যালশিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে শামুক, ঝিনুকরা এই যৌগটি তৈরি করে। আবার জলের মধ্যে গুলে যাওয়া অক্সিজেন ব্যবহার করে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বেঁচে থাকে। জলের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো চলাচল করতে পারে বলে জলজ উদ্ভিদরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। এরকম তিনটি উদ্ভিদের নাম লেখো।

(1) ...., (2) ...., (3) ....।

জীবদেহ গঠনে অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নানা ধাতব আয়ন।

টুকরো কথা

এই কথাগুলোর মানে কী? কথাগুলো কী সত্যি?

- "ছোটো মাছ খাওয়া ভালো, ওতে ক্যালশিয়াম আছে"।
- "ডাক্তারবাবু মা-কে ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন।"
- "মেটে খেলে শরীর আয়রন পায়।"

আমাদের দেহের কাজে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, আর, কোবাল্ট খুব প্রয়োজনীয় ধাতু। এদের কোনোটা ছাড়াই আমাদের চলবে না। এখানে আমরা মানবদেহের অতি প্রয়োজনীয় চারটে ধাতুর কথা জানব। এই ধাতুগুলো হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম ক্যালশিয়াম আর আয়রন।

প্রথমেই যে কথাটা আমাদের বুঝতে হবে তাহল শরীরে আসলে এইসব ধাতুদের নানান যৌগ থাকে। শরীর সরাসরি ধাতুগুলোকে কাজে লাগাতে পারে না। তুমি যখন ছোটো মাছ ভেজে খাচ্ছ তখন কিন্তু শরীরে ধাতব ক্যালশিয়াম ঢুকছে না, ঢুকছে মাছের হাড়ের গুঁড়ো। হাড়ের গুঁড়োয় আছে ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। একে শরীর কাজে লাগাতে পারবে। আবার ক্যালশিয়াম ট্যাবলেটে থাকে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) আর কিছু জৈব যৌগ। মেটে বা লিভারে আছে আয়রনের যৌগ। গর্ভবতী মহিলাকে যে আয়রন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু লোহার গুঁড়ো নেই; আছে লোহার বিশেষ কিছু যৌগ যা শরীর কাজে লাগাতে পারবে।

আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব আয়নগুলো যৌগরূপে খাদ্য ও লবণের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কখনও শরীরে এদের ঘাটতি দেখা দিলে বিশেষ বিশেষ ওষুধের মাধ্যমেও এদের খেতে হয়।

বিভিন্ন ধাতুর আয়ন কী কাজে লাগে :

আয়রন (লোহা) ঃ মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত তৈরি করতে আয়রন খুব প্রয়োজন। রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) ছাড়া কাজই করতে পারে না।

ক্যালশিয়াম ঃ আমাদের দেহে হাড়ের কঙ্কাল আছে বলেই আমরা হাঁটা-চলা, দৌড়োনো,ঝুঁকে-পড়া এসব করতে পারি। হাড়ের প্রধান উপাদান হলো ক্যালশিয়ামের ফসফেট যৌগ। এছাড়াও, কোশের অনেক কাজ ক্যালশিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) ছাড়া চলবে না।

সোডিয়াম আর পটাশিয়াম ঃ তোমায় পিঁপড়ে কামড়ালে বা সুড়সুড়ি দিলে সেই অনুভূতি তৎক্ষণাৎ সরু সুতোর মতো স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সুষুম্না কাণ্ডে পৌঁছে যায়। এই যে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সংকেত যাওয়া-আসা এসব ঠিকঠাকভাবে হতে হবে। শরীরে ঠিক ঠিক মাত্রায় সোডিয়াম আয়ন (Na^{+}) আর পটাশিয়াম আয়ন (K^{+}) না থাকলে সে কাজ হবে না। তখন মানুষ হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে, অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে।

জৈব যৌগ ঃ প্রাণ সৃষ্টির সময় শুধু যে জল বা বিভিন্ন ধাতব আয়ন লেগেছিল তা নয়। নানাধরনের জৈব যৌগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এরকম চার ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগ হলো — কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

তোমরা শুনেছ যে আমাদের দেহগঠন ও দেহরক্ষায় কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, নানা ধরনের প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির খুব গুরুত্ব আছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব যৌগ গঠনে যেসব মৌলের প্রয়োজন তারাও অপরিহার্য। এসব মৌলরা হলো- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন। আবার প্রোটিন অণু, নিউক্লিক অ্যাসিড ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জৈব অণু তৈরিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়াও সালফার ও ফসফরাস অংশগ্রহণ করে। জীবদেহে এসব মৌল দিয়ে তৈরি যৌগের প্রাচুর্যের জন্যই জীবদেহ আর ভূত্বকের গঠনে মৌলের পরিমাণের এতটা পার্থক্য দেখা যায়।

তুমি যদি একটা ধানের বীজ পুঁতে দাও, কয়েকদিন পরে কী দেখতে পাবে? .... ।

ধানের বীজ থেকে চারা বেরোনোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে শর্করা থেকে। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলা হয়। লিপিডরা জলে গোলে না। কোশে লিপিড ভেঙে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। আর চামড়ার নীচে এরকম লিপিডের মোটা স্তর থাকলে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরকম দুটো প্রাণীর নাম করো যাদের চামড়ার নীচে পুরু লিপিডের স্তর দেখা যায় — .... , ... ।

প্রোটিন হলো এমন একটি যৌগ যা ছাড়া প্রাণীদেহ গঠন ও তার বিভিন্ন কাজের কথা ভাবাই যায় না। ইতিমধ্যেই তোমরা মানুষের দেহের কোথায় কোথায় প্রোটিন আছে তার কথা জেনেছ (চুল, নখ, চামড়া, পেশি, রক্ত)। বিশেষ বিশেষ প্রোটিনই আমাদের রোগ জীবাণুর হাত থেকে বাঁচায়। আবার রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন প্রোটিন দেহের সব জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। বিভিন্ন উৎসেচক (এনজাইম) আমাদের দেহের নানান বিক্রিয়া (খাদ্যসংশ্লেষ, খাদ্যের পাচন, জীবাণু মেরে ফেলা, শক্তি উৎপাদন) তাড়াতাড়ি ঘটতে সাহায্য করে।

কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশধররা কেমন দেখতে হয় তা ঠিক করে নিউক্লিক অ্যাসিড। আবার কোন জীবের কেমন আচরণ হবে তাও ঠিক করে দেয় এই নিউক্লিক অ্যাসিড। এরকম তোমার জানা কয়েকটি বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো যা অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীতে দেখা যায় না।

(1) ম্যানগ্রোভ অরণ্যে জন্মানো উদ্ভিদ : .... ।

(2) রাতের বেলায় শিকার করতে বেরোনো প্রাণী : .... ।

(3) শুকনো আর গরম অঞ্চলে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদ : .... ।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য শনাক্তকরণ

জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যের প্রয়োজন, এটা আমরা জানি। আমরা এটাও জানি যে সবুজ উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। আর বিভিন্ন রূপে সেই খাদ্য চক্রাকারে তৃণভোজী থেকে মাংসাশী প্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা ভেবে বলো তো উদ্ভিদের কোন কোন অংশ সাধারণত আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি?

উদ্ভিদ দেহের অংশ	কোন গাছের অংশ
মাটির তলার মূল	বিট, গাজর, মুলো
মাটির তলার বা উপরের কাণ্ড	
ফল	

তোমরা যেসব ফল খেয়েছ বা সবজি হিসাবে যে সমস্ত গাছের ফল আমরা খাই তাদের স্বাদ কি একরকম ? নিজেদের আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলাবলি করে লেখো —

পরিচিত ফলের নাম	তাদের স্বাদ
পাতিলেবু	
পাকা আম	
আনারস	

অম্লের ধারণা

তাহলে দেখা গেল যে, সব ফলের স্বাদ একরকম নয়— কোনো ফল মিষ্টি, কোনোটা টক মেশানো মিষ্টি স্বাদের, আবার কোনোটা শুধুই টক। তোমরাই তাহলে ভাবো, মিষ্টি ফলের থেকে অন্য ফলগুলো স্বাদে আলাদা হলো কেন? অন্য ফলগুলোয় নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্য তাদের স্বাদ টক।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে তিনটে ছোটো কাচের গ্লাসে কিছুটা করে চিনির দ্রবণ, নুনের দ্রবণ ও ভিনিগার দ্রবণ তৈরি করো। দ্রবণ তিনটের স্বাদ নিয়ে তাদের চেনার চেষ্টা করো।

নমুনা দ্রবণটির স্বাদ	নমুনাটি কী বলে মনে হয়

দেখা যাচ্ছে যে ফল ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে যাদের স্বাদ টক। যেমন — টকে যাওয়া দুধ, ভিনিগার, দই।

আমরা এর থেকে কি বুঝতে পারছি যে ওপরের জানা টক স্বাদের জিনিসগুলোর মধ্যে এমন একটা সাধারণ (Common) জিনিস মিশে আছে যেটা ওদের টক স্বাদের জন্য দায়ী? সেই জিনিসটাকেই আমরা **অ্যাসিড** (Acid) বলি।

অ্যাসিড কথাটা কোথা থেকে এসেছে জানো? ল্যাটিন শব্দ **অ্যাসিডাস** থেকে, যার অর্থ **টক বা অম্ল।**

দলগত কাজ - চলো আমরা স্কুলের চারপাশে বা বাড়ির চারপাশে কী কী টক স্বাদের ফলের গাছ দেখা যায়, তার একটা তালিকা বানাই :

.... গাছ,............... গাছ,..............গাছ।

আমরা জেনে নিই পরিচিত কিছু জিনিসের মধ্যে কী কী অ্যাসিড আছে (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও) :

আপেল	ম্যালিক অ্যাসিড
পাতিলেবু	সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক অ্যাসিড
কমলালেবু	সাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যাসকরবিক আসিড
তেঁতুল	টারটারিক অ্যাসিড
টম্যাটো	অক্সালিক অ্যাসিড
চা	....
দই	....
ভিনিগার	....
সোডাওয়াটার	....
মিউরিয়েটিক অ্যাসিড	....

উদ্ভিদ দেহেই যে শুধু অ্যাসিড আছে তা নয়। এমন অনেক অ্যাসিড আছে যা বিভিন্ন প্রাণী বা মানুষের দেহেও পাওয়া যায়। একটা ছোটো লাল পিঁপড়ে কামড়ালে দেখা যায় সেই জায়গাটায় জ্বালা করে। তোমরা লক্ষ করে থাকবে লেবুর রস যেমন সিমেন্টের মেঝেতে দাগ সৃষ্টি করে, তেমনি একটা বড়ো পিঁপড়ে মরে গেলেও তার দেহ থেকে বেরোনো রসও লাল সিমেন্টের মেঝেতে প্রায় একইরকম দাগ তৈরি করে।

— এরকম ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে থাকা অ্যাসিডের জন্য। আগেই আমরা জেনেছি যে জামাকাপড়ের কোনো কোনো দাগ তোলার জন্যও লেবুর রস (যার মধ্যে অ্যাসিড আছে) ব্যবহার করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে অ্যাসিড ব্যবহারের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আমাদের নানা কাজে অ্যাসিড লাগে। এরকম কোনো ক্ষেত্রে অ্যাসিডের ব্যবহার তোমাদের জানা আছে কি? আলোচনা করে লেখো।

কী জিনিস	কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

একটা ছোটো কাচের গ্লাসে এক চামচ ভিনিগার নিয়ে আধ গ্লাস জলে মেশাও অথবা পাতিলেবুর রস নাও। তার মধ্যে এক চিমটে খাবার সোডা মেশাও। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

—এবার লক্ষ করো কিছু ঘটছে কিনা?

কী করা হলো	কী দেখা গেল

এটা কেন হলো বলো তো? এর কারণ হলো লেবুর রসে বা ভিনিগারে যে অ্যাসিড আছে, সেটা খাবার সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করেছে।

ক্ষারকের ধারণা

অন্য একটা ছোটো কাচের গ্লাসে পানীয় জলের মধ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় ছাত্রছাত্রীরা খাবার সোডার দ্রবণ তৈরি করো। এবার তোমরা আগের নেওয়া ভিনিগার দ্রবণ (বা লেবুর ছেঁকে নেওয়া রস), কিছুটা চুনজল ও এখন তৈরি হওয়া দ্রবণটার স্বাদ নাও। তোমাদের অনুভূতির কথা লেখো।

কীসের দ্রবণ	তার স্বাদ
ভিনিগার দ্রবণ	
খাবার সোডার দ্রবণ	
চুনের জল	

তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ যে এই তিনটে দ্রবণ স্বাদে ভিন্ন। তাহলে বোঝা গেল যে দ্রবণ দুটো একইরকম নয়। এদের মধ্যে ভিনিগার যে অ্যাসিড সেটা আমরা আগেই জেনেছি। তাহলে অন্য জিনিসগুলো কী?

তোমার বাড়ির কাছে পানের দোকানে গিয়ে জানার ও দেখার চেষ্টা করো দোকানের কাকু কীভাবে চুন জল তৈরি করেন। লক্ষ করলে দেখতে পাবে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে পাথুরে চুন দিলেই কেমনভাবে জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে। একই সঙ্গে কেমন শোঁ-শোঁ করে আওয়াজ হয়। এই চুন জল কিন্তু দোকানের কাকু সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করেন না। বেশ কয়েকদিন রাখার পর তবে তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন।

খেয়াল রাখো - তুমিও যখন চুনের জল ব্যবহার করবে তখন অনেক আগে থেকেই জলে চুন মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে তার ওপর থেকে সাবধানে কিছুটা জল ঢেলে নিতে হবে। চুন জল যেন কোনোভাবেই চোখে বা মুখে না পড়ে।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে আমড়া বা তেঁতুল গাছের তলায় বীজ থেকে অন্য গাছের চারা জন্মাতে চায় না। তার কারণ কী বলো তো?

— এই গাছগুলোর পাতায় অ্যাসিড থাকে। পাতা চিবোলেও টক স্বাদ পাওয়া যায়। ফলে মাটিতে পড়া পাতা থেকে গাছের নীচের মাটির অম্লত্ব বেড়ে যায়। তখন মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য মাটিতে চুন মেশানো হয়। তোমরা এও জানো যে পুকুরে মাছ চাষ করার সময় জলের অম্লত্ব কমানোর জন্য জলের মধ্যে চুন মেশানো হয়।

এই ধরনের পদার্থ যারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের আমরা বলি **ক্ষারক (Base)**। যেসমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তাদের বলা হয় ক্ষার (**Alkali**)। লঘু ক্ষারীয় দ্রবণের স্বাদ কষা ধরনের ও তাদের গাঢ় দ্রবণ স্পর্শ করে দু-আঙুলে ঘষলে পিচ্ছিল মতো অনুভূতি হয়। সব ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়। মনে রেখো গাঢ় ক্ষারীয় দ্রবণ চামড়া ও চোখের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক।

চুনের অথবা অন্য কোনো ক্ষারকের ব্যবহার জানা থাকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো:

জিনিসের নাম	তার ব্যবহার

আমাদের শরীরেও অনেকরকম অ্যাসিড আছে তা কি তোমরা জানো?

আমাদের শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বা গঠনমূলক কাজে নানাধরনের অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— বাজারে যে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেটার প্রধান উপাদান আমাদের পাকস্থলীতেও খাবার হজম করার সাহায্যের জন্য তৈরি হয়। তার নাম কী বলো তো? — **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।**

তাহলে আমাদের শরীরের পাকস্থলীতেও অ্যাসিড আছে, আবার সেটা কমানোর জন্য যে অম্লনাশক বা অ্যান্টাসিড জাতীয় জিনিসটা খাওয়া হলো, সেটা হলো ক্ষারক।

সব জিনিসের তো স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, সেটা শারীরবিজ্ঞানসম্মতও নয়। তাহলে কীভাবে আমরা অ্যাসিড চিনতে ও বুঝতে পারব? চলো দেখা যাক।

নির্দেশকের ধারণা

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের আশপাশ থেকে কয়েকটা লাল জবা ফুল আনো। তারপর জবাফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ও থেঁতো করে একটা ছোটো কাচের গ্লাসে রেখে তার মধ্যে সামান্য ঈষদউষ্ণ জল ঢালো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হবে সেটা কীভাবে আমাদের অ্যাসিড- ক্ষার চিনতে সাহায্য করতে পারে তা দেখা যাক।

তোমরা দুটো আলাদা কাচের গ্লাসে জবাফুলের পাপড়ির রস নিয়ে, একটার মধ্যে কিছুটা ভিনিগার আর অন্যটায় কিছুটা চুনজল যোগ করে তোমাদের পর্যবেক্ষণ লেখো। (অন্য কিছুও নেওয়া যেতে পারে।)

কী মেশানো হলো	জবা পাপড়ির রসের রং	
	আগে কী ছিল	পরে কী হলো

ভিনিগার হলো অ্যাসিড, সেটা জবাফুলের পাপড়ির রসের রংকে..................... থেকে .... করল। আবার চুনজল হলো ক্ষারক, সেটা আবার জবাফুলের পাপড়ির রসকে .... রং থেকে .... করল। এখানে জবাফুলের পাপড়ির রসের কাজটা কী হলো? সেটা অ্যাসিড ও ক্ষারক চিনতে সাহায্য করল। তাই এটি নির্দেশক। জবা পাপড়ির রস এখানে নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।

চলো একটা নতুন কৌশলে ছবি আঁকার চেষ্টা করি। তোমরা কিছুটা হলুদগুঁড়ো সামান্য জলে মিশিয়ে একটুকরো ফিলটার কাগজে মিশ্রণের প্রলেপ দাও। কাগজটা রোদে শুকিয়ে নাও। একটা কাঠির মাথায় তুলো পাকিয়ে একটা তুলি তৈরি করে খাবার সোডার বা চুনের জলে বা সাবান জলে ডুবিয়ে ওই কাগজটার ওপর একটা মনের মতো ছবি আঁকো তো !

তোমাদের জানা-চেনা এমন কোনো জিনিস আছে কি, যাদের রং অ্যাসিড বা ক্ষারকে পালটে যায়; এরকম কোনো বিষয় জানা থাকলে বলাবলি করে লেখো।

কী জিনিস	তার নিজের রং	অ্যাসিডে কী রং	ক্ষারকে কী রং
হলুদের জল			
বিটের রস			
কালোজামের রস			

তোমার প্রিয় বন্ধুকে একটা গোপন নির্দেশ পাঠাবে? একটু সাহায্য করি! খাবার সোডা কিছুটা জলের মধ্যে মেশাও। আগের মতো একটা তুলি তৈরি করে একটা সাদা কাগজে লিখে ফেলো মনের কথাটা। রোদে শুকিয়ে নিলে কি হবে বলত? — সাদা কাগজ সাদাই থাকবে। যে পড়বে তাকে অবশ্য একটা কথা আগে থেকেই শিখিয়ে রাখো যে একটা বিটের টুকরো কেটে কাগজের লেখার ওপর ঘষে নিয়ে তবে পড়তে হবে!

এছাড়াও অনেক জৈব পদার্থ নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়া

করে দেখো : আমরা আগেই দেখেছি যে জবাফুলের পাপড়ির দ্রবণে অ্যাসিড বা ক্ষারক মেশালে তার রং-এর পরিবর্তন হয়। নির্দেশকের এই ধর্মটা কাজে লাগিয়ে নীচের পরীক্ষাটি করে দেখো।

একটা কাচের ছোটো গ্লাসে (বা কাচনলে) আগের পাতার জবা পাপড়ির পরীক্ষার মতো ভিনিগার দ্রবণ নাও। আর তার মধ্যে আগের তৈরি জবা পাপড়ির কিছুটা দ্রবণ ঢালো। প্রথমে রংটা কেমন হলো? .... ।

এরপর এই মিশ্রণে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) যোগ করতে থাকো। কাচদণ্ড দিয়ে দ্রবণকে ধীরে ধীরে নাড়ো। দ্রবণের মধ্যে যেখানে ফোঁটাটা পড়ছে, সেই জায়গাটা ভালো করে লক্ষ করতে থাকো। ধীরে ধীরে দ্রবণের রং-এর কী পরিবর্তন ঘটছে তা লেখো : .... ।

এরকমভাবে খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) যোগ করার ফলে একসময় দ্রবণের গোলাপি রং যে মুহূর্তে সবেমাত্র সবুজ হলো, তখন কী হলো বলে মনে হয়?

— ঠিক তখনই গ্লাসের ভিনিগার দ্রবণের সঙ্গে খাবার সোডার দ্রবণের বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে, দ্রবণে ক্ষারক ধর্ম প্রকাশ পেতে শুরু করল।

এরপর ওই সবুজ দ্রবণে আরও কয়েক ফোঁটা খাবার সোডার দ্রবণ মেশাও দ্রবণের রং-এর কী পরিবর্তন হলো? ....।

এবার কিছুটা ভিনিগার দ্রবণ তার মধ্যে মেশাও। একেবারে প্রথম অবস্থার জবা পাপড়ির দ্রবণ মেশানো দ্রবণের সঙ্গে কোনো মিল পেলে কি? ....।

ওপরের জবা পাপড়ির রং পালটে যাওয়া থেকে কী বোঝা গেল?

ঠিক যে সময় জবাফুলের পাপড়ির দ্রবণ মেশানো ভিনিগার দ্রবণে অন্তত এক ফোঁটা খাবার সোডার দ্রবণ (বা চুন জল) বেশি মেশানো হলো তখনই দ্রবণের রং গোলাপি থেকে সবুজ হলো। তাহলে খাবার সোডার দ্রবণ মেশানোর ফলে ভিনিগার দ্রবণের ধর্ম কি একই থাকল? ....।

ভিনিগার দ্রবণে যত বেশি খাবার সোডা দ্রবণ মিশতে থাকে, ভিনিগারের সঙ্গে খাবার সোডা বিক্রিয়া করে ভিনিগার দ্রবণের অ্যাসিড ধর্ম তত কমে যায়। যে বিক্রিয়ার ফলে এক্ষেত্রে ভিনিগারের অ্যাসিড ধর্ম আর থাকল না তাকেই আমরা সাধারণভাবে প্রশমন বিক্রিয়া বলি।

- উপরের প্রশমন বিক্রিয়াটি বিটের রস বা কালোজামের রসের সাহায্যে নিজেরা করে দেখো।

করে দেখো : কতকগুলো নির্দেশক (যেমন— লিটমাস, ফেনলথ্যালিন বা মিথাইল অরেঞ্জ) নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দ্রবণের রং-এর কেমন পরিবর্তন হয়, সেটা দেখে নীচের সারণিতে লেখো।

জলীয় দ্রবণ	নীল লিটমাসের রং	লাল লিটমাসের রং	ফেনলথ্যালিনের রং	....
সাবান/গুঁড়ো ডিটারজেন্ট				
জল				
লেবুর রস				

রোজকার জীবনে তোমাদের বাড়ির চারপাশে এমন কোনো প্রশমন বিক্রিয়ার উদাহরণ জানা থাকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো:

কী কাজে প্রয়োগ হয়	কী মেশানো হয়	কেন মেশানো হয়
পুকুরের জলে		
মাটিতে		

বায়ুতে দূষকরূপে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের মতো নানা গ্যাস মিশে যায়। অনেকদিন পরে বৃষ্টি হলে ওই গ্যাসগুলো বৃষ্টির জলের মধ্যে মিশে বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে। তখন পরীক্ষা করে দেখো তো বৃষ্টির জলের মধ্যে আম্লিক না ক্ষারীয় কোন ধর্ম দেখা যায়।

অ্যাসিড-ক্ষারের দ্রবণে তাদের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা

নির্দেশক ব্যবহার করে অ্যাসিড বা ক্ষারক কীভাবে চেনা যায় সেটা আমরা দেখেছি। কিন্তু সব অ্যাসিড দ্রবণ কী একই পরিমাণে আম্লিক? তা যে নয়, এসো সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি।

কর্মপত্র

(a) জীবদেহ বা জৈব উৎস থেকেপাওয়া যায় এরকম তিনটি অ্যাসিডের নাম লেখো—

(1) .... (2) .... (3) ....

জৈব উৎস থেকে পাওয়া এধরনের অ্যাসিডগুলো তাহলে কী ধরনের অ্যাসিড?

— জৈব অ্যাসিড।

(b) জৈব উৎস নয় এমন উৎস থেকে পাওয়া অ্যাসিডগুলোকে তাহলে কী ধরনের অ্যাসিড বলা যাবে?

.... ।

এদের অপর নাম খনিজ অ্যাসিড। এরকম অ্যাসিডের উদাহরণ কী কী হতে পারে?

(1) ....। (2) ....।

জলের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যার সংকেত HCl, তা দিলে কী হয়?

জলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যাসিডটা আয়নিত হয়।

$$HCl \rightarrow H^{+} + Cl^{-}$$

অ্যাসিড ভেঙে তৈরি হওয়া হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) জল অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে জলীয় দ্রবণে H_3O^+ রূপে থাকে, যাকে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন বলে।

$$H^{+} + H_2O \rightarrow H_3O^{+}$$

তাহলে জলীয় দ্রবণে HCl-এর বিয়োজন বিক্রিয়াটি কীভাবে লেখা যাবে?

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^{+} + Cl^{-}$$

(C) জলীয় দ্রবণে HCl ভেঙে গিয়ে কী কী আয়ন উৎপন্ন করছে?

............................., ... ।

এখন প্রশ্ন হলো, এদের মধ্যে কোন আয়নটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বা অন্য কোন অ্যাসিডের অ্যাসিড ধর্মের জন্যে দায়ী?

অন্য কয়েকটা অ্যাসিডের সংকেত ও সেগুলো জলীয় দ্রবণে কীভাবে আয়নিত হয় তা দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয় কিনা দেখো।

অ্যাসিডের নাম ও সংকেত	জলীয় দ্রবণে কীভাবে ভাঙতে পারে
ফরমিক অ্যাসিড (HCOOH)	$HCOO\mathbf{H} \rightarrow HCOO^{-} +$ ....
নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)	$\mathbf{H}NO_3 \rightarrow$ .... + ...
সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)	$\mathbf{H_2}SO_4 \rightarrow$ .... + SO_4^{2-}

বিভিন্ন অ্যাসিড অণুগুলির ভাঙনের বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখে বলতে পারো কোন আয়ন সব অ্যাসিড ভেঙেই তৈরি হয়?

.... ;

এটাই তাহলে এই পদার্থগুলোর অ্যাসিড ধর্মের জন্যে দায়ী। যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) (প্রকৃতপক্ষে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন, H_3O^+) তৈরি করে তাদের অ্যাসিড বলা হয়।

অ্যাসিড যেমন জলীয় দ্রবণে ভেঙে গিয়ে H^+ (প্রকৃতপক্ষে H_3O^+) উৎপন্ন করে, চুন বা অন্য কিছু যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে। চুনজলের মধ্যে কলিচুনের বিয়োজন বিক্রিয়াটি কীভাবে লেখা যাবে? $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ OH^-$

জলীয় দ্রবণে এই সমস্ত যৌগ থেকে উৎপন্ন হাইড্রক্সাইড আয়নই (OH^-) অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+)সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে। এই যৌগগুলোকেই ক্ষার বলা হয়। অ্যাসিড-ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় জলের সঙ্গে লবণও উৎপন্ন হয়।

অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) + ক্ষারের হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) $\rightarrow$ জল (H_2O)

কোনো নির্দেশকেই জল অ্যাসিড বা ক্ষার কোনো ধর্মই দেখায় না। তাই জলকে প্রাথমিকভাবে প্রশম প্রকৃতির দ্রাবক বলা যেতে পারে।

আমরা তাহলে অ্যাসিড-ক্ষারের ধর্মের তুলনা করে লিখতে পারি :

অ্যাসিডের ধর্ম	ক্ষারের ধর্ম
(1) সাধারণভাবে অ্যাসিডের স্বাদ ....।	(1) সাধারণভাবে ক্ষার স্বাদে ....।
(2) অ্যাসিড জলে ভেজানো .... লিটমাসকে .... করে ।	(2) ক্ষার জলে ভেজানো ....লিটমাসকে .... করে।
(3) অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে H^+ উৎপন্ন করে।	(3) ক্ষার জলীয় দ্রবণে .... উৎপন্ন করে।

কোন দ্রবণ কতটা আম্লিক বা কতটা ক্ষারীয় তা মাপা হয় pH রাশির সাহায্যে। 0 থেকে 14 পর্যন্ত বিস্তৃত একটি স্কেল এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

pH - এর স্কেলটা কেমন?
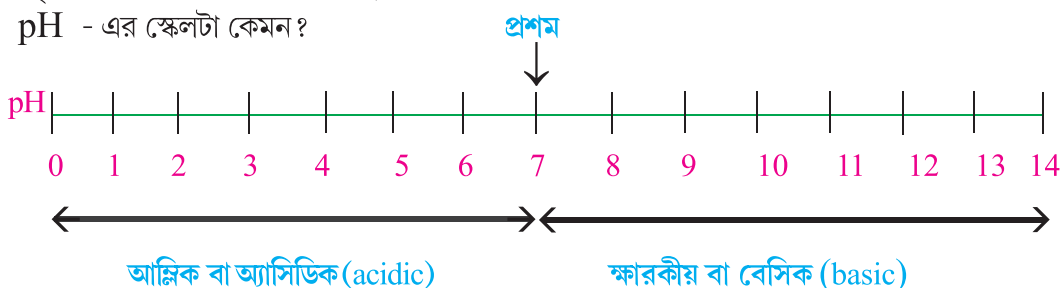
25°C উষ্ণতায় প্রশম দ্রবণের (যেমন-জলের) pH 7 বলা হয়। যে দ্রবণের pH 7-এর থেকে কম (শূন্য পর্যন্ত) সেটি আম্লিক প্রকৃতির। আর যে দ্রবণের pH 7 -এর চেয়ে বেশি (14 পর্যন্ত) সেটি ক্ষারীয়।

জেনে রাখো : সহজে pH মাপার জন্য লিটমাস কাগজের মতো pH-কাগজ পাওয়া যায়। pH-কাগজ তৈরিতে একাধিক নির্দেশকের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। একাধিক নির্দেশক থাকে বলেই বিভিন্ন pH-এ কাগজের রং বিভিন্ন হয়। অন্য জটিল পরীক্ষার সাহায্যে ঠিকভাবে pH মাপা সম্ভব। এসম্বন্ধে তোমরা পরে জানতে পারবে।

নীচের দ্রবণগুলোর pH 7, না 7-এর কম, না 7-এর বেশি — কীরকম হতে পারে? pH কাগজের সাহায্যে পরীক্ষা করে লেখো :

কী দ্রবণ	pH - এর মান 7 এর ওপরে না নীচে	দ্রবণের প্রকৃতি
ভিনিগারের জলীয় দ্রবণ		
সাবান জল		
খাদ্য লবণের জলীয় দ্রবণ		
খাবার সোডার জলীয় দ্রবণ		
পাতিলেবুর রস		

এসো দেখি তোমার পরিচিত আর কোন কোন উপাদানের pH কীরকম।

1. তোমার কাছাকাছি বাজারে যাও। সেখান থেকে তোমার পরিচিত নানা রসালো বা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করো (টম্যাটো, আম, আঙুর, তরমুজ, কমলালেবু, মাছ, মাংস, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি)। এদের pH-এর মান কত হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখো আর আগের সারণির মতো একটা সারণি বানাও। বিভিন্ন খাদ্যের সংস্পর্শে pH পেপারের রং পরিবর্তন থেকে সেই সব খাদ্যের pH-এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো।

2. তোমার পরিবেশে জলের উৎসগুলি চিহ্নিত করো (পুকুর/নদী/বাঁওড়/নয়ানজুলি/খাল/বিল/ট্যাপ ওয়াটার/বৃষ্টির ধরে রাখা জল ইত্যাদি)। এদের জলের প্রকৃতি বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করে জানার চেষ্টা করো। দেখো তো বছরের বিভিন্ন সময় এদের pH-এর মান বাড়ে বা কমে কিনা। বোঝার চেষ্টা করো পরিষ্কার জলে কোন কোন উপাদান মিশলে pH-এর মান হেরফের বা বদল ঘটে।

3. তোমার আশপাশে কি সব ফসলের চাষ ভালো হয়? সব ফসল কি একইধরনের মাটিতে ভালো হয়? তোমার আশপাশের চাষজমি সমীক্ষা করো। (চাষের জমি থেকে মাটির নমুনা নিয়ে জলে গুলে দ্রবণ তৈরি করো। দ্রবণের এক অংশে নির্দেশক যোগ করে দেখো কেমন পরিবর্তন হয়। প্রয়োজনে pH পেপারের সাহায্য নিতে পারো)। দেখো তো সব জমির মাটি একরকম কিনা। প্রয়োজনে লিটমাস কাগজ, pH পেপারের সাহায্য নাও।

বিভিন্ন pH-এ pH কাগজের রং কেমন হতে পারে তার একটা নমুনা ওপরে দেওয়া হলো।

মানবদেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য

তোমরা আগেই **অ্যাসিডের** নাম শুনেছ। দেখো তো কতগুলো জিনিস তুমি চিনতে পারো কী না যা অ্যাসিড বা যার মধ্যে কোনো অ্যাসিড মিশে আছে। নীচের তালিকায় আম্লিক জিনিসগুলোর নামের ওপরে ✓ চিহ্ন দাও :

মিউরিয়েটিক অ্যাসিড (বাথরুম পরিষ্কার করার অ্যাসিড), সাবান, লেবুর রস, খাবার জল, দই, ঘোল, ল্যাকটিক অ্যাসিড (যা দিয়ে ছানা কাটানো হয়), ফুচকার জল, বড়ো ব্যাটারির জল।

চিনবে কীভাবে? যেগুলোকে অ্যাসিড বলে জেনেছ, সেগুলো কীভাবে চিনেছ?

.... ।

তাদের মধ্যে কোনো মিল আছে?

.... ।

মনে রেখো, সব অ্যাসিড মুখে দেওয়া উচিত নয়, দেহের কোনো জায়গায় বা কাপড়ে লাগানো উচিত নয়। অ্যাসিডের প্রভাবে শরীরে ঘা হতে পারে, কাপড় ফুটো হয়ে যেতে পারে।

তবে আর কি উপায়ে অ্যাসিড চেনা যায়? এসো দেখি?

তোমার লাগবে দু-তিনটে করে লাল লিটমাস কাগজ আর নীল লিটমাস কাগজ, আর যে জিনিসগুলোকে অ্যাসিড বলে চিনতে চাও, তার সামান্য অংশ।

সহজে জোগাড় করতে পারো : লেবুর রস, দই, ফুচকার জল, ...

এবার লিটমাস কাগজগুলোকে ছোটো টুকরোয় ছিঁড়ে প্রতিটি দ্রবণে একবার একটুকরো নীল লিটমাস কাগজ আর একবার একটুকরো লাল লিটমাস কাগজ ডোবাও। নীচের ছকে লেখো তো লিটমাস কাগজের রঙের কী পরিবর্তন হলো? [একটা লিটমাস কাগজ মাত্র একবারই ব্যবহার করবে]

ক্রম	জিনিসটির নাম	নীল লিটমাসের রং কী হলো	লাল লিটমাসের রং কী হলো
1.			
2.			
3.			
4.			

তাহলে অ্যাসিড চেনার উপায় কী জানলাম লেখো।

.... ।

মনে রেখো এটা **অ্যাসিডের** একটা ধর্ম।

তোমরা তো ক্ষারের নামও নিশ্চয়ই জানো। দেখো তো নীচের তালিকায় কতগুলো ক্ষারীয় পদার্থকে চিনতে পারো — লেবুর জল, সাবান জল, খাবার জল, চুনের জল, খাবার সোডা মেশানো জল, লস্যি, ফুচকার জল।

ক্ষারগুলোকেই বা কী পরীক্ষা করে চিনবে?

.... ।

তাদের মধ্যে মিল কোথায়?

.... ।

অ্যাসিডের মতোই ক্ষারীয় পদার্থও মুখে দেওয়া, গায়ে ফেলা বা কাপড়ে ফেলা অনুচিত।

একে চিনতে গেলেও তোমার লাগবে **লাল** আর **নীল** লিটমাস কাগজ, আর যে যে জিনিস পরীক্ষা করতে চাও তার একটু করে অংশ :

সাবান জল, চুনের জল, সোডার জল ইত্যাদি।

এবার প্রতিটি জিনিসে একবার করে **লাল** লিটমাস কাগজ আর **নীল** লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে তোলো। লিটমাস কাগজের রঙে কী পরিবর্তন হলো, নীচের ছকে লেখো।

ক্রম	জিনিসের নাম	লাল লিটমাসের রং কী হলো	নীল লিটমাসের রং কী হলো
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

তাহলে **ক্ষারীয়** পদার্থ চেনবার উপায় কী জানলাম?

....

মনে রেখো এটা **ক্ষারের** একটা ধর্ম।

মনে রেখো, দেহের কোথাও অ্যাসিড বা ক্ষারীয় পদার্থ লাগলে, বিশেষ করে চোখে বা নাকে গেলে, সেই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে ফেলা দরকার। রগড়ে ধোবে না বা সাবান দেবে না। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তুলো দিয়ে আলগা করে ঢেকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। কেউ অ্যাসিড বা ক্ষার খেয়ে ফেললে কোনোরকম দেরি না করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল চুনকামের সময় কাছে যাবে না। সকলকে সতর্ক করবে যে ক্ষার চোখে পড়লে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

এবার তাহলে কয়েকটা জিনিস নিজেরা চেনবার চেষ্টা করে দেখো:

তোমার লাগবে কয়েকটা **লাল** আর **নীল** লিটমাস কাগজ, আর চেনবার জন্য কিছু নমুনা। তারপর প্রতিটি নমুনাকে আগে যেমন করেছো, তেমনভাবে লাল আর নীল লিটমাস কাগজ নিয়ে পরীক্ষা করে নীচের তালিকায় লেখো।

ক্রম	নমুনা	লাল লিটমাসে কী হলো	নীল লিটমাসে কী হলো
1	লেবুর শরবত		
2	খাবার জল		
3	সাজা পান		
4	কাটা কাঁচা আলুর টুকরো		
5	কাটা টম্যাটো		

কোন নমুনাগুলোকে **অ্যাসিড** বলে চিনতে পারলে?

................................।

কোন নমুনাগুলোকে **ক্ষারীয়** বলে চিনতে পারলে?

................................।

এবার বলো তো নীল বা লাল লিটমাসের উপর অ্যাসিড বা ক্ষারক যে ক্রিয়া করে, উপরের নমুনাগুলো মধ্যে কোনগুলি নির্দেশকের রঙের পরিবর্তন দেখায় না?

........................, ...।

লিটমাসের ওপর তাদের ক্রিয়া কীরকম?

(a) **লাল লিটমাস কাগজে** ....

(b) **নীল লিটমাস কাগজে** ....

এরা হলো প্রশম পদার্থ। এরা জলে দ্রবীভূত হলে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) দেয়ও না, আবার তাকে প্রশমিতও করে না।

তাহলে এসো অ্যাসিড, ক্ষারক আর প্রশম পদার্থের তুলনা করি :

বৈশিষ্ট্য	অ্যাসিড	প্রশম পদার্থ	ক্ষারক
নীল লিটমাসের উপর ক্রিয়া			
লাল লিটমাসের উপর ক্রিয়া			

আমাদের দেহের সব কাজ ঠিকঠাকভাবে চলতে হলে অম্ল-ক্ষারের নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখা দরকার। আমাদের দেহের বিভিন্ন তরলের অম্ল-ক্ষার মাত্রা (pH) বিভিন্নরকম। বলো দেখি কোনটি কেমন?

তরলের নাম	pH-এর মান	প্রকৃতি (আম্লিক/ক্ষারীয়/প্রশম)
1. লালারস	6.02 — 7.05	
2. পাকস্থলীর রস	0.9 — 1.05	
3. পিত্তরস	8.0 — 8.60	
4. রক্ত	7.35 — 7.45	
5. মূত্র	4.0 — 8.0	

মানবদেহে একটি নির্দিষ্ট **অ্যাসিড-ক্ষার** ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা দেহের নানা অঙ্গ (দাঁতের এনামেল, অস্থিসন্ধি) ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তাড়াতাড়ি বার্ধক্য চলে আসতে পারে। মানবদেহের প্রত্যেক কোশই ভালোভাবে কাজ করে যখন এটি প্রধানত ক্ষারীয় (pH 7-8) মাধ্যমে থাকে। নানা কারণে রক্ত কখনো-কখনো উল্লেখযোগ্যভাবে আম্লিক হয়। তখন দেহের যেখানে যেখানে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম খুঁজে পায়, সেখান থেকে বৃক্ক রক্তের মাধ্যমে তাকে টেনে নেয়। এই প্রক্রিয়া প্রথমে চুল, ত্বক কিংবা নখ থেকে শুরু হয়। তারপর রক্তে এবং শেষপর্যন্ত হাড়ে পৌঁছোয়।

মানবদেহে **অ্যাসিড-ক্ষার** ভারসাম্য প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

1. নিশ্বাস প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড কতটা বেরোয় তার ওপর।

2. দেহে ঘটে চলা নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিবর্তনের ওপর।

ফুসফুসের মাধ্যমে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে দেহ ক্ষারীয় হয়। আবার ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কম বেরোলে রক্তে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে ($H_2O + CO_2 \leftrightarrows H_2CO_3$)। ফলে দেহতরল আম্লিক হয়ে পড়ে।

এবার নীচের ঘটনাগুলো লক্ষ করো —

1. খেলতে খেলতে হঠাৎ পায়ে চোট পেলে আমাদের খুব ব্যথা হয়। আমরা তখন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যথা কমানোর ওষুধ খাই। এই জাতীয় কিছু ওষুধ অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট করে।

2. কখনো-কখনো আমাদের অনেকেরই মুখ টক হয়। চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

3. আমাদের যখন কোনো অসুখে অনেকবার পাতলা পায়খানা হয়, তখন পায়খানার সঙ্গে অন্ত্রের ক্ষারকীয় রস বেরিয়ে যায়।

4. বিভিন্ন জীবাণু যখন আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে, তখন আমাদের দেহের কোশে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।

5. আমরা যখন কোনো ভারী কাজ অনেক সময় ধরে করি, তখন আমাদের পেশিকোশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন পেশিকোশে গ্লুকোজ ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন বেড়ে যায়।

6. আমাদের অনেকেরই রক্তে সুগারের (গ্লুকোজ) পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকে। সেক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় যে তাদের দেহকোশে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

7. মানসিক চাপ বাড়লে বা দীর্ঘদিন ধূমপান করলেও দেহে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে।

8. আমাদের বৃক্ক যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এবার তোমরা বলো ওপরের কোন কোন অবস্থায় —

দেহে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যায় — ...., ..., ..., ..., ..., ..., ...।

অম্ল-ক্ষার ও আয়নের ভারসাম্য রক্ষায় দেহের কোন কোন অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা করে না তা ওপরের আলোচনা থেকে নির্দেশ করো।

যে সব অঙ্গ বা দেহতরল অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে ...., ..., ...।

টুকরো কথা

উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া খাদ্যগুলো (ফল, নানা ধরনের শাকসবজি) দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষারজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। আবার মাছ, মাংস, ডিমের মতো প্রাণীজ উৎস থেকেপাওয়া খাদ্যগুলো দেহের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অম্লজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। মানুষের প্রতিদিনের খাবারের 20 শতাংশ অম্ল উৎপাদনকারী খাদ্য (মাছ, মাংস, ডিম) ও 80 শতাংশ ক্ষার উৎপাদনকারী খাদ্য (ফল, নানা ধরনের শাকসবজি) হওয়া প্রয়োজন। তবেই মানুষের শরীরের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য ঠিক থাকে। যাঁরা আমিষ খাদ্য বেশি খান বা পছন্দ করেন তাদের খাদ্যতালিকায় শরীরের প্রয়োজন মতো 20 শতাংশের মধ্যে এই ধরনের খাদ্য সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

খাদ্য লবণ

ওপরের ছবিদুটো দেখে বলো, আমরা খাবার হিসাবে যে সমস্ত জিনিস গ্রহণ করি তাদের প্রধান দুটো উৎস কী কী?

1. .... উৎস এবং   2. .... উৎস

এই দুটো উৎস থেকে পাওয়া কী কী খাবার তোমরা সাধারণত খেয়ে থাকো তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করো:

কোন ধরনের উৎস থেকে পাওয়া	কী কী খাদ্য

এই সমস্ত খাবার আমরা কতরকমভাবে খেয়ে থাকি?

1. .... 2. .... 3. .... 4. রান্না করে খাই।

আবার ভেবে দেখো — (ক) সব অঞ্চলের আবহাওয়া একইরকম নয়,

(খ) সব অঞ্চলে সবরকম খাবার পাওয়াও যায় না।

তাই সব অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস কী একইরকম হয়?

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের খাদ্য
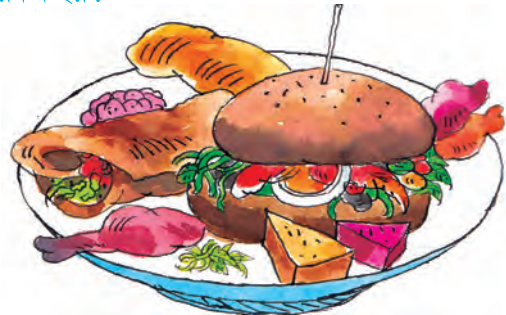
শীতপ্রধান অঞ্চলের খাদ্য

এখন ভেবে দেখো নুন ছাড়া বা কম নুন দেওয়া খাবার তোমাকে খেতে দেওয়া হলো। কেমন খেতে লাগবে তোমার?

— খেতে ভালো লাগবে/ভালো লাগবে না (সঠিক উত্তরটি বেছে নাও)।

তাহলে দেখো, খাদ্যের উৎস বা খাদ্যাভ্যাস যেমনই হোক না কেন, আমাদের খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো খাবার নুন। তার প্রধান একটা কারণ হলো নুনের স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। অন্য কারণটা কী?

— আমাদের শরীরে নুনের প্রয়োজনীয়তা। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। বাড়িতে সবাই খাবার নুন দেখেছ। নুনের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম কী কী?

(a) খাবার নুনের রং সাধারণত ....।

(b) সাধারণ অবস্থায় এটি .... পদার্থ।

(c) খাবার নুন জলে ....।

(d) একটুকরো কাগজের ওপর কিছুটা খাবার নুন ছড়িয়ে জানালার কাছে নিয়ে যাও। একটু স্পর্শ করলে বুঝতে পারবে নুন জিনিসটা দানা-দানা। আবার কাগজটা একটু কাত করে উলটেপালটে লক্ষ করলে দেখবে ওই দানাগুলোতে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এই ধরনের **নির্দিষ্ট আকারের দানাবিশিষ্ট পদার্থকে কেলাসাকার পদার্থ বলে।**

তাহলে কী বোঝা গেল?

খাবার নুন হলো একটি .... রঙের কেলাসাকার .... মিশ্র পদার্থ। এর প্রধান উপাদানের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সংকেত NaCl।

প্রঃ— নীচের কোন কোন পদার্থ কেলাসাকার বলে তোমার মনে হয়?

চিনি, চকের গুঁড়ো, চুন, বালি, গায়ে মাখার পাউডার, ফটকিরি।

উঃ-- ....।

খাবারের মধ্যে বাইরে থেকে নুন (NaCl) যোগ করা হয়, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেটাই কী আমাদের শরীরে যতটা নুন প্রয়োজন তার একমাত্র উৎস?

(a) একটু দুধের সর বা একটু মাখন খেলে তার স্বাদ কেমন লাগে?

এদের স্বাদ ....। মাখনে নুন মেশানো হয়।

এই খাদ্যের উৎস উদ্ভিজ্জ না প্রাণীজ? এদের উৎস ....।

এ রকমই প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমরা প্রয়োজনীয় নুনের বেশ কিছুটা পেয়ে যাই।

(b) পানীয় জলের মাধ্যমেও কিছুটা নুন দেহে প্রবেশ করতে পারে।

(c) উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে পরিমাণে কম হলেও কিছুটা নুন দেহ পেয়ে যায়।

কিন্তু দেহের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটানোর জন্য যে বাইরে থেকে নুন খাবার প্রয়োজন, তা প্রাচীনকালেই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল। তখন তারা এই নুন সংগ্রহ করত কোথা থেকে?

তখন সামুদ্রিক লবণই ছিল খাবার নুনের প্রধান উৎস। আবার বিভিন্ন পাথরের খাঁজে জমে থাকা নুনও তারা সংগ্রহ করত।

এখন আমরা খাবার জন্য কতরকম লবণ ব্যবহার করি বলো তো?

মূলত: তিন ধরনের লবণ — (i) **সৈন্ধব বা সামুদ্রিক লবণ**
(ii) **বীট লবণ বা 'রক সল্ট'**
(iii) **খাবার নুন বা 'টেবিল সল্ট'।**

প্রথম দুটো লবণেরও মূল উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড। তার সঙ্গে আরো অনেক যৌগও মিশে থাকে। সমুদ্র লবণে প্রায় 47 রকমের যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে 7 টি যৌগ উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হলো:

(a) ওপরের তালিকায় সবচেয়ে বেশি ধরনের যৌগ আছে কোন ধাতুটির? ....

(b) সমুদ্র লবণে বিভিন্ন ধাতুর পরিমাণ বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে এই ....ধাতুটির পরিমাণ সোডিয়ামের পরিমাণের ঠিক পরেই।

(c) অন্যান্য উপাদান হিসাবে যে সমস্ত যৌগ খুবই কম পরিমাণে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড, ...(সংকেত লেখো)।

আমরা রোজকার জীবনে যে খাবার নুন ব্যবহার করছি তার উৎস তাহলে কী?

— সেই সমুদ্র লবণই; যদিও সমুদ্র লবণকে রাসায়নিকভাবে পরিষ্কার করার পর তার মধ্যে সোডিয়াম

ক্লোরাইডের পরিমাণ বেড়ে শতকরা 99.9 ভাগ হয়ে যায়। খাবার নুনের বাকি অংশটায় তাহলে কী মিশে থাকে?

তার জন্য একটা সহজ পরীক্ষা করো:

তোমাদের বাড়িতে বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে রাখা ও খোলা পাত্রে রাখা খাবার নুন ভালো করে লক্ষ করো। কিছুদিন এভাবে রাখা থাকলে দুটো আলাদা পাত্রে দু-ভাবে রাখা নুন কেমন অবস্থায় থাকে তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখো।

(a) আবদ্ধ পাত্রের নুন ....

(b) খোলা পাত্রের নুন ....

এই ঘটনাটা আরো ভালো করে বোঝা যায় বর্ষাকালে।

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড বাতাস থেকে জল শোষণ করতে পারে না। নুনের মধ্যে থাকা প্রধান তিনটি উপাদান হলো --- সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড যৌগ। ওপরের ঘটনার জন্যে তাহলে নুনের মধ্যে থাকা কোন কোন যৌগ দায়ী?

....।

(a) আমাদের দেহের মধ্যে যে দেহতরল আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কী আছে? — তার প্রধান উপাদানই হলো............................।

(b) তাহলে দেহতরলের মধ্যে খাবার নুনের প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইডের কী হয়?

— সোডিয়াম ক্লোরাইড আয়নে ভেঙে যায়:

সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) $\longrightarrow$ সোডিয়াম আয়ন (Na+) + ক্লোরাইড আয়ন (Cl–)

(c) তাহলে খাবার নুনের অন্য মূল উপাদান দুটোর কী হয় দেহের মধ্যে?

— তারাও আয়নে ভেঙে যায়:

ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) $\longrightarrow$ Mg^{2+} + $2Cl^-$

ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) $\longrightarrow$ .... + ...

(d) নুনের এই সোডিয়াম আয়ন (Na^+) দেহের জলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থেকে যায়। তাই দেহের মধ্যে তার কার্যকারিতাও বহুমুখী।

কোনো কারণে যদি তোমার ঠোঁট কেটে যায় বা খেতে গিয়ে গালের ভিতরে কামড় বসাও, তখন রক্তের স্বাদ কেমন লাগে?

— রক্তের স্বাদ ....।

(e) তাহলে রক্তের মধ্যেও .... দ্রবীভূত অবস্থায় আছে।

(f) পরিমাপ করলে দেখা যাবে মানুষের দেহে রক্তের 100 মিলিলিটারে NaCl-এর পরিমাণ 0.9 গ্রাম। মানব রক্তের প্রধান অংশটা কী?

— তা হলো ....।

(g) রক্তের মধ্যেও NaCl আয়নিত হয়ে Na^+ ও Cl^- আয়ন তৈরি করে।

মানবদেহের সারা শরীরকেই যুক্ত করে রেখেছে এমন তরল মাধ্যমটি কী?

— তা হলো রক্ত।

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে নুনের প্রভাবে কী ঘটবে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো :

কী করা হলো	কী ঘটতে দেখবে	কেন এরকম হবে
(1) আলুর চিপস বানানোর সময় আলু পাতলা করে কেটে নুন মাখিয়ে রাখা হলো।		
(2) কোনো গাছের গোড়ায় বেশি নুন দেওয়া হলো।		
(3) সদ্য কাটা মাছ বা মাংসের টুকরোয় নুন মাখিয়ে রাখা হলো।		

তোমাদের বাড়িতে বা পরিচিত কারোর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ডাক্তারবাবু তাঁকে কী পরামর্শ দেন লক্ষ করো। দেখবে, তাঁকে কম নুন খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

তাহলে বেশি নুন খাওয়ার সঙ্গে আমাদের দেহের রক্তচাপের সম্পর্ক কেমন?

....।

তোমরা জেনেছ যে রক্তে একটা পরিমিত পরিমাণ নুন থাকেই। কিন্তু রক্তে নুনের পরিমাণ কোনো কারণে বেড়ে গেলে রক্ত কোশ কলা থেকে জল টেনে নেয়। ফলে রক্তের মধ্যে থাকা জলের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তখন রক্তের পরিমাণের কেমন পরিবর্তন হবে? ....।

তখন রক্তের স্বাভাবিক চাপের কেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। ....।

রক্তের চাপ যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, আমাদের শরীরে কী ঘটতে পারে তা জেনে নেওয়া যাক।

শরীরের কোথায়	কী ঘটতে পারে
শিরা-ধমনি	বেশি রক্তচাপে ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে পারে।
হৃৎপিণ্ডে	কপাটিকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
মস্তিষ্কে	মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে।

এবছর খুব গরম পড়েছে। তাই ঘামও হচ্ছে খুব। স্কুলে যাবার সময় অয়ন রোজ ঠাকুমাকে একবার বলে, তবে বাড়ি থেকে বেরোয়। আজ বেরোনোর সময় অয়ন লক্ষ করল- ঠাকুমা যেন তাকে চিনতেই পারছেন না।

অয়ন জিজ্ঞেস করল— ও ঠাকুমা, কী হলো?

ঠাকুমা একটা উত্তর দিলেন বটে; অয়ন তার কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু সে এটা বুঝল যে ঠাকুমার শরীরে কোথাও একটা বড়োসড়ো গোলমাল হয়েছে।

তারপর অয়নের মা ফোন করে ডাক্তারবাবুকে খবর দিলেন। ডাক্তারবাবু এসে মন দিয়ে দেখলেন ঠাকুমাকে। তারপর অয়নের মাকে একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা নুনজল তৈরি করে ঠাকুমাকে খাইয়ে দিতে বললেন। আর আশ্চর্য! একটু পরেই ঠাকুমা আবার আগের মতোই স্বাভাবিক।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অয়নের মা টিউবওয়েল পাম্প করছিলেন। অয়ন পড়তে বসে জানালা দিয়ে দেখছিল মায়ের জল ভরা। কিন্তু অয়ন দেখল- হঠাৎ মা পড়ে গেলেন। পরে ডাক্তার দেখাতে জানা গেল বাঁপায়ের নীচের দিকের হাড়টা ভেঙে গেছে।

এই দুটো ঘটনা থেকে অয়নের মতো তোমাদেরও নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে- কেন এমনটা হলো?

আমাদের শরীরের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম কী বলো তো?

— আমাদের স্নায়ু-ব্যবস্থা; যা পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে। স্নায়ুর কাজ কী?

— মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ড ও দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবেদন আদানপ্রদান করা। এই কাজে তার প্রধান সহায়ক কী?

— খাবার নুনে থাকা সোডিয়াম আয়ন (Na^+)। তবে পটাশিয়াম আয়ন (K^+) ও ক্যালশিয়াম আয়নও (Ca^{2+}) এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে আমাদের দেহে হঠাৎ কোনো কারণে নুনের পরিমাণ কমে গেলে আমাদের শরীরের কোন ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে?

....।

— এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে খিঁচুনি দেখা দেবে। কথাবার্তাও অসংলগ্ন হয়ে যেতে পারে।

খাবার নুনে থাকা NaCl ছাড়া আরো দুটো লবণের কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই দুটো লবণ দেহের মধ্যে সোডিয়াম ছাড়া কী কী ধাতব আয়ন উৎপন্ন করে?

.... ও .... আয়ন।

এদের মধ্যে ক্যালশিয়াম আমাদের শরীরে কী কাজ করে?

— মূলত দুটো কাজে ক্যালশিয়াম সাহায্য করে: (i) হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে, (ii) হৃৎপেশির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

হাড়ের গঠনে ক্যালসিয়াম কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা পরের পৃষ্ঠার কর্মপত্র পূরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

(a) আমাদের শরীরে হাড়ের ওজনই সবচেয়ে বেশি। এই হাড় বা অস্থির মূল উপাদান কোন ধাতু ?

.... ।

(b) শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম আমরা কোন কোন উৎস থেকে পাই ?

(i) প্রাণীজ উৎস থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্য; যেমন — দুধ, দই, ছোটো মাছের কাঁটা ইত্যাদি।

(ii) অন্য একটা উৎস হলো খাবার নুন।

জানো তো, আমাদের শরীরের মধ্যে যতটা ক্যালশিয়াম আছে তার শতকরা 99 ভাগই আছে হাড়ের মধ্যে। হাড়ে এই ক্যালশিয়ামকে জমা করার জন্য ভিটামিন D প্রয়োজন।

(c) আমাদের শরীরের হাড়ের ভেতরটা কেমন হতে পারে ?[(i) ও (ii)-এর প্রশ্ন থেকে সঠিক উত্তর বেছে নাও]

(i) (a) ফাঁপা (b) নিরেট, (ii) (a) শুকনো (b) জলীয় তরল ও রক্তে পরিপূর্ণ ।

(d) আবার ভাবো, রক্তে Ca^{2+} আয়নের ঘাটতি হয়েছে। তাহলে শরীরের যেখানে ক্যালশিয়ামের ভাণ্ডার রয়েছে, সেখান থেকেই শরীর তা নিয়ে ওই ঘাটতি পুষিয়ে নেবে।

আমাদের শরীরের বেশিরভাগ ক্যালশিয়াম কোথায় আছে ? .... ।

তাহলে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য শরীর কোথা থেকে তা নেবে ? ....।

(e) এই অবস্থায় শরীরের মধ্যে হাড়ের কী হবে ?

— হাড় দুর্বল হয়ে যাবে। কখনও ভেঙেও যেতে পারে।

শরীরে যদি ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হয়, তাহলে কী দাঁতের গঠনেও কোনো প্রভাব পড়বে না ? নিজেরাই ভেবে দেখো।

খাবার নুনের মধ্যে উপস্থিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাতব আয়ন অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়ামের কী কী ভূমিকা থাকতে পারে আমাদের শরীরে ? নীচের কর্মপত্রটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে পূরণ করো।

(a) আমাদের রক্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শ্বেতকণিকা। এই শ্বেতকণিকার কাজ কী ?

.... ।

(b) শরীরে ভিটামিন D কী কাজ করে ? ....।

(c) শরীরে উপস্থিত বিভিন্ন উৎসেচক কী কাজ করে ? ....।

(d) শরীরের মধ্যে গ্লুকোজ কীভাবে শক্তি উৎপন্ন করে ? ....।

এই প্রক্রিয়াগুলোর অনেকগুলোতেই ম্যাগনেশিয়াম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ও তার কার্যকারিতা বাড়ায়।

জেনে রাখো: দূষণমুক্ত সমুদ্র উৎস থেকে বিশেষভাবে একধরনের নুন তৈরি করা হয় যাকে Organic Sea Salt বলে। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ম্যাগনেশিয়াম উপস্থিত থাকে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ—অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষ যে এত বুদ্ধিমান, তার একটা কারণ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন। অন্য কারণটা হলো খাদ্যের মাধ্যমে নুন গ্রহণ করা। এই নুনের চাহিদা মেটানোর জন্যই অভয়ারণ্যের 'সল্ট লিক' -এ পশুদের নুন খেতে দেওয়া হয়। যে কোনো প্রাণীর শরীরে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে তাদের দেহে নুনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে আমরা খাবার জন্য যে প্যাকেটের নুন ব্যবহার করি তার প্যাকেটের গায়ে লক্ষ করলে তোমরা দেখতে পাবে ওই নুনের মধ্যে একটা বিশেষ মৌল যুক্ত আছে। সেই মৌলটা হলো আয়োডিন।

আয়োডিনের জোগান দিতে নুনে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) মেশানো হয়।

আমাদের শরীরে আয়োডিনযুক্ত নুন প্রয়োজন কেন?

সুমনের কাকিমা কিছুদিন আগেও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। এখন তার থেকে অনেক দেরি করে উঠছেন। বাড়ির বিভিন্ন কাজ করার সময়ও কাকিমার ক্লান্তি ফুটে উঠছে।

একদিন তো কাপে করে কাকুকে চা দিতে গিয়ে কীভাবে যেন কাপটা পড়েই গেল কাকিমার হাত থেকে। যখন তখন সর্দিতে ভুগছেন কাকিমা; মাঝে মাঝেই মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন; খিটখিটেও হয়ে গেছেন একটু।

কাকিমা নিজেও বলছেন— শরীরটা যেন আর চলছেই না। কিছুই খাচ্ছি না, তাও যেন মোটা হয়ে যাচ্ছি।

সুমন দেখল যে কাকিমার গলার আওয়াজটাও একটু ধরা-ধরা। গলার কাছটা যেন একটু মোটাও মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখাতে তিনি বলেছেন— সুমনের কাকিমার থাইরয়েডের সমস্যা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো 'থাইরয়েড' কী?

তোমার হাতের দুটো আঙুলের স্পর্শে গলায় স্বরযন্ত্রের উপস্থিতি বুঝতে পারবে। এই স্বরযন্ত্রের ওপর দু-পাশে ছোটো একটা গ্রন্থি আছে, যাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বলে।

এই গ্রন্থির কার্যকারিতা আয়োডিনের ওপর নির্ভরশীল। **শরীরে আয়োডিন কম হলে এই থাইরয়েড গ্রন্থির কী পরিবর্তন হয়?**

তখন **বেশি কাজ করে কার্যকারিতা বজায় রাখতে গিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি বড়ো হয়ে যায়। তখন গলা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়; একেই 'গয়টার' বা গলগণ্ড বলা হয়।**

থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা কমে গিয়ে মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত হতে পারে।

আর কী কী ভাবে আয়োডিন আমাদের শরীরে কাজ করে?

মস্তিষ্কের বিকাশে আয়োডিন সাহায্য করে, তাই শিশুদের পক্ষে এটি অপরিহার্য।

তাছাড়াও শারীরিক-মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে আয়োডিনের অভাবে।

জেনে রাখো: আয়োডিন ব্যবহারের একটা ইতিহাস আছে আমাদের দেশে। অনেক আগে আয়োডিন ছাড়া নুনই ব্যবহার হতো খাবার জন্য। বিংশ শতকে পঞ্চাশের দশকে প্রফেসার ভি. রামলিঙ্গস্বামীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় 'গয়টার' রোগের কারণ হিসাবে দেহে আয়োডিনের ঘাটতিকে চিহ্নিত করেন। এর ফলে 1962 সাল থেকেই ভারত সরকার 'গয়টার' প্রাদুর্ভূত এলাকায় আয়োডিনযুক্ত নুন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। WHO ও UNICEF-এর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োডিনযুক্ত নুন তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 1983 সালে ভারতের জনসংখ্যা অনুপাতে এর উৎপাদন যথেষ্ট হয়।

সাধারণত সমতলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যার প্রকোপ বেশি।

আমরা যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে দেহের মধ্যে লবণ গ্রহণ করছি, তেমনই শরীর থেকে অতিরিক্ত লবণের রেচনও ঘটছে।
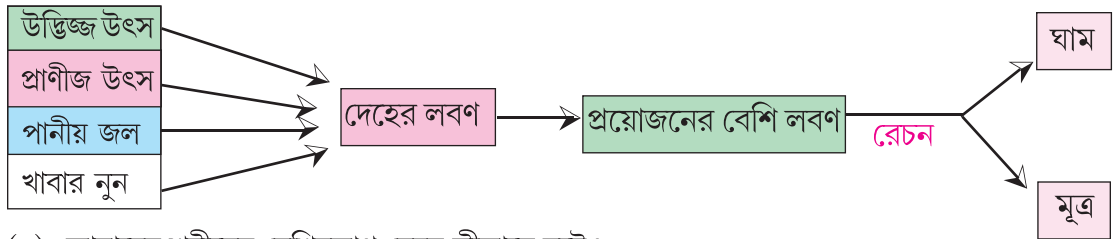
(a) আমাদের শরীরের বেশিরভাগ রেচন কীভাবে ঘটে?

.... এর মাধ্যমে ঘটে, যার বেশিরভাগই জল।

(b) জল যেহেতু নুনকে দ্রবীভূত করে রাখে, তাই আমাদের প্রধান রেচন পদার্থ............................... এর মধ্যে অনেকটা .... ও উপস্থিত থাকে।

(c) রেচনক্রিয়ায় দেহের ভেতরের মূলত কোন রেচন অঙ্গ কাজ করে? — বৃক্ক (কিডনি)।

(d) যদি কোনো কারণে রক্তে নুনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে কী হবে?

দেহের প্রয়োজনের থেকে আরো বেশি এই লবণের রেচনের প্রয়োজন, তাহলে আমাদের প্রধান রেচন পদার্থের পরিমাণের কেমন পরিবর্তন ঘটবে? — মূত্রের পরিমাণ বাড়বে/কমবে (ঠিক উত্তরটি বেছে নাও)।

তখন আমাদের প্রধান রেচন অঙ্গকে বেশি কাজ করতে হবে।

(e) এখন ভাবো, কারো বৃক্কের কার্যকারিতা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন তাঁকে কী পরামর্শ দেওয়া হবে? .... ।

দীর্ঘদিন লিভারের রোগে ভুগলেও একই পরামর্শ দেওয়া হয়।

খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে নুন ব্যবহার হতে দেখো তোমরা?

তোমাদের বাড়িতে মা-ঠাকুমাকে আমের বা অন্য জিনিসের আচার বানাতে দেখেছ। তাঁদের কাছে একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে তার একটা প্রধান উপাদান হলো নুন।

বেশিরভাগ সময়েই আমের টুকরো (বা, অন্য জিনিসেও) নুন মাখিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। এটা করা হয় দুটো কারণে—

i) যাতে আমের টুকরোর বেশিরভাগ জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়।

ii) বাতাসে ভেসে থাকা জীবাণুর থেকে ওই জিনিসটা বেশিদিন ভালো থাকে।

কীভাবে কাজ করে নুন? নুনের সংস্পর্শে আসা জীবাণুর কোশতরল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণু মরে যায়। তাই খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই পদ্ধতি চালু রয়েছে।

সংরক্ষক হিসাবে নুন ব্যবহার করা হচ্ছে, এরকম আরো উদাহরণ দাও:

(a)

(b)

(c)

সমুদ্র, পর্বত বা মেরু অভিযানের ক্ষেত্রে অভিযাত্রীরা যে সংরক্ষিত বা টিনবন্দি খাবার নিয়ে যান তা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় নুন তাঁরা পেয়ে যান।

জেনে রাখো: এখনকার প্রচলিত শব্দ Salary (মাহিনা) এসেছে Salt থেকে; প্রাচীন রোমের সেনাবাহিনীর অফিসারদের নুন কেনার জন্যে যে অর্থ দেওয়া হতো তখন তাকে বলা হতো 'Salarium'। এর থেকেই Salary শব্দের উৎপত্তি।

তাহলে ভাবো, একসময়ে খাদ্যলবণ এত সহজলভ্য বস্তু ছিল না নিশ্চয়ই। মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এর অভাব অনুভব করেছে; আর তাকে সহজলভ্য করেছে। নুন নিয়ে আমাদের দেশসহ বহু দেশেই অনেক প্রবাদ প্রচলিত। সেগুলো জানার চেষ্টা করো।

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে কীভাবে লবণের ব্যবহার করা যেতে পারে তা লেখো।

কোন ক্ষেত্রে	কীভাবে খাদ্যলবণ কাজে লাগবে
1. তোমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে	
2. হঠাৎ একদিন তোমার ঘনঘন বমি ও ডায়ারিয়া হলো	তোমাকে কিছু সময় অন্তর অল্প করে নুন ও সামান্য চিনি মেশানো জল খেতে হবে
3. তোমার গলায় ব্যথা হলো	
4. তোমার পায়ে জোঁক কামড়ে ধরল	
5. তোমাকে পাকা তেঁতুল সংরক্ষণ করতে বলা হলো	
6. কারোর রক্তচাপ কমার লক্ষণ দেখা দিলে	

সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব

তোমরা প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের একটা তালিকা বানাও। তাদের উৎস প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত না মানুষের সৃষ্টি তা উল্লেখ করো :

রোজকার ব্যবহার্য জিনিসের নাম	কীভাবে তৈরি		
	প্রাকৃতিক	প্রক্রিয়াজাত	মানুষের সৃষ্টি
মাজন বা টুথপেস্ট			
পাউডার			
সাবান			
শ্যাম্পু			
ডিটারজেন্ট			
রিঠা ফল			
মশারির সুতো			
নারকেল তেল			

তোমাদের তৈরি ওপরের তালিকা থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা প্রতিদিন যেসমস্ত জিনিস ব্যবহার করি তার কিছু প্রাকৃতিক হলেও বেশিরভাগ জিনিসই কৃত্রিমভাবে **সংশ্লেষিত** পদার্থ থেকে তৈরি। এগুলো যেমন আমাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে, তেমনি এদের অনেক কুপ্রভাবও আছে যা আমরা পরে জানব।

তোমরা সকলেই খেলতে ভালোবাসো। ধরো তুমি ফুটবল খেলো। ফুটবল খেলতে যে জিনিসগুলো লাগে তার একটা তালিকা বানাও; আর এসো দেখি তার কোনটা কী জিনিস দিয়ে তৈরি।

কোন জিনিস	কী দিয়ে তৈরি	ব্যবহার বন্ধ হওয়ার পর জিনিসগুলোর কী হয়

তোমাদের স্কুলে বা পাড়ায় মাঝে মাঝে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে যে জিনিসগুলো লাগে তাদের ছবি নীচে দেওয়া হলো। ছবি দেখে তাদের নাম লেখো এবং আলোচনা করে লেখো সেগুলো কীসের তৈরি আর তাদের উৎস প্রাকৃতিক না সংশ্লেষিত?
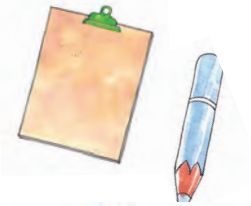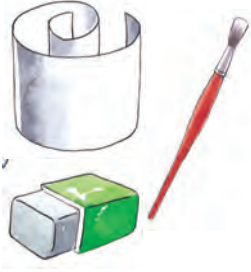
কী জিনিস	কীসের তৈরি বলে মনে হয়	উৎস		
		প্রাকৃতিক	প্রক্রিয়াজাত	সংশ্লেষিত
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

ওপরের ছক তিনটে দেখে একটা বিষয় স্পষ্ট যে আমাদের চারপাশের যে সমস্ত জিনিসের নাম আমরা বলছি বা দেখছি বা ব্যবহার করছি তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক জিনিসেরই উৎস প্রাকৃতিক; তাদের অধিকাংশই সংশ্লেষিত পদার্থ থেকে তৈরি। নীচের ছবিটা লক্ষ করে দেখো, আমরা কীভাবে প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ধরনের পদার্থ ব্যবহার করছি।

সংশ্লেষিত পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস
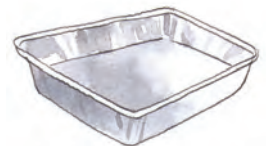
1. ওপরের ছবিতে যেসব বস্তুর ছবি দেওয়া আছে তা তৈরিতে যে যে সংশ্লেষিত পদার্থের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি কী কী?

...................., ..., ..., ..., ...।

2. ওই ধরনের সংশ্লেষিত পদার্থ আর কী কী জিনিস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?

সংশ্লেষিত পদার্থটির নাম	তার ব্যবহার
প্লাস্টিক	

3. যে সমস্ত সংশ্লেষিত পদার্থগুলোর নাম তোমরা জানলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের আর কোনো ব্যবহার জানা থাকলে লেখো।

..........., ..., ..., ...।

একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতেই পারে যে কেন আমরা এতসব ধরনের সংশ্লেষিত পদার্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। প্রাকৃতিক জিনিসের থেকে এই সমস্ত মানুষের সৃষ্টি করা জিনিসগুলোর কার্যকারিতা বেশি। তাই এদের ব্যবহারও বেশি। ওপরের তালিকায় যতরকম সংশ্লেষিত পদার্থের ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের মধ্যে প্লাস্টিক, পলিথিন, কৃত্রিমভাবে তৈরি সুতো - এরকম অনেকগুলোকেই পলিমার বলা হয়।

এখন দেখা যাক, পলিমারজাতীয় পদার্থগুলো কেমনভাবে তৈরি হয়।

পলিমার

তোমরা সকলেই ফুলের তৈরি মালা দেখেছ। এটা কীভাবে তৈরি করা হয়? অনেকগুলো একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের ফুল একসঙ্গে একটা সুতো দিয়ে গাঁথা। একটা লোকাল ট্রেনে অনেকগুলো একরকম কামরা জোড়া থাকে। ঠিক এইভাবেই **অনেক ছোটো ছোটো যৌগ অণু জুড়ে তৈরি হয় বৃহৎশৃঙ্খল যৌগ বা পলিমার**। **পলিথিন** পলিমারটি অনেক ইথিলিন (C_2H_4) অণু জুড়ে তৈরি হয়।
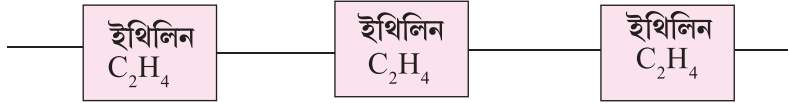
$(C_2H_4)_n$

$(C_2H_4)_n$ হলো পলিইথিলিন বা পলিথিন। এখানে n দিয়ে বহু সংখ্যক ইথিলিন অণু বোঝানো হয়েছে।

জানো কি?—‘পলিমার’ শব্দটার উৎপত্তি দুটো গ্রিক শব্দ পলি (poly) ও মেরোস (meros) থেকে। ‘পলি’ মানে বহু, আর ‘মেরোস’ কথার অর্থ অংশ বা খণ্ড (parts)।

এছাড়াও আমরা যে চিউইং গাম খাই এবং আঠা বা অ্যাডহেসিভ জাতীয় যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করি সেগুলোও বিভিন্ন নরম পলিমার দিয়ে তৈরি। আবার কৃত্রিমভাবে তৈরি সুতোগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই পলিমার জাতীয় পদার্থ।

সংশ্লেষিত তন্তু

অনেকদিন থেকেই জামাকাপড় তৈরিতে সুতির সুতো ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সেগুলো কম টেকসই আর তার সৌন্দর্য বজায় রাখা ছিল কঠিন। যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসাবে এল পলিএস্টার, রেয়ন, অ্যাক্রাইলিক ইত্যাদি। তারপর সুতির সুতোর সঙ্গে এগুলো মিশিয়ে নতুন ধরনের সুতো তৈরি হতে লাগল।

করে দেখো : কোনটা শক্ত, একটা সুতির সুতো, না একটা টেরিকটের সুতো? দুটো একই মাপের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের খালি ও মুখ খোলা বোতল নাও। এবার দু-রকম সুতোর সাহায্যে দুটো বোতল ঝোলাবার ব্যবস্থা করো। এরপর দুটো বোতলেই ধীরে ধীরে জল ঢালতে থাকো। কী করলে ও কী দেখলে লেখো।

কী করা হলো	কী বোঝা গেল

প্রাকৃতিক পলিমার : নানান ধরনের **শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) জাতীয় পলিমার দিয়ে উদ্ভিদদেহে সুতো বা আঁশ তৈরি হয়। আবার প্রাণীদেহের মাংসপেশি, লিগামেন্ট বা টেনডন তৈরি হয় প্রোটিনজাতীয় পলিমার দিয়ে।**

করে দেখো :- মোমবাতির আগুনের কাছে সাবধানে কিছুটা সুতির সুতো ও কিছুটা নাইলন সুতো একটি চিমটে দিয়ে ধরে দেখো।

কী দেখলে	কী বোঝা গেল

তাহলে রান্না করা বা বাজি পোড়ানোর সময় আমরা কেমন জামাকাপড় পরব?

— সিন্থেটিক সুতোর তৈরি জামাকাপড় আগুনের গরমে গলে গিয়ে চামড়ায় আটকে যেতে পারে। তাই ওই সময় সুতির জামাকাপড় পরাই উচিত।

আমরা রোজই অনেকরকমের প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহার করি। কিন্তু সব প্লাস্টিকই কি একই ধরনের?

লক্ষ করলে দেখবে বিভিন্ন জিনিসে ব্যবহৃত প্লাস্টিক প্রধানত দু-ধরনের।

(i) একধরনের প্লাস্টিক নরম; তাদের আকৃতি তাপ দিয়ে (বা অন্যভাবে) পালটানো যায়। তাদের গলানো যায়, বাঁকানো যায়। তাই এধরনের প্লাস্টিককে থার্মোপ্লাস্টিক বলা হয়।

(ii) অন্য আর একধরনের প্লাস্টিক একবার শক্ত হয়ে গেলে তাপ দিয়েও তাদের আকৃতি আর পালটানো যায় না। তাই এধরনের প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলা হয়।

নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসে পলিমারের ব্যবহার

পলিমারের নাম	প্রকৃতি বা গুণাবলি	ব্যবহার
পলিথিন	অত্যন্ত নমনীয় ও জলরোধক	
PVC	মজবুত, তাপ ও তড়িতের অন্তরক, জলরোধক, থার্মোপ্লাস্টিক	
PET	দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত, থার্মোসেটিং প্লাস্টিক	জলের বা পানীয় দ্রব্যের বোতল,খাবারের বাক্স তৈরিতে।

সাবান ও ডিটারজেন্ট

তোমাদের বাড়িতে গায়ে মাখার জন্য, জামাকাপড় পরিষ্কার করতে বা নীচে লেখা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয় এমন কোনো সংশ্লেষিত পদার্থের কথা জানা থাকলে লেখো।

কোন কাজে	কী ব্যবহার করো
গা, হাত, পা ধোয়ার কাজে	
চুল পরিষ্কার করার জন্য	
বাসনপত্র মাজার জন্য	

এখানে যে পদার্থগুলোর নাম দেখা গেল তাদের বেশিরভাগই সাবান বা ডিটারজেন্ট শ্রেণির। তোমরা জানো কি যে ডিটারজেন্ট দিয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা হয়, দাঁত মাজার পেস্ট বা চুল পরিষ্কার করার শ্যাম্পুতেও একইরকম কিছু পদার্থ থাকে।

সাবান হলো কিছু জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম যৌগ, যা তৈরি হয় চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক ক্ষারের (NaOH বা KOH) বিক্রিয়ায়।

চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল + কস্টিক ক্ষার → সাবান + গ্লিসারিন।

পেট্রোলিয়াম বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগের সঙ্গে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যাসিডের জলে দ্রাব্য যৌগ হলো ডিটারজেন্ট। বাজারের ডিটারজেন্ট বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণ।

যেসব উৎস থেকে পাওয়া জল আমরা সাধারণত জামাকাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করি সেগুলো নীচে দেওয়া হলো। বাড়ির বড়োদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করো এগুলোর মধ্যে কোন কোন উৎসের জল ব্যবহার করে কোন ক্ষেত্রে কীরকম ফেনা তৈরি হয়; তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

জলের উৎস	সাবান ব্যবহারে কেমন ফেনা হয়	ডিটারজেন্ট ব্যবহারে কেমন ফেনা হয়
পুকুরের/দিঘির জল		
কুয়োর জল		
নলকূপের জল		
নদীর জল		
শহরের কলের জল		

এখন বুঝতে পারছ সাবান না ডিটারজেন্ট কোনটায় জামাকাপড় বেশি ভালো পরিষ্কার হয়?

সাবান সবরকম উৎসের জলে সমানভাবে কার্যকরী হয় না, কিন্তু ডিটারজেন্ট যে-কোনো জলেই সমান কার্যকর। তাইতো আমাদের চারদিকে ডিটারজেন্টের এত ব্যাপক ব্যবহার।

সার ও কীটনাশক

দলগত কাজ: তোমাদের স্কুলের বা বাড়ির আশেপাশের চাষের ক্ষেতে অথবা কোনো নার্সারিতে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখো ও জানো সার ও কীটনাশক কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যে জিনিসগুলোর ব্যবহার তোমরা জানলে, আরও বিস্তারিতভাবে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

কী চাষ করতে	কী ব্যবহার হচ্ছে	কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে	পদার্থটার উৎস প্রাকৃতিক না কৃত্রিমভাবে তৈরি
ধান			
শাকসবজি			
ফুল			

ওপরের সারণি থেকে তোমরা মূলত দু-ধরনের জিনিসের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছ; যার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক নয়, সংশ্লেষিত।

গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ানোর জন্য যা ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কী? ....।

গাছকে রোগ বা পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যা ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কী? ....।

তোমাদের পরিচিত কয়েকটি সার ও কীটনাশকের মধ্যে থাকা সংশ্লেষিত পদার্থের নাম দেওয়া হলো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে আরও কয়েকটি নাম যোগ করো।

সারের নাম	কীটনাশকের নাম
ইউরিয়া	মিথাইল প্যারাথিয়ন
	অলড্রিন
	কার্বারিল

টুকরো কথা : তোমরা র‍্যাচেল কারসনের লেখা Silent Spring বইটার কথা হয়তো শুনে থাকবে। এই বইতে তিনি প্রথম ডি.ডি.টি কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে সচেতন করেন। দেখা গেছে, পাখি বা কচ্ছপের দেহে এই কীটনাশকের প্রভাবে ডিমের খোলা পাতলা হয়ে যায়। বাচ্চা বেরোবার জন্য পেটের নীচে ডিম রেখে তা দিতে গেলেই ডিম ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। পোকামাকড় মারতে এরকম কীটনাশকের ব্যবহারের জন্য আজ মৌমাছি, রেশমপোকা, নানা পাখির বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আগামী দিনের বসন্তকাল তাই পাখির কাকলিহীন হয়ে যাবে—এমনই বলতে চেয়েছেন শ্রীমতি কারসন। আর খাদ্যের মধ্যে দিয়ে কীটনাশক মানুষের দেহে ঢুকে নানা অজানা রোগের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলছে। পৃথিবীর বহু দেশেই ডি.ডি.টি নিষিদ্ধ কীটনাশক।

প্রসাধনী, সুগন্ধি দ্রব্য

তোমাদের পরিচিত কিছু জিনিসের ছবি নীচে দেওয়া আছে। দেখো তো চিনতে পারো কিনা। তাদের ব্যবহার লেখো।

a b c d e f g h

কী জিনিস	কী কাজে লাগে
a.	
b. শ্যাম্পু	
c.	
d. টুথপেস্ট	
e. বডি স্প্রে	
f. পাউডার	
g.	
h.	

তোমরা এতরকম প্রসাধনীর ব্যবহার দেখছ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো তোমাদের পরিচিত কারোর ত্বকে বা দেহের অন্য অংশে এই সমস্ত জিনিসের কোনো কুপ্রভাব পড়েছে কিনা :

কোন ধরনের প্রসাধনীতে	কীরকম কুপ্রভাব পড়তে পারে
চুল রং করার কলপ বা ডাই	চুলকানি ও লাল হয়ে ফুলে ওঠা
সুগন্ধি স্প্রে	শ্বাসের সমস্যা

এরকম কেন হয় বলো তো?

প্রসাধনীতে এমন অনেকরকম সংশ্লেষিত পদার্থ মেশানো হয় যেগুলোর প্রভাবেই এই সমস্যা ঘটে। তাই এরকম সমস্যা যাঁদের হয় তাঁদের এই সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলাই উচিত।

ওষুধ

নীচের তালিকা থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে ছকটির প্রথম দুটো স্তম্ভ পূরণ করো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও বড়োদের বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে তৃতীয় স্তম্ভটি পূরণ করো।

কোন ধরনের অসুখে	সাধারণত ডাক্তারবাবু কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করতে বলেন	এর পরিবর্তে আগেকার সময়ে কী ধরনের ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করা হতো
জ্বর	জ্বরনাশক	
ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণে পেটখারাপ হলে	অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক	
অম্বল বা অ্যাসিডিটি	অ্যান্টাসিড	
ছড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া	অ্যান্টিসেপটিক	গাঁদা গাছের পাতার রস বা দূর্বার রস
চোট লেগে ব্যথা হলে	পেনকিলার বা বেদনানাশক	

ওষুধ হিসাবে আমরা যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করছি তার প্রায় সবই সংশ্লেষিত যৌগ। অথচ একটা সময় ছিল, যখন মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শারীরিক অসুস্থতা নিরাময়ে ব্যবহৃত হতো প্রাকৃতিক বা ভেষজ ওষুধ। আমাদের চারপাশেই সেই সমস্ত উপাদান ছড়িয়ে আছে। শুধু প্রয়োজন তা প্রয়োগ করার উপযুক্ত জ্ঞানের।

তোমার বাড়ির পোষা কুকুর-বিড়ালকে কখনও ঘাস খেতে দেখেছ?

এভাবে একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে আমাদের চারপাশের মনুষ্যেতর জীব কীভাবে প্রাকৃতিক বা ভেষজ উপায়ে নিজেদের সুস্থ রাখে। কেবল আমরা, মানুষরা শুধুমাত্র প্রকৃতির ওপর এব্যাপারে নির্ভরশীল থাকতে পারিনি। তার প্রধান কারণ কী কী হতে পারে?

একটা কারণ যদি হয় আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, তবে অন্য কারণগুলো হলো মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও পুরোনো ওষুধের বিরুদ্ধে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রতিরোধ গড়ে ওঠা। তাই আরও নতুন নতুন ওষুধ তৈরি করার প্রয়োজন হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানা গবেষণার ফলাফলকে শুধু মানুষই ব্যবহার করতে পারে।

একটা বিষয়ে লক্ষ করেছ কি, যে সমস্ত মোড়কের মধ্যে ওষুধ থাকে সেগুলো আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তারপর সেগুলোর কী হয়? নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

রং ও রঞ্জক

আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের দর্শনেন্দ্রিয় শুধুমাত্র সাদা-কালো ছবি বা বস্তু দেখার জন্যই তৈরি। কিন্তু আমরা, মানুষরা রঙিন জিনিস দেখতে অভ্যস্ত। তোমাদের চারপাশে যে সমস্ত রঙিন জৈব-অজৈব জিনিস দেখতে পাচ্ছ তার একটা তালিকা তৈরি করো। আর শিক্ষক/শিক্ষিকার সহায়তায় তাদের রঙের উৎস সন্ধান করো :

কী জিনিস	তার রঙের উৎস
গাজর	জৈব
হলুদ	
গাঁদা বা গোলাপ ফুলের পাপড়ি	
রঙিন প্লাস্টিকের বালতি	

তোমাকে বাড়ির দেয়াল, দরজা-জানালা অথবা লোহার আলমারি রং করতে বলা হলো। কোন ক্ষেত্রে তুমি জলে গোলা রং বা তেলে গোলা রং ব্যবহার করবে?

কোন ক্ষেত্রে	কেমন রং ব্যবহার করবে
দেয়াল	জলে গোলা রং
দরজা-জানালা	তেলে গোলা রং
লোহার আলমারি	তেলে গোলা রং

এরকম রং ব্যবহার করার আগে কী কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

....।

প্রায় কোনো রং-ই কৌটো খুলেই সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কারণ, এখনকার ব্যবহৃত বেশিরভাগ রং-এর দুটো অংশ আলাদা হয়ে থাকে। তাদের মেশানোর দরকার হয়। রং-এর মধ্যে এই দুটো অংশ কী কী?

— (i) দ্রাবক অংশ (যা সাধারণত বর্ণহীন বা হালকা রঙিন),

(ii) রঞ্জক বা পিগমেন্ট অংশ (রঙিন যৌগের কণা)।

বেশিরভাগ রং-এরই এই দুটো অংশই কৃত্রিমভাবে তৈরি।

জানো কি? অনেক আগে জামাকাপড় রং করার নীল (Indigo) পাওয়া যেত নীলের গাছ থেকে। এখন রাসায়নিক কারখানাতেই এই রঞ্জক তৈরি করা যায়। একসময় বিদেশী নীলকররা আমাদের দেশের চাষিদের ধান চাষ করতে না দিয়ে তাদের জমিতে নীলের গাছ চাষ করতে বাধ্য করত। চাষিরা রাজি না হলে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হতো। নিরুপায় চাষিরা শেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই হলো উনবিংশ শতকের নীল বিদ্রোহের ইতিহাস।

আমাদের ব্যবহার করা পেনের কালি বা ছাপার কালিও এধরনের একাধিক রঞ্জকের মিশ্রণে তৈরি।

করে দেখো: একটা ফিলটার কাগজে একফোঁটা জেলপেনের কালি দাও। একটা প্লাস্টিকের ছোটো স্কেলের গায়ে কাগজটা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়ে ছবির মতো জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পরে তুমি কি দেখতে পেলে তা লেখো (ভালো ফল পেতে জলের মধ্যে একটু স্পিরিট দিতে পারো)।

কী করলে	কী দেখতে পেলে

সিমেন্ট

আধুনিক নির্মাণশিল্পের একটি প্রধান উপাদান হলো সিমেন্ট। আমাদের চারপাশে সিমেন্টের বহু জিনিসই আমরা দেখতে পাই। নীচের তালিকায় তোমাদের জানা আরো জিনিসের নাম লেখো, যেগুলোর একটা উপাদান সিমেন্ট।

কী কী জিনিস তৈরিতে সিমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে	সিমেন্টের সঙ্গে আরো কীকী জিনিস কাজে লেগেছে বলে মনে হয়
বাড়ি	ইট, বালি, লোহার রড, পাথরকুচি

সিমেন্টের এত ব্যাপক ব্যবহারের কারণ কী জানো? সিমেন্ট সহজলভ্য, তার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও সর্বোপরি সিমেন্টের জিনিসের স্থায়িত্ব বেশি।

সিমেন্ট কি কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থ?

সিমেন্টের মধ্যে বেশ কিছু ধাতুর যেমন ক্যালশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রনের অক্সাইড ও সিলিকেট জাতীয় যৌগ মেশানো থাকে। এর উপাদানগুলোর কিছু খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া, যেমন জিপসাম চূর্ণ বা চুনাপাথর থেকে পাওয়া ক্যালশিয়াম অক্সাইড। আবার কিছু কৃত্রিমভাবে তৈরি। তোমরা দেখেছ রাজমিস্ত্রিরা যখন সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন তখন বালি আর সিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে তাতে জল মেশান।

তুমি যদি সিমেন্ট, বালি আর জল মিশিয়ে একটা দলা পাকিয়ে এক রাত্রি রেখে দাও কী দেখতে পাবে? — পুরোটাই জমাট বেঁধে যাবে।

আবার দেখে থাকবে সিমেন্ট -বালি দিয়ে ইট গাঁথা বা ঢালাই করার পর তাতে বেশ কয়েকদিন জল দেওয়া হয়। জলের সংস্পর্শে সিমেন্টের মধ্যে থাকা ক্যালসিয়াম অক্সাইড, হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন সিলিকেট যৌগের সঙ্গে জল যুক্ত হয়। এইসব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে তাপ উৎপন্ন হয় বলে সিমেন্ট ফেটে যায়। তাই ঢালাইয়ের পরদিন থেকেই তার গায়ে জল দেওয়া হয়।

তোমাদের চারপাশের চেনাজানা বহু জিনিসেরই আগে যা উপাদান ছিল তা পালটে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজেরা আলোচনা করে উদাহরণগুলো লেখো :

কী জিনিস তৈরিতে	আগে কী ব্যবহার হতো	এখন কী ব্যবহার হচ্ছে
গোরুর খড় খাবার গামলা	পোড়া মাটি	
বাড়ি		

কাচ

কর্মপত্র

i) তোমাদের চারপাশে দেখা কাচ ব্যবহার হচ্ছে এমন কয়েকটা জিনিসের উদাহরণ দাও—

.... ।

ii) এই জিনিসগুলো কী কী কাজে লাগে তা লেখো।

.... ।

iii) এই জিনিসগুলোয় কাচ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা যেত কি? তোমার মতামত লেখো।

.... ।

এই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাচ আসলে কি জানো? এটা একটা মিশ্রণ, যা মূলত চুনাপাথর, সোডাভস্ম ও বালি (সিলিকা) থেকে তৈরি করা হয়। রং করার জন্য কাচে বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড মেশানো হয় যাদের সবই কৃত্রিমভাবে তৈরি ।

কাচের কোন রং-এর জন্য	কোন যৌগ কাচে মেশানো হয়
হলুদ	আয়রন অক্সাইড
নীল	কোবাল্ট অক্সাইড
সবুজ	ক্রোমিয়াম অক্সাইড

জানো কি? — রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান - বিজ্ঞানের এইসব শাখা কাচের তৈরি নানান যন্ত্রপাতি ছাড়া এগোতেই পারতনা। কাচ সভ্যতাকে বহু দূর এগিয়ে দিয়েছে। কাচের তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। প্লাস্টিকে মোড়া কাচের তন্তু ফাইবারগ্লাসরূপে মূর্তি ও বিভিন্ন ঢালাই করা দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিবেশে সংশ্লেষিত যৌগের প্রভাব

আজ থেকে প্রায় 25-30 বছর আগেও কলকাতা শহরের যত জঞ্জাল ফেলা হতো ধাপার মাঠে। কোন কোন জিনিস তখন ফেলা হতো তার কয়েকটা জিনিসের নাম পরের পাতার তালিকায় দেওয়া হলো। এখনও ধাপার মাঠ যে এলাকায় ছিল, সেখানে কোনো জায়গা খুঁড়লে মাটির নীচ থেকে সেগুলোর কী কী এখনও পাওয়া যাবে আর কোনগুলো যাবে না তা নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

ফেলা জিনিসের তালিকা: ছেঁড়া পলিথিন, চটের ব্যাগ, প্লাস্টিকের ভাঙা খেলনা, ছেঁড়া হাওয়াই চটি, আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, ছেঁড়া জামাকাপড়, আখের ছিবড়ে, ডাবের খোলা, কাচের ভাঙা শিশি, ওষুধের মোড়ক, নাইলন দড়ি, লোহার পেরেক, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, পলিথিনের বোতল, পেনসিলের ছোটো টুকরো, বাতিল টিভি, মরা জীবজন্তু ইত্যাদি।

এখন আর কোন কোন জিনিস পাওয়া যাবে না	কোন কোন জিনিস এখনও পাওয়া যাবে	আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরেও কোন কোন জিনিস পাওয়া যাবে

যে জিনিসগুলো এখন আর পাওয়া যাবে না, সেগুলোর কী হলো?

....।

আর যেগুলো পঞ্চাশ বছর পরেও পাওয়া যাবে তাদের কী হবে?

....।

যেগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় তারা **জৈব ভঙ্গুর(বায়োডিগ্রেডেবল)**, আর যারা হয় না তারা **জৈব অভঙ্গুর(নন-বায়োডিগ্রেডেবল)**। এই দুই ধরনের পদার্থ তাদের গঠন, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জীবদেহ সম্পূর্ণভাবে জৈব ভঙ্গুর, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট সংশ্লেষিত পলিমারগুলোর অধিকাংশই জৈব অভঙ্গুর।

করে দেখো: নন-বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থগুলোর ব্যবহার কেন কমাতে হবে তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে একটা পোস্টার তৈরি করো।

তোমাদের স্কুলের বা বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখো এমন কোনো পদার্থ দেখতে বা তাদের কথা জানতে পারো কিনা যেগুলো দীর্ঘদিন পরিবেশে থেকে যাচ্ছে ও কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও):

কী পদার্থ পড়ে থাকছে	পরিবেশে তার কী প্রভাব পড়ছে

তোমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ কীভাবে চারদিকে পলিমারের তৈরি জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে; তারা যেমন জলের গতিপ্রবাহ বা কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট করছে তেমনি তাদের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন উৎসের জলের বর্ণ বা গন্ধের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক কী শুধু প্রয়োগের স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে? — তা নয়, সেখান থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে জল ও বাতাসের দ্বারা। এগুলো কীভাবে ক্ষতি করতে পারে? শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

কোন সংশ্লেষিত পদার্থ	কোন জীবের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে	কী ক্ষতি ঘটবে
ডিডিটি, মিথাইল প্যারাথায়ন, পেন্টাক্লোরোফেনল	বিশেষ কিছু সিম জাতীয় গাছের মূলে থাকা রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া	
অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর	তৃণভোজী প্রাণী (প্রথম শ্রেণির খাদক)	

পরীক্ষা করলে প্রায় প্রত্যেক মানুষের দেহেই কিছু পরিমাণ কীটনাশক পাওয়া যাবে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে, কারণ তাদের অনাক্রম্যতা কম ও বৃদ্ধির হার বেশি।

আমাদের চারপাশে আর শকুন দেখতে পাও কি? পাও না কেন জানত? চাষের কাজে অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও গবাদি পশুর রোগনিরাময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ডাইক্লোফেনাক নামক বেদনানাশকের ব্যবহার এর একটা কারণ। এই পশুদের মৃত্যুর পর তা পরবর্তী পর্যায়ের খাদক শকুনের মধ্যে গিয়ে তাদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে।

ভেবে দেখো : মানুষ যখন প্রথম জাল দিয়ে মাছ ধরা শিখল, তখন কীসের তৈরি জাল ছিল? আর এখন কেন নাইলনের জাল হলো? ফুটবলের গোলপোস্টে কেন নাইলনের জাল বাঁধা হয়? আগে সুতির মশারি ছিল, আর এখন নাইলনের। সুন্দরবনের বাঘ যাতে লোকালয়ে ঢুকতে না পারে তার জন্য আগে লাগানো হতো লোহার জাল, আর এখন লাগানো হচ্ছে উচ্চক্ষমতার নাইলন জাল। নাইলনের জাল ব্যবহারে পরিবেশে কী ক্ষতি হচ্ছে? ছোটো ফাঁদের শক্ত জালে ইলিশের পোনা, কচ্ছপের ছানা মরে গিয়ে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ে চড়ার শক্ত দড়ি অথবা, প্যারাসুটও এই ধরনের তন্তু থেকে তৈরি।

আমাদের দেশে বহু ব্যবহৃত নরম পানীয়গুলোর মধ্যে উদবেগজনক পরিমাণে কীটনাশক পাওয়া গেছে। এই সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষকগুলো অনাক্রম্যতা কমানো, জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া,বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কার্যক্ষমতা হ্রাস, স্নায়বিক অনিয়ম, এবং অন্যান্য নানা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তাছাড়া ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক পোকামাকড় মারার জন্য যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহৃত হয় তা তাদের ছাড়াও বহু পরিবেশবান্ধব জীবকেও(মৌমাছি, রেশম মথ) মেরে ফেলে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

বিভিন্ন রং ও রঞ্জক কীভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে জানো?

এগুলো তৈরি করতে যেসমস্ত ধাতব যৌগ ব্যবহার করা হয় তারা বিভিন্নভাবে আমাদের ক্ষতি করে। যেমন —

কোন ধাতুর যৌগ	কী প্রভাব পড়তে পারে
লেড	খাওয়ার ইচ্ছে কমে যাওয়া, বমিভাব, মাথাধরা।
পারদ	মুখ ও জিভের পেশির সাড়া কমে যাওয়া, বৃক্কের ক্ষতি হওয়া।
ক্যাডমিয়াম	হাড়ের জোড়ে ব্যথা, মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে যাওয়া ।

তোমরা প্রতিদিনের জীবনে যে সমস্ত সংশ্লেষিত পদার্থ ব্যবহার করছ বা তাদের ব্যবহার দেখছ তার পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কি? প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও:

এখন কী ব্যবহার করছ	কী ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে হয়
পলিব্যাগ	মোটা কাগজ বা চটের ব্যাগ
অজৈব রং	

5 মানুষের খাদ্য

খাদ্য উপাদান

আমরা সারাদিনে যে যে কাজ করি এসো তার একটা তালিকা নীচের ছবি দেখে তৈরি করি। আচ্ছা, এইসব কাজ করতে গেলে কী প্রয়োজন?
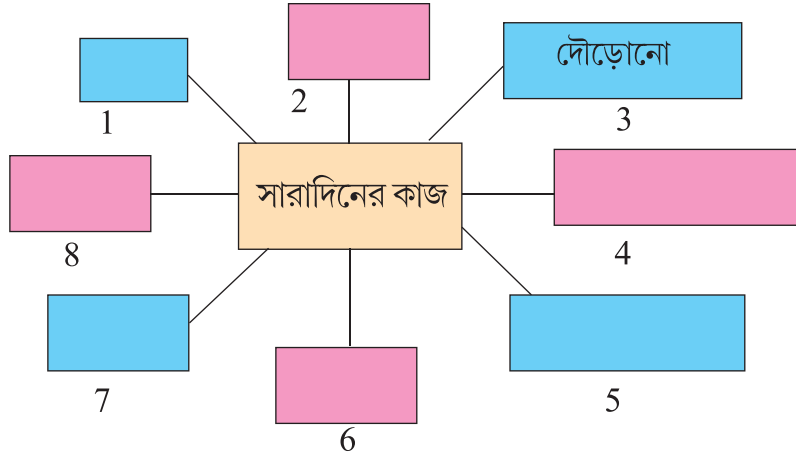
তোমার সামনের টেবিলটা এক হাতে তোলার চেষ্টা করো। না পারলে দু-হাতে তোলার চেষ্টা করো। ওই টেবিলটা তুলতে তোমার দেহে **শক্তি**র প্রয়োজন।

এই শক্তি কোথা থেকে পাও?

সারাদিন টিফিন না খেয়ে থাকলে, সকালে না খেয়ে স্কুলে এলে তোমার কেমন লাগে? শরীরে কি জোর পাও?

....

তাহলে তোমার দেহে শক্তির উৎস কী? ....

ঠিকমতো খাবার খেলে সুস্থ মানুষের শরীরে জীবাণুর সংক্রমণ কম হয়। এবার বলো কীসের অভাবে দেহে রোগজীবাণুর সংক্রমণ অতিমাত্রায় ঘটে এবং শরীর অসুস্থ হয়।

তাহলে বলো, রোগজীবাণুর আক্রমণ ঠেকানো বা তাদের মারার শক্তি কী থেকে আসে? ....।

রোগজীবাণুর আক্রমণ ঠেকানো বা তাদের মারার ক্ষমতা (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা) বাড়াতে গেলে কী করা উচিত? ....।

এবার বলার চেষ্টা করো:

(1) সারাদিনে নানা কাজ করার জন্য কীসের প্রয়োজন? ....।

(2) নানা রোগ বা সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে গেলে কীসের প্রয়োজন? ....।

এখন এই শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক উপাদানের উৎস হলো খাদ্য ।

খাদ্যে নানারকম উপাদানের অভাব হলে দেহে নানা সমস্যা হয় । পরবর্তী আলোচনা থেকে কোন খাদ্যে কোন উপাদান আছে তা জেনে নাও।

সমস্যা	খাদ্যের কোন উপাদানের অভাব হয়
রাতে কম দেখা	ভিটামিন
চোখের কোণ ফ্যাকাশে	খনিজ মৌল
ঠোঁটের কোণে ও জিভে ঘা	ভিটামিন
মাড়ি ফোলা ও রক্ত পড়া	ভিটামিন
প্রায়ই হাড় ভেঙে যাওয়া	খনিজ মৌল

তাহলে কীরকমের (উদ্ভিজ্জ / প্রাণীজ) খাবার আমরা খাই? এতে কোন খাদ্য উপাদান বেশি/কম হচ্ছে তা পরবর্তী আলোচনা থেকে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিতে লেখো।

উদ্ভিজ্জ খাদ্য	কোন খাদ্য উপাদানটি বেশি /কম আছে		প্রাণীজ খাদ্য	কোন খাদ্য উপাদানটি বেশি /কম আছে	
	বেশি	কম		বেশি	কম
চাল, আটা	শর্করা		মধু		
মুড়ি, চিঁড়ে			মাছ	প্রোটিন	শর্করা
ডাল			ছানা		
সয়াবিন			মাংস		
তেল	লিপিড		ডিম		
মাশরুম			দুধ		
সবজি	খনিজ মৌল, তন্তু		চিংড়ি		
ফল	ভিটামিন, খনিজ মৌল	লিপিড	কাঁকড়া		

নীচের খাদ্যতালিকায় কী কী উপাদান থাকতে পারে তাই নিয়ে এসো এবার আলোচনা শুরু করি।
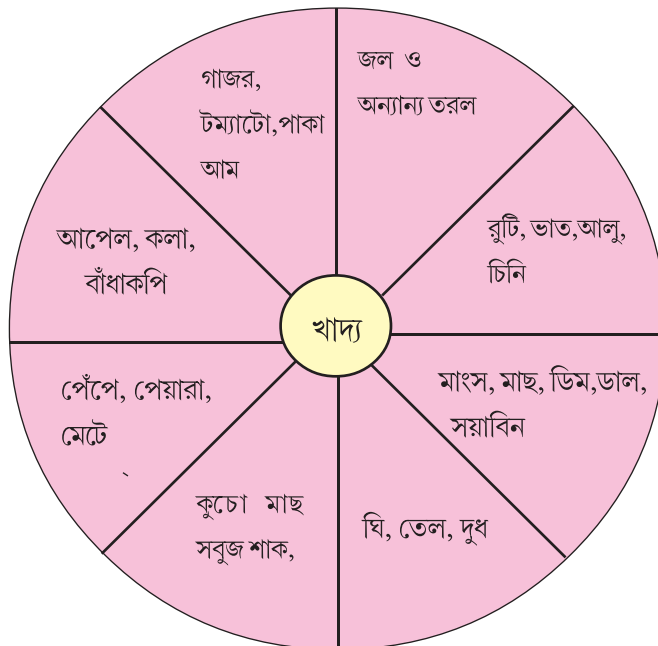
খাদ্যগুলোর প্রধান উপাদান কী ধরনের এসো দেখা যাক —

(1) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (2) প্রোটিন (3) লিপিড (4) ভিটামিন (5) জল (6) খনিজ মৌল (7) খাদ্যতন্তু (8) উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক (ফাইটোকেমিক্যাল)। এর কোনো কোনোটা অনেকটা করে খাওয়া হয়। আবার কোনোটা অল্প করে খাওয়া হয়। কোনো কোনো উপাদান আবার দেহের বিশেষ দরকারে লাগে।

কোন খাদ্যে কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে এসো তার একটি তালিকা তৈরি করি। ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

খাদ্য উৎস	প্রধান খাদ্য উপাদান
1. ভাত, রুটি, দুধ, ফল ....., ... , ...	শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
2. মাছ, মাংস, ডিম ....., ... , ...	প্রোটিন
3. মাখন, তেল, বাদাম, নারকেল .... ,	লিপিড
4. পানীয় জল, ফল, সবজি ....,	জল
5. টম্যাটো, আমলকী, আটা, গাজর ....,	ভিটামিন
6. দুধ, নুন, চাল, গুড়, ডাঁটাশাক, মাংস ......,	খনিজ মৌল
7. আম, আপেল, ডাঁটাশাক, পেঁপে, ওট ....,	খাদ্যতন্তু
8. চা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ....,	উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক/ ফাইটোকেমিক্যাল

একটি খাদ্য থেকে একাধিক খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে। পাকা আমে ভিটামিন, শর্করা, খনিজ মৌল, খাদ্যতন্তু এবং প্রচুর পরিমাণে জলও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পরের পাতার আলোচনাগুলো লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

- দুধে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? প্রোটিন, খনিজ মৌল, শর্করা ...., ...।
- গমে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? খনিজ মৌল, ভিটামিন, প্রোটিন ...., ...।
- আমলকীতে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? ভিটামিন, জল, ..., ...।
- আপেলে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? শর্করা, তন্তু, জল, ..., ...।
- মাছে আর কোন কোন খাদ্য উপাদান থাকতে পারে? লিপিড, খনিজ মৌল, ভিটামিন ...., ...।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা

ওপরের ছবিগুলোতে বিভিন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদানের উৎসগুলো দেখো। এর মধ্যে —

- কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে শর্করা পাওয়া যায়— আলু ...., ..., ..., ...।
- কোন কোন প্রাণীজ খাদ্য থেকে শর্করা পাওয়া যায়— মেটে, ..., ..., ..., ...।

কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্যদের নীচের শ্রেণিগুলোতে ভাগ করা যেতে পারে —

(1) মিষ্টি খাদ্যবস্তু — আখ, মধু, পাকা আম, পাকা কলা, আঙুর, আপেল, ..., ..., ...।

(2) দানাশস্য — চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, ..., ..., ..., ...।

(3) মূল ও কন্দ — বীট, আলু, গাজর, রাঙা আলু, শাঁকালু, ..., ..., ...।

(4) সবুজ শাকসবজি — লালশাক, নটেশাক, ..., ..., ...।

(5) বিভিন্ন প্রকার ডাল — মুসুর, মুগ, ..., ..., ...।

(6) প্রাণীজ খাদ্যবস্তু — মধু, দুধ, ..., ..., ...।

দেহগঠনের জন্য খাদ্য থেকে যেসব শর্করা আমরা ব্যবহার করি তা প্রধানত দু-ধরনের — গ্লুকোজ এবং স্টার্চ বা শ্বেতসার। অনেক গ্লুকোজ অণু জুড়ে শ্বেতসার তৈরি হয়।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো কার্বোহাইড্রেটের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে কার্বোহাইড্রেট আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/ অনুপস্থিত
1. কুমড়ো	
2. কিশমিশ	
3. আতা	
4. জাম	
5. ডিম	
6. জিরা	উপস্থিত
7. দই	
8. কেক	
9. ঘি	
10. চিঁড়া	

এসো এবার মনে করি, আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কী কী কাজ করে।

হাত-পায়ের পেশি কী কাজ করে?

হৃৎপিণ্ড কী কাজ করে?

ফুসফুস কী কাজ করে?

অন্ত্র কী কাজ করে?

এইসব কাজ করার শক্তি পাওয়া যায় কোথা থেকে?

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার (শ্বেতসার) হজম হবার পর যখন সব থেকে ছোটো কণাতে পরিণত হয়, তাই হলো গ্লুকোজ। সেই গ্লুকোজ আবার শরীরের সমস্ত অংশের সীমানায় পৌঁছে যায় রক্তের মাধ্যমে। সেখানে কোশের ভেতর বাতাস থেকে নেওয়া অক্সিজেনের সাহায্যে সেই গ্লুকোজ থেকে তৈরি হয় শক্তি, যা দিয়ে দেহের নানা কাজ হয়।

শর্করা ও দেহের সমস্যা

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দেহকোশ গ্লুকোজ থেকে শক্তি তৈরি করে। সেই শক্তি দিয়ে দেহের নানা কাজ হয়। কিন্তু রক্ত থেকে গ্লুকোজ যদি কোশে প্রবেশই না করতে পারে? ওই গ্লুকোজ তখন রক্তে জমে, আর রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। গ্লুকোজ তখন রক্তের মাধ্যমে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না তা মুত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। কোশে গ্লুকোজ ঢুকতে না পারার জন্য দেহের নানা অঙ্গে (হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, চোখ, পা) সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় মধুমেহ বা ডায়াবেটিস। আমাদের দেশের অনেক মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন। কায়িক পরিশ্রম বাড়িয়ে এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে অনেকক্ষেত্রে এই রোগকে এড়ানো যায়।

কোনো কোনো শিশু কিংবা বয়স্ক ব্যক্তি দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পর নানা সমস্যায় ভোগেন। দুগ্ধ শর্করা ল্যাকটোজ হজম না করতে পারার জন্য এই সমস্যা।

প্রোটিন

এসো দেখি, কোথায় কোথায় থাকে প্রোটিন। মনে রেখো মানুষের দেহের প্রোটিন দিয়ে তৈরি টেনডন ও লিগামেন্ট খুব শক্ত দড়ির মতো, টানলে ছেঁড়ে না। আবার মুরগি বা হাঁসের ডিমের সাদা অংশে থাকা প্রোটিন দ্রবণ গরম করলে জমে শক্ত হয়ে যায়।

নীচের ছকে মানুষের দেহে কোথায় কোথায় কী কী প্রোটিন পাওয়া যায় তা দেখি।
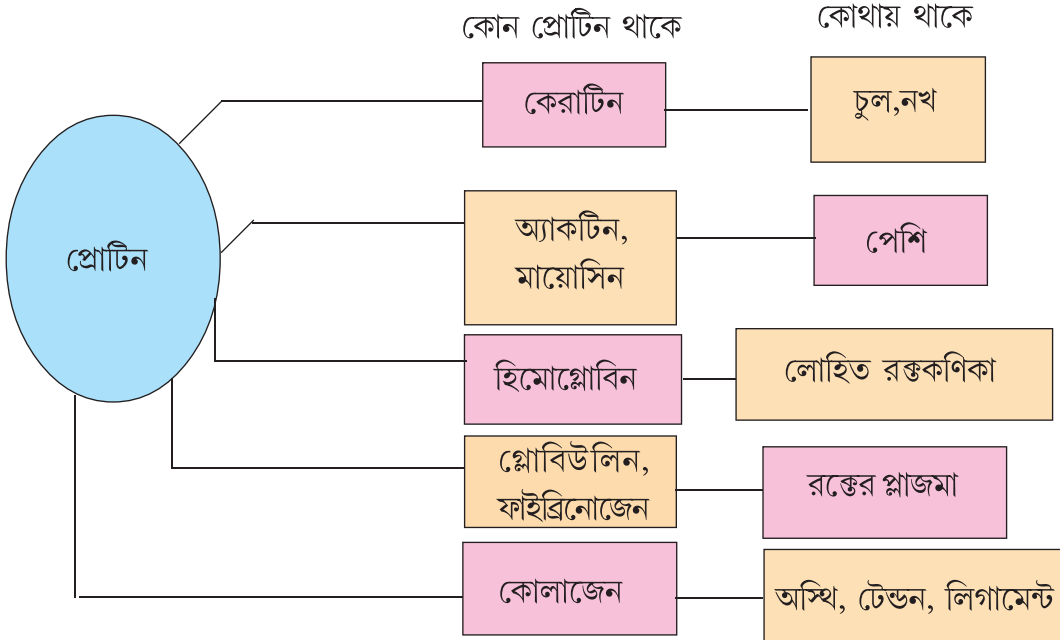
শক্তি উৎপন্ন করতে,দেহের বিভিন্ন অংশ বা কলা গঠনে, ক্ষত সারাতে, শ্বাসবায়ু পরিবহণে, পেশির সংকোচনে, ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের রোগ প্রতিরোধেও প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো জায়গা কেটে গেলে, ওই জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতেও রক্তের প্লাজমায় থাকা প্রোটিন সাহায্য করে। আবার অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে জমা হলে বাত, কিডনি স্টোন ও অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন খাদ্য থেকে আমরা প্রোটিন সংগ্রহ করি তা নীচের ছবিগুলো দেখে তা নিচের তালিকায় লেখো:

ওপরের ছবিগুলো দেখে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়—

(i) কোন কোন উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়—— সয়াবিন, ..., গম, ..., ..., ...

(ii) কোন কোন প্রাণীজ উৎস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়—— মাছ, মাংস, ডিম, ...

উপরের ছবিগুলো ছাড়া আমাদের খাদ্যতালিকায় এমন কতগুলি খাদ্য আছে যা থেকেও প্রোটিন পাওয়া যায়—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
1. চাল, সিম, কাঁঠাল বীজ, ...,	1. ছানা, পনির, ...,
2. বাজরা, ভুট্টা, ...,	2. কাঁকড়া, ...,
3. রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, ধনে, হলুদ, ...,	3. দুধ, ...,

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো প্রোটিনের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে প্রোটিন আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/ অনুপস্থিত
(1) চাল, গম	
(2) ঘি	
(3) চিনাবাদাম	
(4) তিল	
(5) কলা	
(6) মাশরুম	
(7) সুজি	
(8) পিঁপড়ের ডিম	

লিপিড

একজন স্থূল বা মোটা মানুষকে লক্ষ করো। দেখো তার দেহের বিশেষ কতগুলো জায়গায় লিপিড প্রচুর পরিমাণে জমা থাকে। এই লিপিডযুক্ত দেহের অংশগুলো হলো-

লিপিড মানুষের দেহে শক্তির উৎসরূপে কাজ করে, দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। দেহের থেকে তাপ বেরিয়ে যাওয়া কমিয়ে দেয়। আবার শরীরে অতিরিক্ত লিপিড জমা হলে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী ও যকৃতের নানা সমস্যা তৈরি হয়।
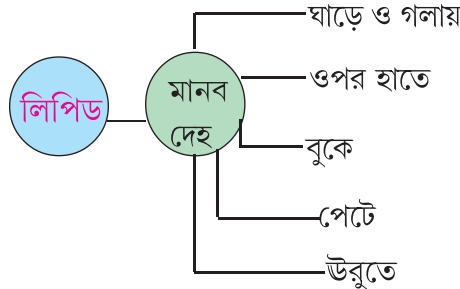
কোন কোন খাদ্য থেকে আমরা লিপিড সংগ্রহ করি তা নীচের ছবিগুলোতে দেখো ও লেখো।

......., ..., ..., ঘি ...., বাদাম ....,

উপরের ছবিগুলো ছাড়া আমাদের খাদ্য তালিকায় ব্যবহৃত এমন কতগুলো খাদ্য আছে যা থেকেও লিপিড পাওয়া যায়—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
1. নারকেল, কাঁঠাল, ...,	1. মাছের তেল, ...,
2. ডাল, আটা, ...,	2. দুধ, দই, ...,
3. গোলমরিচ, জোয়ান, ...,	3. মাংস, ...,

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো লিপিডের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও নীচের খাদ্যগুলোতে লিপিড আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/অনুপস্থিত
1. ফল ও শাকসবজি	
2. দানাশস্য	
3. সর ওঠানো দুধ	

খাদ্য /পানীয়	উপস্থিত/অনুপস্থিত
4. পপকর্ন	
5. আলু	
6. আখের রস	
7. লেবু	
8. গম, ভুট্টা, চাল	
9. মাশরুম	
10. মুরগির মাংস	
11. খেজুর	

ভিটামিন

আজ থেকে 500 বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একটা খুব প্রচলিত রোগ ছিল স্কার্ভি। জাহাজের নাবিকদের অনেকেই এই রোগে মারা যেত। তাই জাহাজে কমলালেবু ও অন্যান্য টক জাতীয় ফল নাবিকদের খেতে দেওয়া হতো।

এরকম নানা ঘটনা লক্ষ করে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী কাসিমির ফাংক ও হপকিন্স সিদ্ধান্তে আসেন যে খাদ্যের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড ছাড়াও 'এমন কোনো' উপাদান আছে যার অভাবে স্কার্ভি বা বেরিবেরির মতো রোগ হয়। এই উপাদানটি হলো ভিটামিন। এদের থেকে শর্করা, প্রোটিন বা লিপিডের মতো শক্তি পাওয়া যায় না।

ভিটামিন দু-ধরনের —

1. তেলে বা ফ্যাটে গুলে যায় (ফ্যাটে দ্রাব্য) এমন ভিটামিন — A, D, E ও K ।

2. জলে গুলে যায় (জলে দ্রাব্য) এমন ভিটামিন — B কমপ্লেক্স, C ।

A, D, E ও K ভিটামিনগুলো মানুষের দেহে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

ভিটামিনের নাম	কাজ
A	চোখ, চামড়া, হাড়, দাঁত ও খাদ্যনালীর গঠন ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
D	হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক গঠন ঠিক রাখে।
E	ত্বক,লোহিত রক্তকণিকা, হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বজায় রাখে।
K	কেটে যাওয়া জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে ।

এখন পরের পাতার খাদ্য উৎসগুলোর ছবি লক্ষ করো এবং জানো এর মধ্যে কোনগুলো A, D, E, K ভিটামিনের উৎস ।

উপরের ছবিগুলো ছাড়াও আমরা আরও নানাধরনের খাদ্য খেয়ে থাকি যা থেকেও তেলে বা ফ্যাটে গুলে যায় এমন ভিটামিন পাওয়া যায়। সেগুলো হলো—

উদ্ভিজ্জ উৎস	প্রাণীজ উৎস
পাকা আম, কুমড়ো, ডুমুর, ডাঁটাশাক, জিরা, জোয়ান, জলপাই, ধনেপাতা, নটেশাক,তেল,ডাল,........., ...	মাংস, ঘি, ছানা, কাঁকড়া, ..., ..., ..., ..., ..., ...

নীচের ক্ষেত্রগুলোতে কোন কোন ভিটামিনের সাহায্য নেবে (A, D, E, K)?

সমস্যা	ভিটামিনের নাম
1. রাতে দেখতে কষ্ট হয়।	1.
2. হাড়গুলো বাঁকা ও মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।	2.
3. ক্ষতস্থানে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না।	3.

- **জলে দ্রাব্য ভিটামিন**

এবার এসো দেখি তোমাদের পরিচিত কোন কোন খাদ্য উৎসে জলে দ্রাব্য ভিটামিনগুলো পাওয়া যায়—

ওপরের ছবিগুলো দেখে নীচের ছকটি পূরণ করো। তোমার জানা অন্যান্য খাদ্য উৎসের নাম তালিকায় যোগ করো।

জলে দ্রাব্য ভিটামিনের নাম	খাদ্য উৎস
1. ভিটামিন C	লেবু জাতীয় ফল, অঙ্কুরিত বীজ, কাঁচালঙ্কা, টম্যাটো, পেয়ারা ....,.......... ,
2. ভিটামিন B কমপ্লেক্স	দানাশস্য, বাঁধাকপি, মুলোশাক, ছোটোমাছ, কাঁচালঙ্কা, দুধ ...., ...,

এবার নীচের সারণির বাম দিকে কতকগুলো উপসর্গ দেওয়া হলো। জলে গুলে যায় এমন কোন ভিটামিনের অভাবে কোন রোগ হয় এসো তা দেখি।

উপসর্গের নাম	ভিটামিনের নাম
1. ঠোঁট ফেটে যাওয়া	i. B কমপ্লেক্স
2. চোখের নীচ ও নখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া	ii. B কমপ্লেক্স
3. মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, দাঁত পড়ে যাওয়া	iii. C
4. স্নায়ুর দুর্বলতা	iv. B কমপ্লেক্স
5. অ্যানিমিয়া, পাতলা পায়খানা, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া	v. B কমপ্লেক্স

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো ভিটামিনের উৎসরূপে যে খাদ্যগুলোকে আমরা চিহ্নিত করলাম, তাদের ছাড়াও পরের পাতার খাদ্যগুলোতে জলে দ্রাব্য ভিটামিন আছে কিনা (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

খাদ্য	উপস্থিত/অনুপস্থিত
1. রুটি, ভুট্টা	
2. পটোল, ঝিঙে	
3. কলমিশাক	
4. লাউপাতা	
5. স্কোয়াশ, পাকা পেঁপে	
6. জাম, তরমুজ, শশা	
7. আলু	
8. ডিমের সাদা অংশ	
9. পনির, মেটে	

খনিজ মৌল

নীচের ঘটনাগুলো ভাবো ও এর সঙ্গে কোন খাদ্য উপাদান যুক্ত থাকতে পারে বোঝার চেষ্টা করো।

● নখ চামচ আকৃতির হয়। ● মাঝেমাঝেই পেশিতে টান ধরে। ● দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে বা কমে যায়। ● জন্মের পর অনেক শিশুর চোখ ট্যারা হয় ও মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায় না। ● রক্তে শর্করার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এই সমস্যাগুলো কার্বোহাইড্রেট, লিপিড বা প্রোটিনের অভাবে ঘটে না।

এই সমস্যাগুলো ফ্যাটে বা জলে গুলে যায় এমন ভিটামিনের অভাবেও ঘটে না।

তবে কি এই সমস্যাগুলো অন্য কোনো খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে ? এসো জানা যাক।

এই প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান হলো খনিজ মৌল। এরকম দরকারি খনিজ মৌলগুলো হলো — আয়রন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, আয়োডিন ও জিঙ্ক। এছাড়াও শরীর গঠনে অন্যান্য খনিজ মৌলেরও প্রয়োজন হয়। ভিটামিনের মতো খনিজ মৌল থেকেও শক্তি পাওয়া যায় না।

জড় বা সজীব উপাদান থেকে খাদ্য উপাদান খনিজ মৌল পাওয়া যায়।

- উদ্ভিদ প্রধানত মাটি বা মাটির নীচে থাকা জল থেকে খনিজ মৌল সংগ্রহ করে।
- প্রাণীরা বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্য, প্রাণীজ খাদ্য বা জল থেকে খনিজ পদার্থগুলো সংগ্রহ করে।

পরের পাতার মানবদেহের কাজগুলোর সঙ্গে কি তোমার পরিচিতি আছে? না থাকলে পরিচিত হওয়ার ও বোঝার চেষ্টা করো। শরীরের এই কাজগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন খনিজ মৌল সম্পর্কযুক্ত। ডানদিকে মৌলগুলোর নাম আর বাঁদিকে ওই মৌলগুলোর কাজ দেওয়া হলো।

খনিজ মৌলের কাজগুলো কী কী?

কাজ	খনিজ মৌলের নাম
• দেহে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখা	সোডিয়াম
• পেশি সংকোচন স্বাভাবিক রাখা	ক্যালশিয়াম
• কোনো কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করা	ক্যালশিয়াম
• অক্সিজেন পরিবহণ করা	আয়রন
• দাঁত ও হাড় গঠন করা	ক্যালশিয়াম,ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম
• মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা	আয়োডিন
• মস্তিষ্কের গঠন ও রক্তের শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা	জিঙ্ক

নীচে বিভিন্ন খাদ্যের ছবি দেওয়া হলো। এবার পরিচিত হও কোন খাদ্য থেকে আমরা কোন খনিজ মৌল পেয়ে থাকি। তোমার জানা অন্যান্য খাদ্য উৎসের নাম তালিকায় যোগ করো।

খনিজ মৌলের নাম	পানীয় / খাদ্য উৎসের নাম
1. ক্যালশিয়াম, ফসফরাস	দুধ, ডিম, চিংড়ি, পাকা পেঁপে, পটোল, ..., ...,
2. ম্যাগনেশিয়াম	শাকসবজি, ..., ...
3. আয়রন	যকৃৎ, চিংড়ি মাছ, আমলকী, শশা, চিচিঙ্গে ....,
4. সোডিয়াম	নুন, পানীয় জল, ...
5. আয়োডিন	নুন, ..., ...
6. জিঙ্ক	শাকসবজি, ..., ...

মানুষের দেহে খনিজ মৌলের অভাবে কতকগুলো সমস্যা তৈরি হয়। এসো জানি কোন খনিজ মৌলের সঙ্গে কোন রোগের সম্পর্ক আছে।

রোগ	রোগ সম্পর্কিত খনিজ মৌল
1. উচ্চ রক্তচাপ	সোডিয়াম
2. অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা, চামচ আকৃতির নখ	আয়রন
3. গলগণ্ড বা গয়টার	আয়োডিন
4. বারবার হাড় ভেঙে যাওয়া, বেঁকে যাওয়া, হাড় ফুটো ফুটো হওয়া, দাঁতের সমস্যা	ক্যালশিয়াম, ফসফরাস
5. রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া	জিঙ্ক

জল

(i) কোন খাদ্য উপাদানকে আমরা তরলরূপে গ্রহণ করি? ....।

(ii) যে-কোনো জীবদেহ গঠনের একটি প্রধান উপাদান হলো জল। একজন মানুষের ওজন 70 কেজি হলে দেহে জল থাকে প্রায় 45 কেজি। ওই পরিমাণ জলকে শতাংশের হিসাবে প্রকাশ করো। ....

- দেহে ব্যবহৃত জল আমরা কোথা থেকে পাই —

  (i) পানীয় জলের মাধ্যমে, (ii) ফলের রস থেকে (তরমুজ, ..., ...)

  (iii) বিভিন্ন খাদ্য থেকে (ভাত, ..., ...) (iv) বিভিন্ন তরল পানীয় থেকে (ডাবের জল, ..., ...)।

- কোন কোন অবস্থায় দেহে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়?

  (i) অনেকটা ঘাম অথবা বারবার পাতলা পায়খানা হলে। (ii) ....।

কী ঘটনা ঘটতে পারে :

1. তুমি যদি পানীয় জলের পরিবর্তে সমুদ্রের জল ক্রমাগত পান করতে থাকো।
2. তুমি নুন মাখানো বিস্কুট, বাদাম বা কাঁচা আমের টুকরো খাও।

খাদ্যতন্তু

আমরা যে খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করি তার কী পরিণতি হয় খাদ্যনালীতে?

খাদ্য হজম হয়। হজম হওয়া খাদ্যের শোষণ হয়। যে খাদ্য হজম হয় না তা মল হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

মলের মধ্যে তন্তু থাকে যা খাদ্যনালীতে কোনোভাবেই হজম করা যায় না। তন্তু এক ধরনের সেলুলোজ বা পেকটিন জাতীয় কার্বোহাইড্রেট। এটি জলে গুলে যেতেও পারে। আবার নাও যেতে পারে। মানুষের দেহ এদের ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। নীচের খাবারগুলোতে বেশি পরিমাণে তন্তু থাকে।

(i) সজনে ডাঁটা, (ii) বাঁধাকপি, (iii) চাল, (iv) আপেল, (v) বীজের খোসা, (vi) ওট।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে তন্তুজাতীয় খাদ্য উপাদানের আরো কয়েকটি উৎস জানার চেষ্টা করো।

(i) ...., (ii) ...., (iii) ...., (iv) ...., (v) ....।

তন্তুসমৃদ্ধ খাদ্য খেলে কতকগুলো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়— উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলত্ব, অন্ত্রের ক্যানসার ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

ফাইটোকেমিক্যালস বা উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক

তুমি নীচের নানা রঙের খাদ্যগুলোকে ছবি দেখে চেনার চেষ্টা করো।

(i) .... (ii) ...., (iii) ...., (iv) ...., (v) ...., (vi) ...., (vii) ....

(viii) .... (ix) ...., (x) বিট, (xi) চা, (xii) ....।

আগের পাতার খাদ্যগুলো প্রত্যেকটি রঙিন। এদের মধ্যে নানা রঙের উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক যৌগ থাকে। যেমন — ক্যারোটিনয়েডস বা ফ্ল্যাভোনয়েডস। এরা মানবদেহের খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া আটকায়। হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিকঠাক রাখে। আর হাড়কে শক্ত রাখে। ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি- খাদ্য উপাদানগুলো নীচের বিভিন্ন খাদ্যের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

খাদ্যের শ্রেণি	বিভিন্ন প্রকার খাদ্য	খাদ্য উপাদান
1. দানাশস্য ও তা থেকে উৎপন্ন খাদ্য	চাল,.......,গম,...., ..., ..., ভুট্টা, ..., ..., ..., ...	কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ..., ..., ..., ...,.........,
2. ডাল ও শুঁটি জাতীয় খাদ্য	মুগ, ..., সয়াবিন, ..., ..., ...	প্রোটিন, ভিটামিন, ..., ..., ...
3. দুধ, মাছ, ডিম ও মাংস জাতীয় খাদ্য	দুধ, দই, ..., মাখন তোলা দুধ, ..., ..., ..., ...	প্রোটিন, খনিজ মৌল, ..., ..., ...
4. শাকসবজি ও ফলমূল	আম, পেঁপে, পালং, ..., ...	ভিটামিন, তন্তু, ..., ..., ...
5. মিষ্টি ও তেল	আখ, সরষের তেল, ..., ..., ..., ..., ...	কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ...., ..., ..., ...,

কোন কোন খাদ্য উপাদানগুলো তোমাদের অবশ্যই খেতে হবে যদি তোমরা সুস্থ থাকতে চাও?

....।

কোন খাদ্য উপাদানগুলো কোন কোন খাদ্য থেকে পাবে, তাদের নাম নীচের সারণিতে লেখো :

খাদ্য উপাদান	খাদ্যের নাম
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

পরের পৃষ্ঠায় লেখা মানুষের যে যে শারীরিক সমস্যা আছে, তা এড়াতে কোন কোন খাদ্য খাওয়া উচিত তা ছকে লেখো।

শারীরিক সমস্যা	কোন খাদ্য খাবে	তা থেকে কোন খাদ্য উপাদান পাবে
মাড়ি ফুলে রক্ত ঝরছে		
দেহে রক্তাল্পতা হয়েছে		
হাড়গুলো দুর্বল, বাঁকা		
কোষ্ঠকাঠিন্য		
রাতে কম দেখতে পাচ্ছে		
মুখে আর জিভে ঘা		
চামড়া কুঁচকে গেছে		
রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে গেছে		

নীচে তিনদিনের খাদ্যতালিকা দেখো। কোনো খাদ্য উপাদানের অভাব ঘটলে তা চিহ্নিত করো।

1 নং তালিকা—

প্রথম দিন	রুটি, গুড়, ভাত, ডাল, তরকারি, মুড়ি, মাছের ঝোল, জল
দ্বিতীয় দিন	পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ, কলা, ভাত, মাখন, তরকারি, আমের চাটনি, জল
তৃতীয় দিন	ভাত, মাছের ঝোল, শাক, মিষ্টি, শশা, আলুসেদ্ধ

2 নং তালিকা—

প্রথম দিন	এগরোল, চকোলেট, রুটি, ঘি, ডাল, আলুভাজা,সবজি
দ্বিতীয় দিন	পাঁউরুটি, কুকিজ, পেস্ট্রি, পরোটা, মাংস, হালকা পানীয়, ডিম
তৃতীয় দিন	ভাত, দুধ, সবজি, ফল, কেক, কুমড়ো সেদ্ধ, পেস্ট্রি

দেহ সুস্থ রাখতে গেলে, নামীদামি কোন কোন খাবারের বদলে আর কী কী খেতে পারো?

- আপেলের বদলে ....।(পাকা পেঁপে/পাকা পেয়ারা/পাকা আমড়া/পাকা কুল)
- মাংস বা ডিমের বদলে ....।(ডাল/সিম/ছোলা বা মটর/মাশরুম/সয়াবিন)
- দুধ, ছানা আর হেলথ ড্রিঙ্কের বদলে ....।(ছাতুর শরবত/লেবুর জল/বেলের শরবত/চিনির শরবত)।
- আয়রন টনিকের বদলে .... (নটেশাক/কাঁচা পেয়ারা/সজনে পাতা/কচুশাক)

পরের পৃষ্ঠায় কতকগুলো খাদ্যের নাম দেওয়া আছে। এগুলো থেকে তুমি কোন কোন খাদ্য উপাদান পেতে পারো (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

1. পাকা আম : খাদ্যতন্তু, ..., ..., ... ।
2. দুধ : প্রোটিন, ..., ..., ... ।
3. বাদাম : লিপিড, ..., ..., ... ।
4. ডিম : খনিজ মৌল, ..., ..., ... ।
5. পেয়ারা : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
6. দই : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
7. টম্যাটো : উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক, ..., ..., ... ।
8. চাল : কার্বোহাইড্রেট, ..., ..., ... ।
9. পালংশাক : ভিটামিন, ..., ..., ... ।
10. আমলকী : খনিজ মৌল, ..., ..., ... ।

ওপরের খাদ্যগুলো চিহ্নিত করো। ওই খাদ্যগুলোতে কোন কোন খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে তা লেখো।

1. : ...., ..., ..., ... ।
2. : ...., ..., ..., ... ।
3. : ...., ..., ..., ... ।
4. : ...., ..., ..., ... ।
5. : ...., ..., ..., ... ।
6. : ...., ..., ..., ... ।
7. : ...., ..., ..., ... ।
8. : ...., ..., ..., ... ।

অপুষ্টি ও স্থূলত্ব

নীচের ছবিগুলোকে লক্ষ করো ও সমস্যাগুলো জানো।

1. গয়টার

2. অ্যানিমিয়া

3. ট্যারা চোখ

4. অন্ধত্ব

5. ম্যারাসমাস

ওপরের অসুস্থ ব্যক্তি ও শিশুদের দেহে এই সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের **গুণগত** বা **পরিমাণগত** অভাবে ঘটতে পারে।

ছবির প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুগুলি নানা রোগে আক্রান্ত। রোগের মূল কারণ অপুষ্টি। অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলি হলো—

- আয়োডিনের অভাব (**গয়টার**)।
- আয়রনের অভাব (**অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা**)।
- আয়োডিনের অভাব (**ট্যারা চোখ**)।
- ভিটামিন A এর অভাব (**অন্ধত্ব**)।
- প্রোটিন ও শক্তির অভাব (**ম্যারাসমাস**)।

রক্তাল্পতা : নানা কারণে রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বা লোহিত রক্ত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। হিমোগ্লোবিন কোশে কোশে অক্সিজেন সরবরাহ করে। হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কোশগুলোর শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধা পায়। সামগ্রিকভাবে মানুষটি দুর্বল হয়ে পড়েন। এটাই রক্তাল্পতা। রক্তাল্পতা নানা কারণে হতে পারে। যেমন— অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, জীবাণুর সংক্রমণ, হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্ত কণিকা সংশ্লেষের উপাদানের অভাব (হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে আয়রন আর লোহিত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে ভিটামিন B_{12})।

খাদ্যে শক্তি উৎপাদক খাদ্য উপাদানগুলোর অভাব ঘটলে অপুষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের শক্তি উৎপাদক উপাদানগুলো হলো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড। এছাড়া শক্তি উৎপাদক নয় এমন খাদ্য উপাদানের (ভিটামিন ও খনিজলবণ) অভাবেও অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যা দেখা যায়। কৃমির সমস্যা থাকলেও অপুষ্টি হতে পারে। অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশুদের খাদ্যতালিকায় কোন কোন উপাদান তুমি যোগ করবে?

(1) কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(2) প্রোটিনযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(3) লিপিডযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(4) ভিটামিনযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

(5) খনিজ মৌলযুক্ত খাদ্য: ...., ..., ...।

অপুষ্টির ফলে শিশুর দেহে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

পাশের ছবিতে শিশুটিকে লক্ষ করো। দেখে শিশুটির উপসর্গগুলো নীচে লেখো।

- দেহের .... গুলির খুব বেশি ক্ষয় হয়েছে ।
- .... বাইরে থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।
- .... জায়গায় জায়গায় কোঁচকানো।
- হাত, পাগুলো খুব .... ।

শব্দভান্ডার : সরু, পেশি, হাড়, চামড়া

শিশুদের এই অপুষ্টিজনিত রোগটি হলো **ম্যারাসমাস**। খাদ্যে প্রোটিন ও শক্তি উভয়ের অভাব ঘটলে এই রোগ হয়। এক বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে সাধারণত এই রোগ দেখা যায়।

পাশের ছবিটি লক্ষ করো। শিশুটির চামড়া গাঢ় বর্ণের ও পেট ফোলা। দেখে মনে হয় যেন চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিনের অভাব ঘটলে 1-4 বছর বয়স্ক শিশুদের যে অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায় তাহলো **কোয়াশিওরকর**।

এই ধরনের শিশুদের সুস্থ করতে তুমি কোন কোন খাদ্য নির্বাচন করলে তার তালিকা তৈরি করো।

1. .... 2. .... 3. ....

ম্যারাসমাস ও **কোয়াশিওরকর** ছাড়াও শিশুদের অপর কিছু প্রধান অপুষ্টিজনিত সমস্যা হলো :

1. **আয়রনের অভাবজনিত রোগ** — অ্যানিমিয়া, চামচ আকৃতির নখ
2. **আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ** — গয়টার, জড়বুদ্ধি, ট্যারা চোখ
3. **ভিটামিন D এর অভাবজনিত রোগ**— রিকেট
4. **ভিটামিন B কমপ্লেক্স এর অভাবজনিত রোগ**— বেরিবেরি
5. **ভিটামিন A এর অভাবজনিত রোগ**— অন্ধত্ব

কী করে সারানো যায় এই অসুখ ?

- লৌহসমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ (পেয়ারা, আম, আটা, চিঁড়া, গুড়, কিশমিশ, গোলমরিচ, জোয়ান, জিরা, তিল, কচু, নটেশাক, ধনেপাতা, পালংশাক, পেঁয়াজকলি, কলমিশাক, মুলোশাক................, ..., ...)
- আয়োডিনসমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ (আয়োডিনযুক্ত খাদ্যলবণ , ..., ..., ...,)
- ভিটামিন **B কমপ্লেক্স** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (ঢেঁকিছাঁটা চাল. সবুজ শাকসবজি, ..., ...,)
- ভিটামিন **D** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (দুধ,............................, ..., ...,)
- ভিটামিন **A** যুক্ত খাদ্যগ্রহণ (পাকা আম, কমলালেবু, গাজর, কুল, কাঁঠাল, ছানা, ডিম, ধনেপাতা, নটেশাক, মুলোশাক ...., ..., ...)।

নীচের উপসর্গগুলি নানা খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে। কোন কোন খাদ্য খেলে এই সমস্যাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা নীচের তালিকায় লেখো।

উপসর্গের নাম	কোন খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে	কোন খাদ্যে ওই খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়
হাত পা বাঁকা	ভিটামিন D	
চোখের মণিতে সাদা দাগ	ভিটামিন A	
পেছনের সারি থেকে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়তে পারে না	ভিটামিন A	
জিভে, মুখের কোণে ঘা, মাড়ি ফোলা	ভিটামিন B কমপ্লেক্স	
ফোলা মুখ	প্রোটিন	
ভাঙা নখ	ক্যালশিয়াম	
খসখসে চামড়া	ভিটামিন A	

এতক্ষণ আমরা অপুষ্টির জন্য কী কী অসুখ হতে পারে জানলাম। এবার আমরা জানাব টিটু, জনদের সমস্যা।

মিমোর খাদ্যাভ্যাস	টিটুর খাদ্যাভ্যাস	জনের খাদ্যাভ্যাস
1. ভাত বা রুটি 2. ডাল	1. ভাত বা পরোটা	1. রুটি 2. মাংস 3. ফ্রাই
3. শাক 4. সবজি 5. ফল	2. সবজি 3. দুধ	4. আইসক্রিম 5. রোস্ট
6. দুধ 7. তেল, 8. মাছ, মাংস বা ডিম	4. তেল 5. পাঁঠার মাংস	6. কেক ও ডিম
	6. পেস্ট্রি 7. কুকিজ	7. চিনি 8. বার্গার
	8. কোল্ড ড্রিংকস	9. হালকা পানীয়
	9. গুড় বা চিনি	10. ফ্রুট জুস

টিটু এবং জনের ওজন স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। বয়স ও উচ্চতার তুলনায় একজন ব্যক্তির যে ওজন হওয়া উচিত তার **20%** বেশি হলে যে ওই ব্যক্তিকে স্থূল বা মোটা বলে ধরা হয়।

টিটু ও জনের স্থূলত্বের কারণগুলো কী কী?

টিটু ও জন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লিপিড/শর্করা/ প্রোটিন বেশি গ্রহণ করে।

টিটু ও জন পরিশ্রমের তুলনায় কম/বেশি খাদ্যগ্রহণ করে।

টিটু ও জনের এই ওজন বেড়ে যাওয়ায় ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

- রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়তে পারে।
- রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হতে পারে।
- রক্তনালীর গায়ে লিপিড জমে রক্তনালীর ব্যাস কমে যেতে পারে। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের নানা সমস্যা হতে পারে।
- অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ও ক্যানসার হতে পারে।

এছাড়াও স্থূলত্বের ফলে আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিজেরা আলোচনা করে তালিকা তৈরি করো।

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

কোন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করলে স্থূলত্বের প্রবণতা রোধ করা যায় তার তালিকা তৈরি করো (টিক দাও)।

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

শব্দভাণ্ডার : সিদ্ধ, তেলমশলাহীন, হালকা পানীয়, আলুভাজা, তেলযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, চকোলেট, ঘি, মাখন, ফল, সবজি, ডাল, রুটি, পাঁঠার মাংস, পেস্ট্রি, বার্গার, ছোটো মাছ, তন্তুযুক্ত খাদ্য, কাবাব।

এবার নীচে বিভিন্ন শিশুর বা ব্যক্তির ওজন ও উচ্চতা দেওয়া হলো। এর ভিত্তিতে BMI এর মান গণনা করো। তারপর শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে বলার চেষ্টা করো কোন কোন ক্ষেত্রে স্থূলত্বজনিত সমস্যার সম্ভাবনা হতে পারে।

BMI 18.5 – 25 : স্বাভাবিক ওজন; BMI 25 – 30 : বেশি ওজন; BMI 30 – 40 : স্থূলত্ব

ওজন (kg)	উচ্চতা (m)	BMI (ওজন/উচ্চতা ^{2})	স্থূলত্বের সম্ভাবনা (আছে/নেই)	কী কী উপসর্গ দেখা যায়
62	1.57			
66	1.50			
72	1.59			
38	1.62			
75	1.60			
71	1.58			
72	1.67			

প্রাকৃতিক খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সংশ্লেষিত খাদ্য

গাছের খাবার, ঘরে তৈরি খাবার আর কারখানায় তৈরি খাবার

আমরা অনেকেই গাছের পাকা ফল খেতে ভালোবাসি আবার অনেকেই পপকর্ন, কোল্ড ড্রিঙ্কস, পট্যাটো চিপস খেতে ভালোবাসেন।

এক-একজনের এক-একরকম খাবার খেতে ভালো লাগে। জানো কি, ওইসব চিপস আর ড্রিঙ্কস কী কী দিয়ে তৈরি হয়? চলো দেখি।

জোগাড় করো একটা আম (নইলে অন্য যে-কোনো ফল), জ্যাম বা জেলির একটা বোতল (খালি নয়তো ভরতি, তোমার যেমন ইচ্ছে), আর জোগাড় করো কমলালেবুর গন্ধওয়ালা কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল (দুটো বোতলেরই লেবেলটা যেন ঠিক থাকে)।

আগে দেখে নিই, কোনটা কোথা থেকে পেলে। দরকারে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

	কোথা থেকে পেলে
আম (বা অন্য ফল)	
জ্যাম বা জেলি	
কোল্ড ড্রিঙ্কস	

- ফলটা যেমনটি গাছে ফলে, তেমনটিই তুমি খাও। আর কী কী তুমি খাও এমন চার-পাঁচটি খাবারের নাম লেখো তো।
- তুমি রোজ দুপুরে বা রাতে যা যা খাও, তা যেমনটি গাছে ফলে তেমনটি খাও না। সেই খাবারগুলো কী ভাবে বানানো হয়? সেইরকম কয়েকটি খাবারের নাম লেখো।
- জ্যাম আর কোল্ডড্রিঙ্কস? এসো ভালো করে দেখি।

	ফল	জ্যাম, জেলি, আচার	ঠান্ডা পানীয়
আকার, স্বাদ, গন্ধ আর রং গাছে যেমনটি ফলে, তেমনটিই কি থাকে?			
কী কী দিয়ে তৈরি হয়? (বোতলের গায়ে লেখা আছে দেখো)			
কোথায় তৈরি হয়? (এটাও বোতলের গায়ে লেখা আছে দেখো)			

তোমরা প্রতিদিন নানাধরনের খাদ্য খাও। এবার তোমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

খাবারের আকৃতি, স্বাদ, গন্ধ ও রং	প্রতিদিনের খাবার	এর মধ্যে কী জিনিস আছে	এরকম আরো কয়েকটি খাবারের নাম
প্রাকৃতিক			
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক থেকে একটু আলাদা			
স্বাভাবিক থেকে একদম আলাদা			

তাহলে দেখো :

প্রাকৃতিক খাবারের পুষ্টিগুণ সবচেয়ে বেশি, দাম তুলনায় কম। প্রক্রিয়াজাত খাবারের পুষ্টিগুণ তুলনায় কম, দাম কিছু বেশি। আর কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত খাবারের পুষ্টিগুণ প্রায় নেই, অথচ দাম অনেক বেশি। তা বলে কি এই সব খাবার সবটাই ভালো?

প্রাকৃতিক খাদ্য : সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া খাবার।
প্রক্রিয়াজাত খাদ্য : এই ধরনের খাবার তৈরি করতে প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিভিন্ন খাদ্য উপাদানদের নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
সংশ্লেষিত খাদ্য : এই ধরনের খাবারের উপাদানগুলো সম্পূর্ণ কৃত্রিম। কিন্তু তৈরি খাবারটার রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি অনেকটাই প্রাকৃতিক খাবারের মতো হয়।

এসো দেখি নীচের খাবারগুলোতে নানা ধরনের ক্ষতিকারক পদার্থ (কৃত্রিম রং, গন্ধ ও স্বাদ) মেশানো হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়।

খাদ্য	কী কী মিশে থাকতে পারে
হলুদ মিষ্টি ও সস্তা বিরিয়ানিতে	মেটানিল ইয়েলো
চকোলেট, পেস্ট্রি আর কোলা ড্রিঙ্কস	বাদামি রং হিসেবে ক্যারামেল
পট্যাটো চিপস, ভুট্টার খই	ট্রান্স ফ্যাট
মোমো, চাউমিন	আজিনোমোটো
আইসক্রিম	কারাজিনান, ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল
চা, কফি আর নানা ফলের স্বাদের রসে	সাইক্লামেট, অ্যাস্পার্টেম, স্যাকারিন

এছাড়া আরও কত রয়েছে। এইসব প্রক্রিয়াজাত আর কৃত্রিম খাবার খেলে যত ইচ্ছে তত খাওয়া ঠিক নয়। এগুলো বেশি খেলে আমাদের নানারকম শারীরিক অসুবিধা বা হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ,বৃক্ক, হাড় ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। শরীর ভালো রাখতে হলে হলুদ, গোলাপি বা উজ্জ্বল লাল রং-মেশানো খাবার না খাওয়াই ভালো। এধরনের খাবার আমাদের না খেলেও চলে।

এসো নিজেরা একটা ছক বানাই, কোন খাবার আমরা কতটা (কম না বেশি) খাব:

রোজ সকালে কী কী খেতে পারি?	
রোজ দুপুরে কী কী খেতে পারি?	
রোজ বিকেলে কী কী খেতে পারি?	
রোজ রাত্রে কী কী খেতে পারি?	
বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কী কী খেতে পারি?	
রোগ এড়িয়ে চলতে গেলে কোন কোন খাবার না খাওয়াই উচিত?	

ভাত, মুড়ি, চিঁড়ে, লুচি, দই, ঘোল, ছানা, পনির, এগরোল, আলুর চপ - এগুলোর কোনগুলো প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত বা কৃত্রিম তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

নীচের ছবিগুলো থেকে প্রাকৃতিক, প্রক্রিয়াজাত ও সংশ্লেষিত খাদ্যগুলো শনাক্ত করো ।

জীবনে জলের ভূমিকা

জল দিয়ে আমরা কী করি বলো তো? জল অন্যান্য জীবেরও বা কি কাজে লাগে?

ওপরের ছবিগুলো থেকে মানুষ ও বিভিন্ন জীবের জীবনে জলের ভূমিকাগুলো লিখে ফেলো।

1.	5.	9.
2.	6.	
3.	7.	
4.	8.	

পৃথিবীতে এত জল কোথায় কোথায় থাকে ?
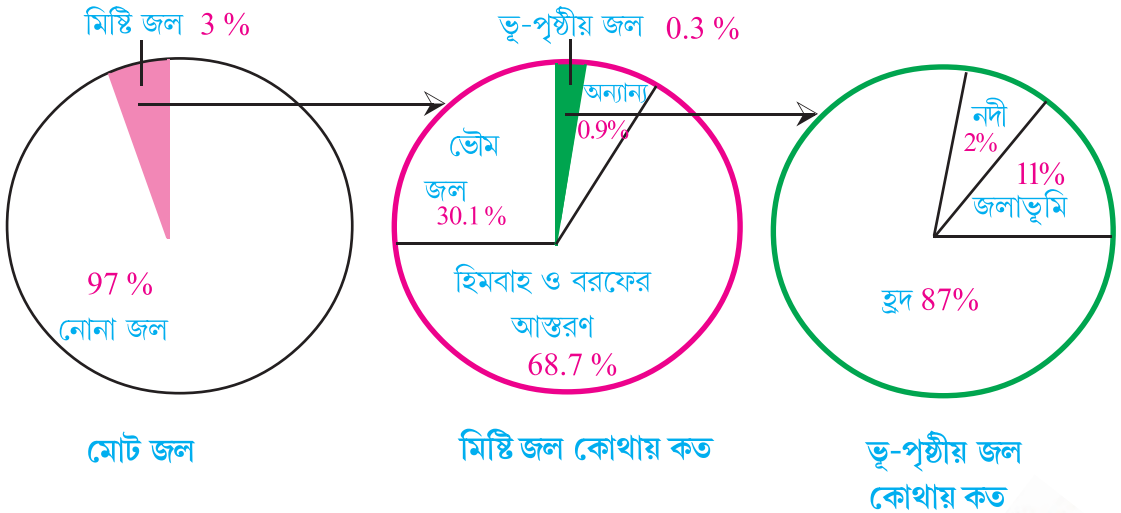
বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনটার শতকরা পরিমাণ কত বলো । (না জানলে শিক্ষক /শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

সমুদ্রের জল .... মিষ্টি জল .... পানীয় জল .... ।

আমরা খাবার জল কোথা কোথা থেকে পাই ?

1........... 2........... 3........... 4........... 5........... 6...........

বলো তো, কুয়ো ও টিউবওয়েলের জল আসে কোথা থেকে? ছবিটা দেখে ভেবে বলো। (না পারলে শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নাও)।

এসো জলের পরিমাণ সংক্রান্ত কতকগুলো বিষয় জানি।

পৃথিবীর মিষ্টি জলের হিসেবনিকেশ ঃ

- পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় 75% জলে ঢাকা। এর প্রায় 97% সমুদ্রের জল। প্রায় 3% মিষ্টি জল।
- এই মিষ্টি জলের প্রায় $\frac{2}{3}$ অংশ মেরু অঞ্চল, পর্বতশীর্ষের বরফ ও হিমবাহের অংশ হিসেবে সঞ্চিত আছে। বাকি জল মাটির নীচে ও অন্যান্য জায়গায় নানারূপে সঞ্চিত আছে।
- যদিও পৃথিবীর প্রায় $\frac{3}{4}$ ভাগ জলে ঢাকা, কিন্তু এই জলের 0.37% অংশ জলই পান করার উপযোগী।
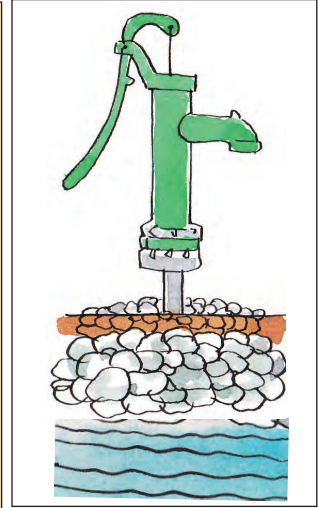
তোমরা বন্ধুরা কতজন কোন কোন উৎস থেকে জল ব্যবহার করো, ওই জলের রং, গন্ধ আর স্বাদ কেমন, আর কী কী কাজে তা ব্যবহার করো লেখো।

উৎস	রং	গন্ধ	স্বাদ	কতজন ব্যবহার করো	কী কাজে ব্যবহার করো
পুকুর					
নদী					
ঝরনা					
কুয়ো					
টিউবওয়েল					
টাইমকল					
নিজেদের পাম্প					

গত কয়েক মাসে তোমাদের কার কী পেটের রোগ আর চামড়ার রোগ হয়েছে সবাই আলোচনা করে লেখো :

রোগ	কজনের হয়েছে	তারা কোন উৎসের জল খায়
পেট খারাপ		
পেট ব্যথা		
কৃমি		
জন্ডিস		
পাঁচড়া		

দূষিত জল থেকে নানা রোগ হতে পারে। জলকে পরিষ্কার করব কীভাবে?

এসো সকলে মিলে আলোচনা করে দেখি, নীচের জিনিসগুলো ব্যবহার করে কীভাবে জলকে পরিষ্কার করা যায়। তুমি এই কাজে ছবিতে দেওয়া জিনিসগুলো থেকে এক বা একাধিক উপকরণ একেকবারে ব্যবহার করতে পারো। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে কতরকমভাবে জলকে পরিষ্কার করা যায়?
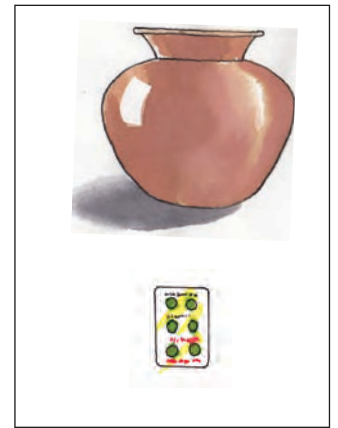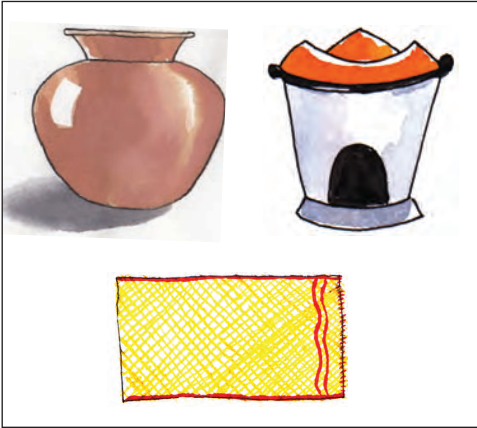
কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যায়	কীভাবে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরি করা যায়
হাঁড়ি, উনুন, কাপড়	জলের উৎস থেকে পাওয়া জল অন্তত 20 মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে।
ফিল্টার যন্ত্র	
হাঁড়ি, হ্যালোজেন ট্যাবলেট	খুব তাড়াতাড়ি জলকে জীবাণুমুক্ত করতে হলে হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে জল শোধন করা হয়।

সাগর-মহাসাগর পৃথিবীর ওপরকার প্রায় 3/4 অংশ দখল করে আছে। তেমনি মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় 70% শুধু জল। গাছের শরীরে জন্তুজানোয়ারের তুলনায় জলের ভাগ বেশি। ওজন হিসেবে জেলিফিসে জলের পরিমাণ 95%, ডিমে 74%। আবার শশাতে ওজন হিসেবে জলের পরিমাণ 95%। কাঠের মধ্যে জলের পরিমাণ প্রায় 10%। এবার এসো দেখি মানুষের শরীরে কোন কোন পদার্থ তরলরূপে থাকে।
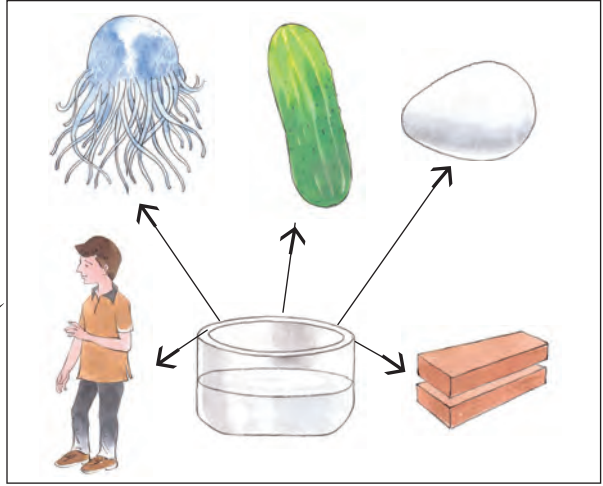
প্রথমে লেখো তোমার দেহে জল কোথায় কোথায় থাকে?

1.রক্ত 2. .... 3. ....
4. .... 5. .... 6. ....

তারপর লেখো তোমার দেহ থেকে জল কীভাবে বেরিয়ে যায়?

1. ঘাম 2. .... 3. .... 4. ....

আবার মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে ও তরল পদার্থে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে।

অঙ্গের / তরল পদার্থের নাম	ওজন হিসেবে জলের পরিমাণ (%)
ফুসফুস	83
মস্তিষ্ক (মগজ)	73
যকৃৎ (মেটে)	85
অস্থি (হাড়)	31
পেশি (মাংস)	75
ত্বক (চামড়া)	64
হৃৎপিণ্ড	73
বৃক্ক	83
রক্ত	90
লালা	95

আগের পাতার ছক থেকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ/তরলকে জলের পরিমাণের অধঃক্রম অনুসারে সাজাও:

1. .... 2. .... 3. .... 4........................... 5..........................

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে জল কীভাবে অবস্থান করে তা নীচে দেওয়া আছে। কোন অঙ্গে তা কীভাবে আছে, তা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নীচের ছকে লেখার চেষ্টা করো :

অঙ্গের নাম	জল কী হিসাবে থাকে
(1) মুখবিবর	
(2) যকৃৎ	
(3) রক্তনালী/হৃৎপিণ্ড	
(4) মূত্রথলি	
(5) চোখ	
(6) ত্বক	
(7) মস্তিষ্ক	
(8) অস্থিসন্ধি	

শব্দভাণ্ডার : পিচ্ছিল রস, ঘাম, অশ্রু, রক্ত, পিত্ত, লালা, মূত্র, সেরিব্রোস্পাইনাল তরল।

এবার একটা একটা করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো। না পারলে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। আর সবচেয়ে নীচে জলের কাজগুলো একটা একটা করে লেখো।

1. তোমার পা কেটে গেছে। ডাক্তারবাবু তোমার হাতে ওষুধ ইনজেকশন দিলেন। ওই ওষুধ তোমার কাটা ঘা-এ পৌঁছোবে কীসের মধ্যে দিয়ে? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
2. একটা বড়ো বিস্কুট একবারে চিবিয়ে ফেলো। তোমার মুখের ভেতরটা এখন কেমন, শুকনো না ভিজে? ....। দেখত, গিলতে পারছ কি? কথা বলতে চেষ্টা করত। কথা বলা যাচ্ছে কি? .... । যদি মুখের ভেতরটা শুকনো লাগে তাহলে তুমি কী করবে?
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
3. খুব গরমে আমরা ঘামি। ঘাম জড়ানো গায়ে বাতাস দিলে কেমন লাগে? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।
4. তোমার চোখে কোন তরল থাকে? ....।
   চোখে পোকা পড়লে চোখ থেকে কী বেরোয়? ....।
   কেন বেরোয়? ....।
   তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।

5. তোমার নিশ্বাস একটা আয়নায় ফেলে দেখো, আয়নায় কীসের দাগ পড়ছে? ....।
নিশ্বাসের মধ্যে এই জল কোথা থেকে এল? .... । তাহলে জলের কী কাজ আছে? ....।
এখানে জলের আর কী কাজ আছে? ....।

6. তোমার দুটো হাড়ের জোড়ে থাকা পিচ্ছিল রসে জল আছে সেটা জেনেছ। ওই জল কী কাজ করে?
...............................।

7. পেট খারাপ হলে বারবার তরল মল বেরিয়ে যায় বা বমি হয়। তখন অনেক দরকারি জিনিস জলে গুলে বেরিয়ে যায়। জল এখানে কী কাজ করে বলো তো? ....।

8. খাদ্যগ্রহণের পর মুখবিবরে খাদ্য হজম করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাহলে এখানে জলের কাজ কী? ....।

9. পাচনের পর খাদ্যের সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর বরাবর শোষিত হয়। তাহলে জলের এখানে কী কাজ আছে? ....।

10. খাদ্যের যে অংশ হজম হয় না তা নরম মলরূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাহলে এখানে জল কী ভূমিকা পালন করে? ....।

11. ম্যালেরিয়া বা নিউমোনিয়ার মতো রোগে প্রবল জ্বর আসে। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ার সময় বা প্রবল জরে স্নান করানোর সময় জল কী কাজ করে? ....।

12. খাদ্য সংশ্লেষের সময় জল ব্যবহৃত হয়। এখানে জল কী কাজ করে? ....।

জলের ভূমিকা : জল সাধারণত কোনো বস্তুকে দ্রবীভূত করে, কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় বা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

এবার ওপরের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে জলের ভূমিকাগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

ঘটনাসমূহ	জলের ভূমিকা
1.	
2.	
3. ঘাম জড়ানো গায়ে বাতাস দিলে আরাম লাগে	তাপ পরিবাহক হিসেবে
4.	
5.	
6.	
7. পেট খারাপ হলে অনেক দরকারি জিনিস মল বা বমির সঙ্গে বেরিয়ে যায়	দ্রাবক হিসেবে
8.	
9.	
10.	
11.	
12. খাদ্য হজমের সময় জল ব্যবহৃত হয়	বিক্রিয়ক হিসেবে

শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পরিমাণমতো জল খাওয়া দরকার। গরমকালে তুমি রোজ কতটা জল খাও ? তোমার বন্ধুরাই বা কতটা খায় ? সবাই মিলে একসঙ্গে নীচের ছকে লেখো :

জলের উৎস	তুমি	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু	তোমার বন্ধু
খাবার জল					
চা, দুধ বা অন্য পানীয়					
ডাল, ঝোল					
ফলের রস					
অন্যান্য					

- কয়েকটা কথা মনে রেখো।
- ভাত বা তরকারির মধ্যেও কিন্তু 40-60 % জল থাকে ।
- একটা বড়ো গ্লাসে প্রায় 200 মিলি জল ধরে ; আর একটা বড়ো কাপে প্রায় 100 মিলি জল ধরে। সাধারণ হাতায় জল থাকে প্রায় 50 মিলি।
- জলের বোতলে জল ধরে : ছোটো - 500 মিলি, মাঝারি - 1 লিটার আর বড়ো - 2 লিটার।

24 ঘন্টায় কতটা জল পান করো ?

তুমি ....

তোমার বন্ধুরা : 1. .... 2............... 3. .... 4...................

তাহলে গরমকালে তুমি আর তোমার বন্ধুরা এক-একজনে রোজ জল খাও কতটা ?

আর ওইসময়ে তুমি বা তোমার বন্ধুরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখো, তোমাদের দেহ থেকে গড়ে কতটা জল বের হয়ে যায়।

1. মূত্রের মাধ্যমে	1.5 - 2 লি
2. ঘামের মাধ্যমে	2 লি
3. শ্বাসের মাধ্যমে	400 মিলি
4. মলের মাধ্যমে	200 মিলি
5. চোখের জলের মাধ্যমে	50 মিলি

মোট কত পরিমাণ জল সারাদিনে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ? .... ।

ঠিক কত পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন?

একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি প্রতিদিন তার দেহের ওজনের কেজি প্রতি 50 মিলিলিটার জল পান করেন তবে তার দেহের দৈনিক জলের চাহিদা পূরণ হয়।

নীচের তালিকায় বিভিন্ন শিশু/প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহের ওজনের দেওয়া হলো। তাদের জলের চাহিদা হিসেব কষে বার করো:

দেহের ওজন (কেজি)	দৈনিক জলের চাহিদা (লি)	দৈনিক কত গ্লাস জল পান করা প্রয়োজন (এক গ্লাসে প্রায় 200 মিলি জল ধরে)
1. 20		
2. 30		
3. 40		
4. 50		
5. 70		

এবার বলো তো, তোমার দেহ রোজ যতটা জল হারায় তুমি ততটা জল কি পান করো? ....।
না হলে কী হতে পারে? ....।

এতক্ষণ তোমরা দেখলে জল মানুষের দেহে নানা ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য জীবদের বেঁচে থাকার জন্যও জল একইভাবে জরুরি। এই ভূমিকার জন্য জলের নানা ধর্ম কাজ করে। এবার বুঝে নাও কোন ধর্ম জলকে জীবদেহে কোন ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করে।

জলের ধর্ম	জীবদেহে জলের ভূমিকা
1. ঘরের তাপমাত্রায় তরল।	জীবের প্রয়োজনীয় নানা বিক্রিয়া ঘটাতে ও জীবের বেঁচে থাকার তরল মাধ্যম রূপে কাজ করে।
2. জলকে গরম করতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন।	বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা দ্রুত বদলালেও বড়ো চেহারার প্রাণীদের দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে।
3. জলকে বাষ্প করতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন।	ঘাম হওয়া ও বাষ্পমোচনের মাধ্যমে জল বেরিয়ে গেলে দেহ ঠান্ডা হয়। খুব অল্প পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হলেও অনেক পরিমাণ তাপ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।
4. অন্য যে-কোনো তরলের তুলনায় জলে বিভিন্ন বস্তু সহজেই গুলে যায়।	সহজেই বিভিন্ন বস্তুকে দেহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
5. জলের কোনো রং নেই।	জলের গভীরে থাকা উদ্ভিদও খাদ্য তৈরির জন্য আলো পেতে পারে।

খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর ভূমিকা

1. (a) একটা টবের গাছকে বেশ কয়েকদিন ধরে সূর্যের আলোতে, জল না দিয়ে, রেখে দিলে কী হবে? ....।

   (b) কেন এমন হলো? ....।

   (c) ওই কয়েকদিন গাছটা যদি সূর্যের আলো না পেত তাহলে কী হতো?
   ....।

2. (a) ঐ টবের গাছটাকে যেখানে কোনো আলোই পৌঁছোয় না, এমন অন্ধকার ঘরে বেশ কয়েকদিন (10-15 দিন) রেখে দেওয়া হলো। কয়েকদিন পরে টবের গাছটার কী অবস্থা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? ....।

   (b) এমন হওয়ার পেছনে কারণ কী? ....।

3. কয়েকদিন গাছটাকে অন্ধকার ঘরে রেখে নিয়মিত জল দেওয়া হলো। তাহলে কি গাছটার পরিণতি অন্যরকম কিছু হবে?

4. টবের গাছটাকে জল দিয়ে পর্যাপ্ত সূর্যালোকে রেখে দেওয়া হলো। তুমি কী দেখতে পাবে?

ওপরের চারটে ঘটনা দেখে কী বোঝা গেল বলো তো? গাছের তাহলে বেঁচে থাকার জন্য জল আর আলো দুটোই প্রয়োজন।

কিন্তু গাছের জল আর আলো কেন প্রয়োজন বলতে পারবে কি?

....।

আচ্ছা গাছ থেকে তো আমরা নানারকম খাবার পাই। তাহলে গাছ খাবার পায় কীভাবে বলো তো?

....।

দেখো তো তোমরা বলতে পারো কিনা? বাড়িতে আর গাছে কীভাবে খাবার তৈরি হয় নীচের ছকটায় লিখতে চেষ্টা করো ।

বাড়িতে	গাছে
1. খাবার তৈরি হয় কোথায়?	1. খাবার তৈরি হয় কোথায়? ....
2. রান্না করতে কী কী লাগে?	2. খাবার তৈরি করতে কী কী লাগে?
চাল	(i) ....
....	(ii) সবুজ গাছের ক্লোরোফিল কণা
....	(iii) ....
....	(iv) কার্বন ডাইঅক্সাইড
3. রান্নার পর কী কী খাবার তৈরি হয়?	3. খাবার তৈরির সময় কী কী পাওয়া যায়?
(i) ভাত	(i) শর্করা জাতীয় খাবার (গ্লুকোজ)
(ii)	(ii) অক্সিজেন
(iii)	(iii) জল

উদ্ভিদের খাবার তৈরি আর জল :

এসো প্রথমেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি গাছ কোথা থেকে জল পায় ঃ

স্থলজ উদ্ভিদ জল পায় .... ।

জলজ উদ্ভিদ জল পায় .... ।

কিন্তু এই জলটাকে গাছ কীভাবে নিজেদের শরীরে নেয়? এই জল, গাছ নিশ্চয়ই কোনোভাবে নিজেদের দেহে শুষে নেয়। কীভাবে জানো কি?

মাটির নীচেথাকা কোন অংশটা দিয়ে গাছ জল টানে? .... ।

ওই অঙ্গটা কি কোনোভাবে মাটি থেকে জল শুষে নিতে সাহায্য করে .... ।
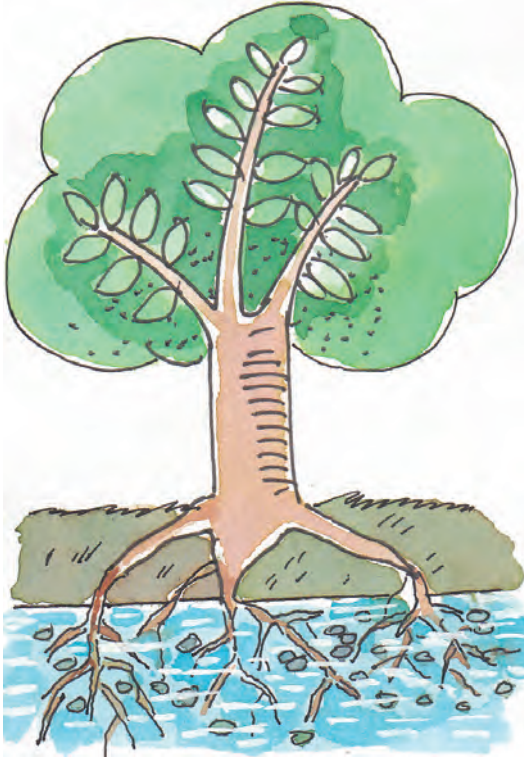
স্থলজ উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটির কণার গায়ে লেগে থাকা জল শুষে নেয়। কোনো কোনো স্থলজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে মূল দিয়ে জলীয় বাষ্প শুষে নেয়। আর জলজ উদ্ভিদ তার জলে ডুবে থাকা সমস্ত অংশ দিয়ে জল শোষণ করে।

আর আলো? গাছেরা সেটা কোথা থেকে পায় নিশ্চয় তোমাদের আলাদা করে বলে দিতে হবে না। লিখে ফেলো দেখি .... ।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে জলের ভূমিকা :

মূল বা দেহের অন্যান্য অংশ দিয়ে শোষণ করা জল গাছ পাতায় পৌঁছে দেয়। গাছের খাবার তৈরি হয় এই পাতায় বা অন্যান্য সবুজ অংশ তাই .... হলো গাছের রান্নাঘর।

গাছের খাবার তৈরির প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় অক্সিজেন গ্যাস। জানো কি এই অক্সিজেন কোথা থেকে পাওয়া যায়? খাবার তৈরির সময় এই জল ভেঙেই অক্সিজেন পাওয়া যায়।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে আলোর ভূমিকা :

গাছের খাবার তৈরি করার প্রক্রিয়াটার নাম জানো কি? গাছের খাবার তৈরি করার প্রক্রিয়াটার নাম হলো সালোকসংশ্লেষ। এসো তো এই শব্দটাকে ভেঙে দেখি শব্দটার মানে কী। সালোকসংশ্লেষ শব্দটাকে ভাঙলে পাই, সালোক আর সংশ্লেষ। আর সালোক শব্দটাকে ভেঙে কী পাই? স + আলোক।

তাহলে কী বোঝা গেল? স + আলোক মানে আলোর উপস্থিতি আর সংশ্লেষ মানে হলো তৈরি করা। অর্থাৎ আলোর উপস্থিতিতে কোনো একটা কিছু তৈরি করা হচ্ছে। এই আলো হলো সূর্যের আলো।

সূর্যের আলোর শক্তির খুব সামান্য একটা অংশ গাছ শোষণ করে। সূর্যের এই শক্তি আর গাছের সবুজ কণা - ক্লোরোফিল, এদের সাহায্যেই গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা শুরু করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার পরের ধাপগুলোতে প্রয়োজন হয় জল আর পরিবেশ থেকে নেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের।

সূর্যের আলো থেকে যে শক্তি গাছ শোষণ করে, তার একটা অংশকে গাছ রূপান্তরিত করে তার তৈরি করা শর্করা জাতীয় খাবারে জমা করে রাখে।

মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীরা যখন উদ্ভিদজাত কোনো খাবার খায়, তারা আসলে খাবারে জমিয়ে রাখা সূর্যের ওই রূপান্তরিত শক্তিটাকেই ব্যবহার করে। সূর্যের ওই রূপান্তরিত শক্তিটাকে ব্যবহার করেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা তাদের নানা কাজের শক্তির চাহিদা পূরণ করে।

উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য

মূল

মূল আর আমাদের পরিচিত খাবার

নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো। তোমরা রোজ যেসব খাবার খাও তার কিছু কিছু নীচে দেওয়া আছে। খুঁজে বার করে লেখো, তার কোনটা গাছের কোন অংশ (অংশগুলোর নাম নীচে দেওয়া আছে)।

মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ

এবার তুমি আজ আর গতকাল যেসব খাবার খেয়েছ তা নীচের তালিকায় সাজিয়ে লেখো, তারপর সেই খাবারগুলোর কোনটি গাছের কোন অংশ থেকে পাওয়া যায়, তা লেখো।

ক্রমিক সংখ্যা	খাবারের নাম	গাছের কোন অংশ থেকে তৈরি হয়
	ভাত	
	রুটি	
	ডাল	বীজ

এবার তুমি গত দু-দিনে গাছের মূলজাতীয় কোন কোন উদ্ভিজ্জ খাবার খেয়েছ তার নাম লেখো : ------, ------, ------।

ভেবে দেখো তো মাটির নীচ থেকে গাছের যা যা অংশ তুমি খাও, তার সবটাই কী মূল? নীচের তালিকায় লেখো।

ক্রমিক সংখ্যা	খাবার	মূল/ কাণ্ড
	গাজর	
	বীট	
	আলু	
	আদা	
	মুলো	

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে একটি করে মুলো/গাজর/বীট/মাটির নীচের অংশ সমেত থানকুনি বা কোনো ঘাস আর একটি করে জবা গাছের ডাল/বাঁশের কঞ্চি/পুঁইশাক আনতে বলবেন।

সারণিতে দেওয়া বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তোমার আনা সবজিগুলোর তুলনা করে দেখো। কী জানতে পারলে?

বৈশিষ্ট্য	মুলো/গাজর/বীট/মাটির নীচের অংশ সমেত থানকুনি বা কোনো ঘাস	জবা গাছের ডাল/ বাঁশের কঞ্চি/পুঁইশাক
মাটির ওপর বা নীচ থেকে পাই		
সরু রোঁয়ার মতো গঠন পাশ থেকে বেরিয়েছে কিনা		
সাধারণত খানিক দূরে দূরে পাতা আর শাখা প্রশাখা দেখা যাচ্ছে কিনা		
খাড়াভাবে আছে নাকি লতিয়ে আছে		
সবুজ বা অন্য কোনো রঙের নাকি বর্ণহীন		
কোনো সামান্য ফোলা অংশ আছে কিনা যেখান থেকে শাখা বা পাতা বেরিয়েছে		

এবার তাহলে এসো দেখি মূল চেনার উপায় কী?

- বীজের নীচের অংশ থেকে বের হয় এবং মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।
- কোনো গাঁট বা নোড (Node) নেই।
- নীচের দিকে ডগায় একটা টুপি আর কিছুটা ওপরের দিকে রোঁয়া রোঁয়া থাকে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি দলকে একটি করে ডাঁটাশাক/নটেশাক/পুঁইশাকের মূল, যে-কোনো জংলা গাছের মূল এবং তুলসী /আকন্দ/ কালমেঘ/ বাসক/ কুলেখাড়া/ঘৃতকুমারী ইত্যাদি গাছের মূল আনতে বলবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা কোনো একটি মূল, অঙ্কুরিত ছোলা, আম বা তেঁতুল বীজ সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

তোমাদের আনা নমুনা মূলগুলি সম্পর্কে এসো ভালো করে জানা যাক।

1. মূলটি মাটির উপরে ছিল, না মাটির নীচে ছিল?
2. অঙ্কুরিত বীজটির সঙ্গে তুলনা করে বলো, বীজের কোন অংশটি থেকে মূল তৈরি হয়েছে?
3. দেখো তো মূলে নীচের বিষয়গুলো আছে কিনা?

(ক) মূলের একেবারে ডগায় টুপি আছে কিনা।

(খ) টুপির ঠিক ওপরে কোনো রোঁয়া ছাড়া কিছুটা নরম অংশ আছে কিনা।

(গ) রোঁয়া ছাড়া অংশের পর রোঁয়া হওয়া অংশ আছে কিনা।

(ঘ) রোঁয়া হওয়া অংশের ওপর কোনো শক্ত অংশ আছে কিনা। গাছকে মাটি থেকে তোলার সময় তার শেকড় বা মূল কিছুটা ছিঁড়ে যায়। সেক্ষেত্রে তোমরা হয়তো মূলের ডগায় টুপি বা তার ওপরের রোঁয়াগুলো দেখতে পাবে না। তাই তোমরা যদি কচুরিপানাকে জল থেকে তুলে তার শেকড়গুলোকে দেখো তাহলে ওই মূলের ডগায় টুপিটা দেখতে পাবে।

এবার আমরা জেনে নিই মূলের এই বিভিন্ন অংশগুলোর নাম কী আর সেগুলো থাকলে গাছের লাভই বা কী।

- মূলের ডগার টুপির মতো অংশটা হলো মূলত্র (Root Cap)। এই অংশ, মাটিতে মূল ঢোকার সময় শক্ত আঘাত থেকে মূলের নরম অংশকে বাঁচিয়ে রাখে। আর মূলের এই জায়গাটাই হলো মূলত্র অঞ্চল (Root cap zone)।
- মূলের টুপির ঠিক ওপরের জায়গা যেখানে কোনো রোঁয়া নেই এই জায়গাটাতেই মূল লম্বায় বাড়তে থাকে। আর মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। এই জায়গাটাকে বলে মূলের বেড়ে ওঠার জায়গা বা বর্ধনশীল অঞ্চল (Growth zone)।
- মূলের এই বেড়ে ওঠার জায়গাটার ঠিক ওপরেই রোঁয়া রোঁয়া যে জায়গাটা, সেটা হলো মূলরোম অঞ্চল (Root hair zone)। এই রোমগুলো দিয়ে গাছ মাটি থেকে জল ও নানারকম খনিজ পদার্থ শোষণ করে।
- মূলের এই রোঁয়া রোঁয়া জায়গাটার ওপরে যে শক্ত অংশের জায়গাটা সেটা হলো স্থায়ী অঞ্চল (Permanent zone)। মাটির সঙ্গে গাছকে শক্ত করে আটকে রাখা এই অঞ্চলের কাজ।

4. তোমার আনা মূলটা মাটির কত গভীর পর্যন্ত ঢুকেছিল? (স্কেল দিয়ে মেপে ফেলো)

মূলের কাজ ঃ
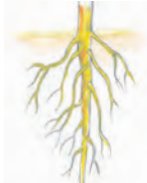
1. a. গাছটা কোন অংশ দিয়ে মাটি আঁকড়ে ছিল?
   b. এর থেকে মূলটি কী কাজ করে বলে তুমি বুঝলে?
2. a. মূলটা তোলার সময় শুকনো না ভিজে ছিল?
   b. গাছের গোড়ার মাটিতে জল ঢাললে সেটা কোথায় কোথায় যেতে পারে?
   c. টবের গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছটির কী কী পরিবর্তন হয়?
   d. এর কারণ কী?
   e. এর থেকে মূলের আর কী কাজ আছে বলে তোমার মনে হয়?

মূলের প্রধান কাজ ঃ দৃঢ়তা প্রদান/গাছকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে রাখা ও মাটি থেকে জল শোষণ করা।

এসো দেখা যাক মূলের আর কী কী কাজ আছে?

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি দলকে একটি করে ঘাস বা ধানের মূলসহ গাছ এবং যেখানে যেমন পাওয়া যাবে তেমন পরগাছা, পাথরকুচির মূলসহ পাতা, বটের ঝুরি, তাল গাছের কাঁটা আর সুন্দরী গরান ইত্যাদি গাছের মূল আনতে বলবেন।

তোমার আনা ঘাস বা ধানের মূলটাকে ভালো করে দেখো। আগের দিন যে মূলটা দেখেছিলে, এটা কী তারই মতো? এসো দেখি। নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

বৈশিষ্ট্য	ডাঁটাশাক ইত্যাদির মূল	ঘাস বা ধানের মূল
মূলগুলো এক জায়গা থেকে গোছায় বেরিয়েছে, না কি মূলের পাশ থেকে অনেক মূল বেরিয়েছে মাটির ওপরে ছড়িয়ে থাকে, না মাটির ভেতরে ঢুকে যায়		

টুকরো কথা

ডাঁটাশাকের একটাই প্রধান মূল। সেখান থেকে অন্যান্য শাখামূল বেরোয়। এই মূলকে স্থানিক মূল বলে। আর যাদের কোনো প্রধান মূল নেই, তাদের কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেকগুলো মূল একসঙ্গে গোছা করে বের হয়। কখনো-কখনো পাতা বা কাণ্ড থেকেও মূল বের হয়। এদের অস্থানিক মূল বলে। ধান, পাথরকুচি বা ঘাসে এই ধরনের মূল দেখা যায়।

তোমার চেনা কয়েকটি গাছের নাম, আর তার মূলটি কোন ধরনের, তা নীচের তালিকায় লেখো:

ক্রমিক সংখ্যা	গাছের নাম	মূলটি কোন ধরনের
	নয়নতারা	
	সন্ধ্যামালতী	
	ধান	
	আম	
	দূর্বাঘাস	
	কচুরিপানা	

নীচের ছবিগুলোতে বিভিন্নরকম মূলের চেহারা দেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।
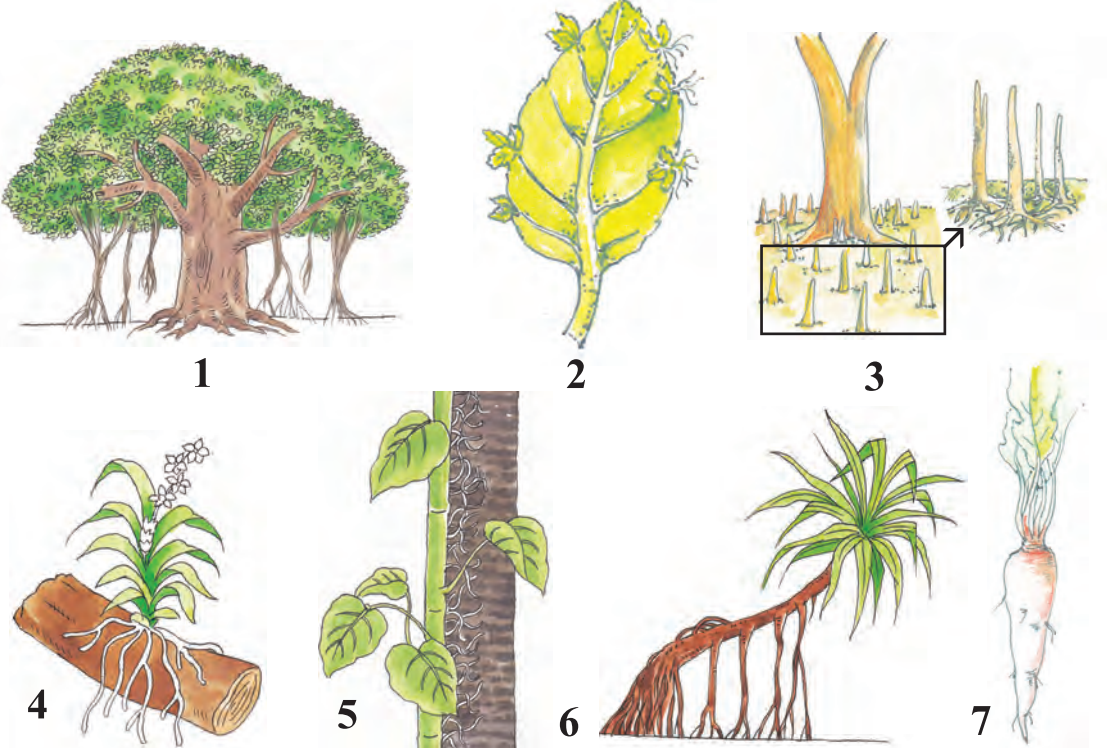
মূল গাছকে মাটিতে ধরে রাখা আর জলশোষণ ছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ করে। আগের পাতার ছবিগুলো দেখে বলো তো, কোন মূল কী ধরনের কাজ করে? কোনো কোনো মূল একের বেশিরকম কাজ করতে পারে। প্রথম স্তম্ভের কথার সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের কথার মিলিয়ে মিলিয়ে তৃতীয় স্তম্ভে লিখে ফেলো দেখি।

মূলের নাম	কাজ	মিলিয়ে লেখো
1. বটগাছের ডালের মূল	a) বংশবিস্তার করা	2 & a
2. পাথরকুচি পাতার মূল	b) মাটির ওপর থেকে শ্বাস নেওয়া	
3. সুন্দরী গাছের মূল	c) গাছকে ঠেস দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে	
4. রাস্নার (অর্কিড) মূল	d) খাদ্য সঞ্চয় করা	
5. গজপিপুলের ডাঁটার মূল	e) অন্য গাছকে আঁকড়ে ওপরে ওঠা	
6. কেয়ার কাণ্ডের নীচের দিকের মূল	f) বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প নেওয়া	
7. মুলো		

মূল আমাদের রোজকার জীবনে কী কী কাজে লাগে? এসো দেখি।

1. পুকুর বা নদীর পাড়ে গাছ লাগানো হয়, কেন বলতে পারো?
2. গাছ না-লাগানো, না-বাঁধানো পুকুর পাড় ভেঙে যায় কেন?
3. মাটির ক্ষয় রোধে গাছ লাগানোর এরকম আর কোন কোন উদাহরণ তুমি জানো?

   (a) (b) (c) সমুদ্রের তীরে (d)

4. এইরকম কোন কোন গাছ লাগানো যেতে পারে?
5. বন্যাপ্রবণ ও ঝঞ্ঝাপ্রবণ অঞ্চলে নদীর ধার বরাবর আর পাহাড়ের ঢালে কোন কোন গাছ লাগানো দরকার?
6. মরূভূমির বিস্তার কীভাবে রোধ করা যেতে পারে?
7. কোন কোন গাছের মূল মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে? এগুলো বাজারে কখন মেলে?
8. অন্য কোন কোন প্রাণী গাছের মূল খায়?
9. কোন কোন গাছের মূল থেকে আমরা ওষুধ পাই? কোন কোন রোগে তা ব্যবহৃত হয়?

   (a) (b)

10. (i) কোন কোন জীব অন্য গাছের মূলে বসবাস করে?

    (a) মটর গাছের মূলে রাইজোবিয়াম নামক অণুজীব (b) পাইন জাতীয় গাছের মূলে ছত্রাক (মাইকোরাইজা)

    (ii) এতে গাছের কী সুবিধা?

    (a) (b)

রাস্তার পাশে ঘাসহীন, গাছহীন খোলা মাটি আর বাগানের/নদীর পাড়ে/পার্কে গাছের ছায়ায় থাকা মাটির তুলনা করো।

মাটিটা কেমন	গাছহীন মাটি	গাছওয়ালা মাটি
মাটিটা খুব শক্ত না নরম		
মাটিতে ছিদ্র বেশি না কম		
মাটিতে কতরকম ছোটো ছোটো প্রাণী আছে		
মাটি কি ঝুরঝুরে না ঝুরঝুরে নয়		
মাটি ভিজে না শুকনো		
মাটিটা খুব গরম না ঠান্ডা ঠান্ডা (দুপুরবেলা)		

এ থেকে তোমার কী মনে হয়, গাছের মূল মাটিকে কী কী ভাবে প্রভাবিত করতে পারে?

1. 2. 3. 4.

কাণ্ড

পেঁয়াজ ও আখের ক্ষেত্রে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছ সেগুলো লেখো।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীকে দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে একটি করে মূলসহ শাখাপ্রশাখা আছে এমন গাছ নিয়ে আসতে বলবেন ও ছাত্রছাত্রীদের দল বিভাজন করে বসাবেন।

তোমার সবাই গাছ দেখেছ। মাটির ওপরে গাছের কী কী অংশ থাকে?

তোমার আনা গাছটার মাটির ওপরের অংশের একটা ছবি নীচে দেখো, আর তার নানা অংশ চিহ্নিত করো।

এবার এসো নীচের তালিকাটি পূরণ করি:

1. গাছটির বড়ো ডালগুলি গাছটার কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে?
2. এর গায়ে যেখানে ডালগুলি যুক্ত সেখানটা কেমন দেখতে? (রং, দাগ, উঁচু বা নীচু জায়গা ইত্যাদি)
3. এইরকম দুটি জায়গার মাঝখানটি কেমন দেখতে? তার নাম কী?
4. পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদির সঙ্গে গাছের কোথায় যোগ থাকে?
5. পাতা আর কাণ্ডের মধ্যে কীরকম জ্যামিতিক আকার তৈরি হয়?

টুকরো কথা

কাণ্ডের যেখান থেকে শাখাগুলো বেরিয়েছে তাকে বলে পর্ব বা নোড (Node)। আর দুটি পর্বের মাঝখানের জায়গাটা হলো পর্বমধ্য (Internode)। পাতা আর কাণ্ডের মাঝে যে কোণ তৈরি হয় তাকে কক্ষ বা অ্যাক্সিল (Axil) বলে। আর মাটির ওপরে কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা বা ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল নিয়ে গাছের যে অংশ তাকে বিটপ (Shoot) বলে।

তাহলে গাছের মাটির ওপরে কী কী অংশের নাম জানলাম?

1. ...., 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

তুমি যতরকম গাছ দেখেছ তার সবগুলিই কি একরকম দেখতে? এসো তুলনা করি।

বৈশিষ্ট্য	আম	দেবদারু	নারকেল	বাঁশ
1. গুঁড়ি (কাণ্ডের গোড়ার দিকের মোটা কাষ্ঠল কাণ্ড) আছে কি?				
2. থাকলে কীরকম (মোটা/সরু)				
3. গুঁড়ির গা কেমন? (মসৃণ/এবড়োখেবড়ো)				
4. শাখা আছে কিনা?				
5. বিটপের আকৃতি কেমন?				
6. কাণ্ড নিরেট না ফাঁপা?				

তোমার দেখা সব গাছগুলি সমান উঁচু নয়; এসো তাদের চিনি।

গাছগুলির নাম লেখো :

1. কোন গাছটি কতটা উঁচু?
2. কোন গাছ বাতাসে বেশি হেলে পড়ে?

3. কোন গাছের কাণ্ড আর ডাল বেশি শক্ত আর শুকনো?
4. কোনো গাছের ডালপালা মাটির কত উপর থেকে বেরোয়?
5. কতদিন বাঁচে?
6. কোন গাছের প্রকৃতি কেমন? (যেমন, আম - বৃক্ষ, জবা - গুল্ম, ধান - বীরুৎ)

তোমার দেখা কী কী গাছ মাটিতে সোজা দাঁড়াতে পারে না?

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
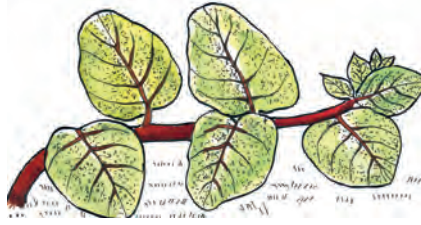
এসো দেখি ওপরের গাছগুলি কী কী রকমের হয়?

1. কাণ্ডের পর্ব থেকে মূল তৈরি হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে কিনা?
2. কাণ্ডটা মাটিতে শুয়ে থাকে কিনা?
3. কাণ্ড শক্ত কিছু বেয়ে ওঠে কিনা?

বলো তো নীচের গাছগুলি দেহের কোন কোন অঙ্গ দিয়ে কোনো কিছু বেয়ে ওপরে ওঠে?

গাছের নাম	অঙ্গের নাম
1. লাউ গাছ	a) কাণ্ডের পর্ব থেকে বেরোনো মূল
2. মটর গাছ	b) ডাল থেকে বেরোনো আঁকশি
3. অপরাজিতা	c) পাতা থেকে তৈরি হওয়া আঁকশি
	d) কাণ্ড

নীচে দেওয়া তোমার রোজকার চেনা জিনিসগুলোর মধ্যে কোনটা কাণ্ড, কোনটা নয় বলো তো? [প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলো।]

চেনা জিনিস	কাণ্ড	কাণ্ড নয়	আকৃতি কেমন
ডাঁটাশাক			
বাঁধাকপি			
সজনেডাঁটা			
আলু			
কচু			

কিছু কিছু গাছের কাণ্ড আমাদের ঠিক চেনা কাণ্ডের মতো নয়। নিজেদের সুবিধার জন্য সেই সমস্ত গাছগুলো তাদের কাণ্ডগুলোকে পালটে ফেলেছে। এরকম পালটে যাওয়া কাণ্ডগুলোকে আমরা বলি - **রূপান্তরিত কাণ্ড** (Modified Shoot)। আমরা যে আলু খাই সেটা আলুগাছের পালটে যাওয়া কাণ্ড যার মধ্যে তার ভবিষ্যতের খাদ্য সে সঞ্চয় করে রাখে। নীচের ছবিগুলোতে গাছের কাণ্ডের কোন অংশ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নীচে দেখো আর লেখো।
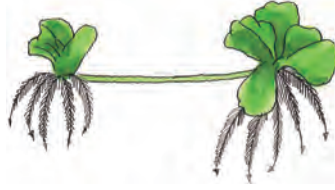
1. .... 2. .... 3. রূপান্তরিত মৃদগত কাণ্ড 4. ....

এসো এবার এইসব কাণ্ডের কয়েকটি সম্পর্কে ভালো করে জানি:

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	কোনরকম কাণ্ড	কেমন দেখতে	কাজ কী
1.	বেলের শাখাকন্টক	রূপান্তরিত বায়বীয় কাণ্ড : কাণ্ড শাখা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে।	লম্বা, ধারালো কাঁটার মতো	আত্মরক্ষা করা
2.	কচুরিপানার খর্ব-ধাবক	রূপান্তরিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ড		
3.	আলুর স্ফীত কন্দ	রূপান্তরিত মৃদগত কাণ্ড		
4.	কুমড়োর শাখা-আকর্ষ	রূপান্তরিত বায়বীয় কাণ্ড		

এসো এবার গাছের দিনরাত কীভাবে কাটে খোঁজ নিই :

★ গাছ তার পাতায় খাবার বানায়। তার জলটা তোলে মূল দিয়ে।
সেই জলটা কোন পথে পাতায় পৌঁছোয় ? ----------------------------

★ পাতায় তৈরি খাবারটা গাছের নীচমহলে পৌঁছোয়ই বা কোন পথে ? ---------------------।

★ গাছের বাড়তি খাবারটা গাছ কোথায় জমা রাখে ----------------------।

★ গাছ চারপাশের ডালপালাগুলোকে মেলে ধরে; পাতাগুলোকে রোদে মেলে রাখে। গাছের কোন অংশটি ডাল, পাতা, ফুল আর ফল ধরে রাখে -----------------------।

★ তৃণভোজী পশুরা গাছকে খেতে এলে, কোন অংশটা দিয়ে গাছ নিজেকে বাঁচায় ----------।

★ চড়া রোদে যখন মাটি থেকে কষ্ট করে তোলা জল পাতা থেকে বাষ্প হয়ে যেতে থাকে। তখন গাছের কাণ্ডের গায়ের মোমের আবরণ তা ঠেকায়। এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

★ বাঁশগাছ, কলাগাছ, পাম এসব গাছ ফুল না ফুটিয়ে, বীজ না তৈরি করেও কাণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীতে তাদের বংশধরদের রেখে যায়। এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

★ পুঁইশাক, লাউশাক এরা পাতা ছাড়াও আর কোন অঙ্গের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করতে পারে? এখানে কাণ্ডের ভূমিকা কী? ....

তাহলে আমরা গাছের কাণ্ডের কোন কোন কাজের কথা জানলাম? নীচে লিখি।

1. জল বয়ে নিয়ে যাওয়া 2. 3. খাদ্যসঞ্চয় 4.

5. 6.

গাছের গায়ে ওই সবুজ ছোপগুলো হলো লাইকেন। বাতাস দূষণমুক্ত থাকলে লাইকেনের রং থাকে সবুজ। বাতাস বেশি দূষিত হলে লাইকেনের রং বদলে খয়েরি হয়ে যায়।

আমাদের সারাদিনে গাছের কাণ্ড কোন কোন কাজে প্রয়োজন হয়?

1. তোমার বাড়িতে কোন কোন কাজে কাঠ লেগেছে?
2. তুমি যে কাগজে লেখো, তা কী থেকে তৈরি?
3. বলো তো কোন কোন যান তৈরিতে কাঠ ব্যবহার হয়?
4. তোমার বাড়িতে রান্না করতে গাছ কী কী ভাবে কাজে লাগতে পারে?
5. কোন কোন গাছের কাণ্ড তুমি খাবার হিসাবে খাও?
6. তোমার সুতির পোশাক, চটের বস্তা কী থেকে তৈরি?
7. গাছের কী কী অংশ আঠা, মশা তাড়ানোর ধুনো, সাইকেলের টায়ার আর কাঠের পালিশ তৈরিতে কাজে লাগতে পারে?
8. দু-একটা ওষুধের নাম লেখো যা গাছের কাণ্ড থেকে পাওয়া যায়?
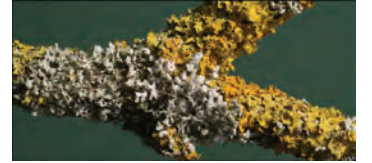
আর পরিবেশেই বা গাছের কাণ্ড কী ভূমিকা নেয়—

1. রাতে পাখি, কাঠবেড়ালি, বাদুড়, বানর এরা কোথায় আশ্রয় নেয়?
2. গাছে থাকে এমন কয়েকটি পোকামাকড়ের নাম লেখো।
3. তোমার দরকারি অক্সিজেন কে বাতাসে ছেড়ে দেয়? আর তোমার ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড কে টেনে নেয়?
4. গরমকালে গাছের নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা বোধ হয় কেন?
5. গাড়ির ধোঁয়ার নানা বিষাক্ত গ্যাস টেনে নিয়ে বাতাসকে নির্মল রাখে কে?
6. জানো কি, গাছের গুঁড়ি দেখে পরিবেশ দূষিত কিনা কীভাবে বুঝবে?
7. জানো কি, গাছের কাটা গুঁড়ি দেখে গাছের বয়স বলা যায় কীভাবে?

পাতা

তোমরা স্কুলে যাওয়ার পথে যেসব পাতা দেখো, তার কয়েকটির ছবি নীচে দেওয়া আছে।
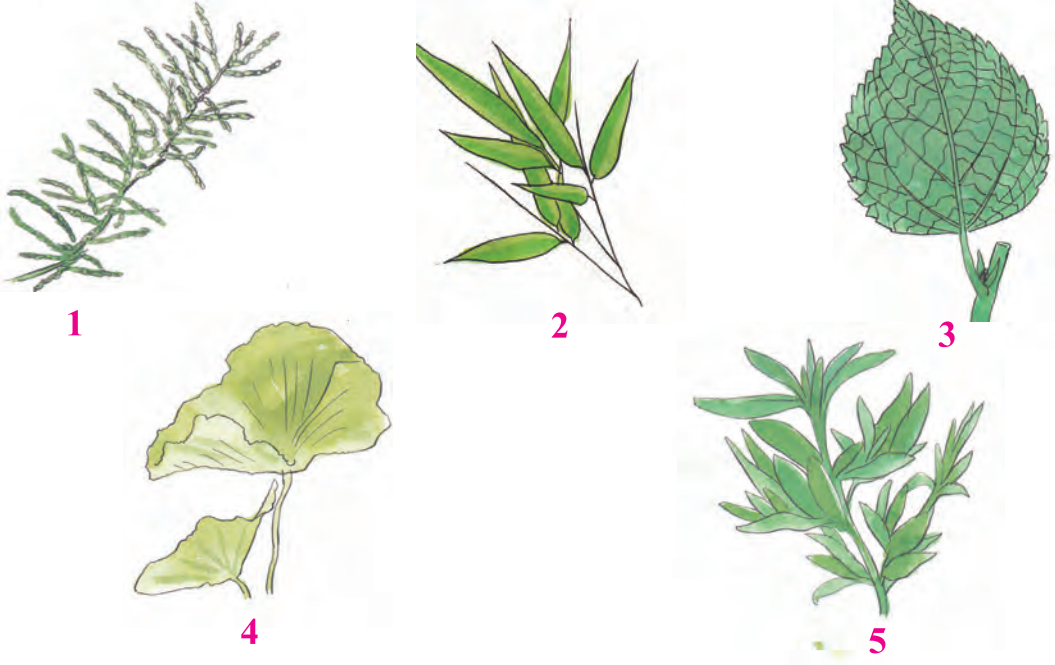
1 2 3 4 5

কোনটা কোন গাছের পাতা তার নাম লেখো:

1. --------- 2. ------------ 3. --------------- 4. ----------- 5. ....``

এবার তুমি পাতাগুলো সংগ্রহ করে পাতাগুলোর চওড়া প্রসারিত অংশের আকারগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং নীচে তার ছবি আঁকো।

নমুনা পাতার নাম	নমুনা পাতার প্রসারিত চ্যাপটা অংশের আকার
1. ঝাউপাতা 2. বাঁশপাতা 3. জবাপাতা 4. পদ্মপাতা 5. ছাতিমপাতা	

উপরের প্রত্যেকটি গাছের পাতার যে প্রসারিত ও চ্যাপটা অংশের আকারের সঙ্গে তুমি পরিচিত হলে তাহল পাতার ফলক (Lamina)। আর পাতার গোড়ায় যে সরু ডাঁটির মতো থাকে সেটি পাতার বোঁটা। তবে সব গাছের পাতার বোঁটা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পাতার ফলক সরাসরি কাণ্ড থেকে বের হয়।

তুমি/তোমরা লেবু, ঘৃতকুমারী ও অশ্বত্থ গাছের পাতা সংগ্রহ করো।

এর মধ্যে -

a. কোন পাতার ফলক ছিঁড়লে মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়? ....।

b. কোন গাছের পাতার ফলক ছিঁড়লে টপটপ করে রস গড়িয়ে পড়ে? ....।

c. কোন গাছের পাতা চামড়ার মতো পুরু ? ....।

ওপরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এরকম আরও তিনটি পাতা খুঁজে বার করো।

ক্রমিক নং	মিষ্টি গন্ধের পাতা	রসালো পাতা	চামড়ার মতো পাতা
1.			
2.			
3.			

পাশের গাঁদা গাছের পাতার ধার খণ্ড খণ্ড। আর অশ্বত্থ গাছের পাতার ধার মসৃণ, কোনো খণ্ড নেই।

এরকম অখণ্ড বা খণ্ডিত ফলকপ্রান্ত যুক্ত দুটি করে পাতার নাম লেখো ....।

তোমরা প্রত্যেকে একটা করে জবা পাতা ও কলাপাতা নিয়ে আলোর দিকে ধরে দেখো তো এরকম দেখো তো পাচ্ছ কিনা —

(i) জবাপাতা — মাঝখানে একটা শিরা, এই শিরার দু-পাশ থেকে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে। শিরাগুলো সব মিলে একটা জালের মতো তৈরি করেছে।

(ii) কলাপাতা — মাঝখানে একটা শিরা, মাঝখানের শিরার দু-পাশ থেকে সমান্তরালভাবে অনেকগুলো শিরা বেরিয়েছে।

পরের পাতার ছবিগুলো লক্ষ করো। দেখো তো পত্রবৃন্ত কীভাবে কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে?

1. জবাগাছের পাতায় .... 2. আকন্দগাছের পাতায় .... 3. শালুকগাছের পাতায় ....

পাতার যে গঠনটি পত্রবৃন্তকে কান্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত করে তার নাম হলো পত্রমূল (Leaf base)।

জবাপাতার ছবিতে পাতার বিভিন্ন গঠনগত অংশ চিহ্নিত করো।
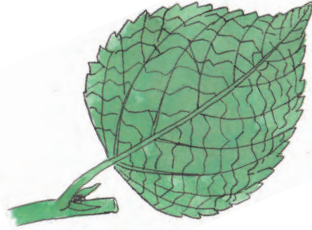
পাতার বিভিন্ন অংশ কী কী কাজ করে? নীচের সারণির বামদিকের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভের সাদৃশ্য বিধান করো:(একই অংশ একাধিক কাজ করতে পারে)

পাতার অংশ	কাজ
1. পত্রফলক	(a) খাদ্য প্রস্তুত করা।
2. পত্রবৃন্ত	(b) জল ও খাদ্য পরিবহণ করা।
3. পত্রমূল	(c) পত্রফলককে ধরে রাখা ।
	(d) গ্যাসের আদানপ্রদান করা।
	(e) পাতাকে কান্ড বা শাখার সঙ্গে যুক্ত করা।

নীচের ছবিগুলো লক্ষ করো এবং এই পাতাগুলো কোন কোন উদ্ভিদের?

1. ...., 2. ...., 3. ...., 4. ...., 5. ....

আগের পাতার পাতাগুলো খাদ্য তৈরি, বাষ্পমোচন, শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ছাড়াও অন্যান্য কাজ করে। ছবিগুলো দেখে বলো তো কোন পাতা কী কাজ করে? (কোনো কোনো পাতা একের বেশি কাজ করতে পারে।)

পাতার নাম	কাজ
1. মটরের পত্রাকর্ষ	(a) বংশবিস্তার করা।
2. ফণীমনসার পত্রকন্টক	(b) খাদ্য সঞ্চয় করা।
3. ঘৃতকুমারীর পাতা	(c) পতঙ্গের দেহস্থিত নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান সংগ্রহ করা।
4. পাথরকুচির পাতা	(d) আরোহণে সাহায্য করা।
5. কলশপত্রীর পাতা	(e) অতিরিক্ত বাষ্পমোচনে বাধা সৃষ্টি করা।

অশ্বত্থ পাতা একটি মাত্র ফলক দিয়ে গঠিত। ফলকের ধার সম্পূর্ণ অর্থাৎ এতে কোনো খণ্ড থাকে না । এই ধরনের পাতাকে একক পত্র (Simple leaf) বলে।

তেঁতুল পাতার ফলক মাঝখানের শিরা পর্যন্ত কতগুলো আলাদা আলাদা খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। এইধরনের পাতাকে যৌগিক পত্র (Compound leaf) বলে।

তোমার চারপাশে দেখা এরকম তিনটি করে একক ও যৌগিক পত্রের উদাহরণ দাও।

একক পত্রযুক্ত গাছের নাম	যৌগিক পত্রযুক্ত গাছের নাম
1.	1.
2.	2.
3.	3.

পাতা জীবজগতের কী কী কাজে লাগে? এসো দেখি :

1. গাছের পাতা কোন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে এবং কোন গ্যাস শোষণ করে?
2. মানুষের পক্ষে উপকারী পোকার নাম করো যারা গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়।
3. মানুষের পক্ষে এমন কতকগুলো অপকারী পোকার নাম করো যারা গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়।
4. হাতি, হরিণ, গোরু ও ছাগল কোন কোন গাছের পাতাকে খাবার হিসাবে খায়?
5. কোন গাছের পাতার শিরা বাড়ির ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করতে কাজে লাগে?
6. কোন কোন গাছের পাতার রস বা নির্যাস আমরা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করি?
7. কোন কোন গাছের পাতাকে মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে?
8. কোন কোন গাছের পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
9. কোন কোন জীব গাছের পাতায় ডিম পাড়ে?

10. ঘরের ছাউনি বা দেয়াল তৈরিতে কোন কোন গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়?
11. ঘর সাজানোর কাজে কোন কোন গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়?
12. কোন কোন প্রাণী কোন কোন পাতার আকৃতি বা রং-কে অনুকরণ করে বেঁচে থাকে?

এবার এক-একটা করে পাতা নাও। স্কেল দিয়ে মেপে দেখো, পাতাটা কতটা লম্বা, কতটা চওড়া। তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের অনুপাত হিসেব করো। তারপর যা পেলে, তা নীচের ছকটায় লেখো।

কী ধরনের গাছ	কোন গাছের পাতা	পাতার পরিমাপ		
		দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত
ছোটো গাছ				
1.				
2.				
মাঝারি গাছ				
1.				
2. বড়ো গাছ				
1.				
2.				

ফুল

নীচের ছবিটি ভালো করে দেখো। তোমরা রোজ যে যে ফুল দেখো তার কয়েকটা নীচে দেওয়া আছে। চিনতে পারো কিনা দেখো তো।
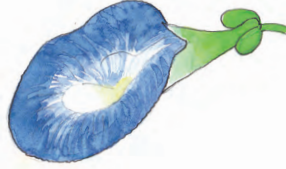
1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

এবার তুমি একটি জবাফুল নিয়ে দেখো কী কী দেখতে পাচ্ছ।

ফুলটি বাইরে থেকে ভেতরের দিকে কতকগুলো অংশ নিয়ে তৈরি। ওই অংশগুলোকে এক একটি স্তবক বলে।

1. ফুলের বোঁটার ঠিক ওপরে সবুজ রঙের একটা উলটানো ঘন্টার মতো অংশ আছে। যখন ছোটো কুঁড়ি থাকে তখন পুরো কুঁড়িটাই এটা দিয়ে ঢাকা থাকে। সবুজ ঘন্টাটা আসলে পাঁচটা ছোটো ছোটো পাতার মতো অংশ জুড়ে তৈরি। সবুজ ঘন্টার মতো এই অংশটাই ফুলের বৃতি (Calyx)। আর বৃতির প্রত্যেকটা অংশ হলো বৃত্যাংশ (Sepal)। এগুলো আলাদা থাকতে পারে আবার জুড়েও যেতে পারে।

2. বৃতির ভেতর থেকে দেখো পাঁচটা টকটকে লাল রঙের পাতলা কাগজের মতো বেরিয়েছে। এগুলো হলো পাপড়ি (Petal)। সমস্ত পাপড়ি বা দলগুলো জুড়ে তৈরি করে দলমণ্ডল (Corolla)। পাপড়িগুলো কখনো-কখনো নিজেরা জুড়ে গিয়ে বিভিন্ন আকার নেয়। কুমড়ো ফুলে এগুলো মিলে ঘন্টার মতো দেখতে হয়। আবার জবাফুলে এরা না জুড়েই থাকে। সাধারণভাবে ফুলের যে নানান রং দেখি তা এই পাপড়িরই রং। এদের সংখ্যা, রং ও গন্ধ নানা ফুলে নানারকম। এই রং আর গন্ধই বিভিন্ন রকম পোকা ও পাখিদের আকৃষ্ট করে।

3. তোমরা দেখো জবাফুলের ভেতর থেকে একটা কালচে লাল রঙের লম্বা সরু দড়ির মতো অংশ বেরিয়েছে। তার মাথায় পাঁচটি ভাগ। প্রতিটি অংশের ওপরটা ফুটকির মতো দেখতে। এই পাঁচ মাথাওয়ালা অংশটার একটু নীচে ওই সরু দড়িটার চারপাশে কিছুটা অংশে অনেকগুলো কিছু লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে। এবার ওগুলোর একটাকে খুব সাবধানে নিয়ে দেখো তো কী কী দেখতে পাচ্ছ? একটা সরু সুতো আর তার মাথায় ঠিক বাংলা পাঁচ (৫)-এর মতো দেখতে একটা থলি। এই থলির মতো অংশটাকে বলে পরাগধানী (Anther)। আর সরু সুতোর মতো অংশটা হলো পুংদণ্ড। ভালো করে লক্ষ করে দেখো ওই থলিটার মধ্যে হলুদ রঙের পাউডারের মতো আছে। এগুলো হলো পরাগরেণু (Pollen grain)। সরু সুতো আর তার মাথায় থাকা পরাগধানীকে একসঙ্গে বলে পুংকেশর (Stamen)। জবাফুলে দেখো অনেকগুলো পুংকেশর একসঙ্গে থাকে। এদেরকে একসঙ্গে পুংকেশর চক্র (Androecium) বলে।

4. এবার খুব ধীরে ধীরে ওই সরু লাল দড়িটার ওপরের পাঁচ মাথাওয়ালা অংশটা থেকে নীচের দিকে বাইরের লাল পাতলা অংশটা ছাড়িয়ে ফেলো। ভেতরে একটা সাদা অংশ দেখতে পাবে। এবার খুব মন দিয়ে দেখো সাদা অংশটার ভেতরে একটা খুব সরু সুতোর মতো আছে। এই সুতোটার মাথায় সেই পাঁচটা মাথা আর একেবারে নীচে খুব ছোটো অনেকটা ডিমের আকারের একটা অংশ। ওই ছোটো ডিমের আকারের অংশটা হলো গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় (Ovary)। আর এর মাথা থেকে যে সরু সুতোর মতো লম্বা অংশ বেরিয়েছে সেটি গর্ভডাঁটি বা গর্ভদণ্ড (Style)। এর মাথায় যে পাঁচটি ফুটকির মতো অংশ রয়েছে সেগুলোকে বলে গর্ভমুণ্ড (Stigma)।

গর্ভাশয়টাকে ফাটিয়ে দেখো অনেক ছোটো দানার মতো অংশ দেখতে পাবে। এগুলোকে বলে ডিম্বক (Ovule) । গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড আর গর্ভমুণ্ড — এদের একসঙ্গে বলে গর্ভকেশর (Carpel)। আর ফুলের সবকটা গর্ভকেশরকে একসঙ্গে বলে গর্ভকেশরচক্র (Gynoecium)। বিভিন্ন ফুল নিয়ে যদি তোমরা দেখো (মটর, বক, অপরাজিতা, কুমড়ো, জবা কিংবা ধুতুরা) তবে দেখতে পাবে সব ফুলের পুংকেশর বা গর্ভকেশর সংখ্যায় বা আকারে এক নয়।
পরাগধানীর মধ্যে যে পরাগ থাকে তা গর্ভমুণ্ডে পড়ে। তারপর ডিম্বকের সঙ্গে মিলিত হলে ডিম্বাশয় ফলে ও ডিম্বক বীজে পরিণত হয়।
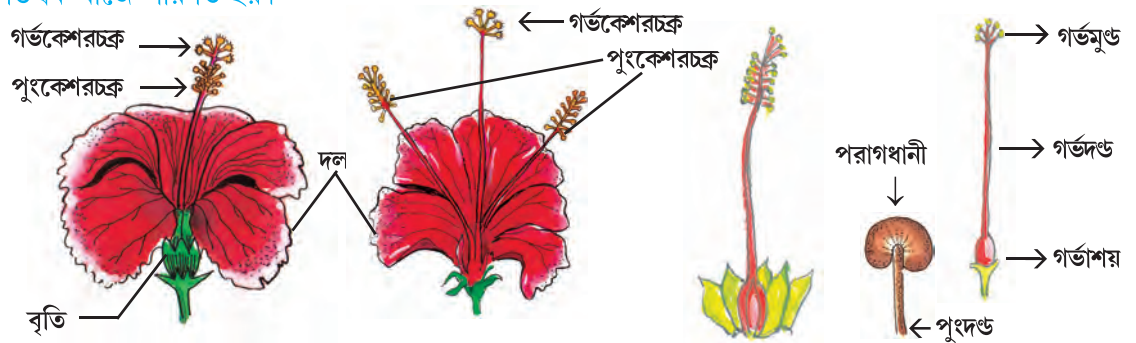
জবা ফুলের গঠনে প্রধান যে চারটি অংশ পাওয়া গেল তাদের নাম হলো:

1. 2. 3. 4.

এর মধ্যে, (a) কোনগুলি গাছের বংশবৃদ্ধিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে? ………………., ………………।

(b) কোনগুলি অন্যান্য স্তবকগুলোর কাজে সাহায্য করে? ………………, ………………।

ওপরে বিভিন্ন ফুল ও ফুলের অংশের ছবি দেওয়া আছে। ফুলগুলো জোগাড় করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

1. কোন ফুলের বৃতি বা দলমণ্ডলের অংশগুলোর আকৃতি বা গঠন সমান (মেপে দেখো)? ………..।
2. কোন ফুলের বৃতি বা দলমণ্ডলের অংশগুলো পরস্পর সমান নয়? …………………..।
3. কোন কোন ফুলে চারটি স্তবকই উপস্থিত? ……………………………………….।
4. কোন কোন ফুলে একটি বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত ? …………………………….।
5. কোন ফুলের কোন কোন স্তবক অনুপস্থিত ? ……………………………………………।

ফুল সম্পর্কে এসো আমরা আরও কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করি :

1. পাতার রং সবুজ কিন্তু ফুলের পাপড়ি রঙিন হয় কেন?
2. একই ফুলের পাপড়ির রং কি (উচ্চতা, দিন-রাত, ঋতুভেদে) বদলাতে পারে?
3. কোনো ফুলের পাপড়ির রং কোথাও লাল, কোথাও হলুদ, কোথাও বেগুনি বা কোথাও নীল হয় কেন?
4. ফুলের পাপড়িতে গন্ধ থাকলে গাছের কী সুবিধা হয়?
5. রাতে বা দিনে কোন কোন ফুল ফোটে?
6. কোনো ফুলের পরাগ কি কোনো প্রাণী খাদ্য হিসাবে খাদ্য গ্রহণ করে?
7. ফুলের পরাগ মানবদেহে প্রবেশ করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
8. ফুলের পাপড়ির রং- কে মানুষ কী কী কাজে ব্যবহার করে?
9. সূর্যের আলোর সঙ্গে ফুল ফোটার সম্পর্ক কী?
10. ফুলের কোন অংশটি থেকে ফল তৈরি হয়?

ফল

হরেক ফলের ঝুড়ি

তুমি তো নিশ্চয়ই নানারকমের ফল দেখেছ। তোমার চেনা কয়েকটি ফলের নাম লেখো যারা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত :

এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, আর পাকলে ভারি মিষ্টি।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, কিন্তু পাকলেও ভারি টক।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো খুব রসালো, আর পাকলে ভারি কষাটে।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, আর পাকলে ফল হিসেবেও খাওয়া যায়।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে খাওয়া হয়, কিন্তু পাকলে ফল হিসেবে খাওয়া যায় না।	
এমন দুটো ফল, যেগুলো রসালো নয়, কিন্তু খাওয়া হয়।	

ফলের একাল-সেকাল

তোমার বাবা, মা, দাদু বা দিদিমাকে জিজ্ঞেস করো তো, তাঁরা কে কী ফল খেতেন?	
দেখো তো, তাঁরা এমন কোন ফল খেতেন, যা তুমি খাওনি, অথবা যা এখন পাওয়া যায় না?	
না খেলে কেন খাওনি?	
না পাওয়া গেলে, কেন পাওয়া যায় না?	
তাঁরা যেসব ফল খেতেন, সেগুলো তখন যেমন দেখতে ছিল, এখন কি তেমনটিই আছে, নাকি অন্যরকম দেখতে হয়েছে?	
দেখো তো এমন কোন ফল তাঁরা খাননি, কিন্তু তুমি খেয়েছ?	
কেন এমন হলো?	

ফলের অন্দরমহল

এসো, ফলের ভেতরে কী আছে দেখি। তোমার লাগবে: একটা ছোটো কাঁচা আম আর একটা ছুরি।

কাজ	তোমার উত্তর
প্রথমে ছুরি দিয়ে আমটাকে লম্বালম্বি এমনভাবে কাটো যেন আঁটিটা কেটে না যায়। কাটার সময়ে ছুরিটাকে সাবধানে ব্যবহার করবে, যাতে হাত না কাটে। দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন। কাটতে গিয়ে ফলটাকে কেমন মনে হলো, শক্ত না নরম? কাটার সময়ে ফলটা থেকে কী বেরিয়েছে?	
এবার ফলটার কাটা পাশটা ভালো করে লক্ষ করো (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন।) ফলটার বাইরে থেকে ভেতরে কটা ভাগ দেখতে পাচ্ছ? ভাগগুলোর নাম লেখো।	
ফলের ঠিক মাঝখানটায় কী দেখতে পাচ্ছ?	
ফলের মাঝখানের অংশটা ছুরি দিয়ে খুব সাবধানে কেটে দেখার চেষ্টা করো ভেতরে কী আছে?	
কাটা ফলটা যেমন দেখছ, তেমন করে পাশের খোপে আঁকো। তারপর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।	

এবারে এসো, ফলটা কাটার পর ফলটার বাইরে থেকে ভেতরে যেতে পরপর যে পাঁচটা ভাগ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা লিখি ঃ

ভাগ	
1. প্রথম ভাগ	
2. দ্বিতীয় ভাগ	
3. তৃতীয় ভাগ	
4. চতুর্থ ভাগ	
5. পঞ্চম ভাগ	

একটি ফলের গঠন :

আম একটি বোঁটাযুক্ত রসালো ফল। একটি ফুল থেকে একটিমাত্র ফল গঠিত হয় বলে এটি একটি সরল ফল (Simple fruit)।

আমের গঠনে দুটি অংশ দেখা যায় — (a) পেরিকার্প বা ফলত্বক (b) বীজ।

(A) ফলত্বক - ডিম্বাশয়ের আবরণীত্বক থেকে ফলত্বক গঠিত হয়। ফলত্বকের তিনটি স্তর থাকে।

(i) বহিঃত্বক - পাতলা চামড়ার মতো। কাঁচা অবস্থায় এর রং সবুজ ও পাকলে এটি হলুদ বা লালাভ রং-এর হয়। এটিকেই আমরা খোসা বলে থাকি।

(ii) মধ্যত্বক - এটি রসালো ও শাঁসযুক্ত। আমের এই অংশই আমরা খেয়ে থাকি।

(iii) অন্তঃত্বক - এটি কঠিন। আমরা একে আঁটি বলি। এটি বীজকে ঢেকে রাখে। তাই বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় না।

(B) আমের বীজ দুটি বীজপত্র নিয়ে গঠিত।

- আমের মধ্যত্বক রসালো শাঁসযুক্ত। তাই আম .... ফল। (সরস/নীরস)
- আমের বীজে .... বীজপত্র থাকে। তাই আমগাছ .... উদ্ভিদ।

ফলের হরেকরকম

তোমরা এর মধ্যে আমের গঠন দেখেছ। আর কী কী রকম ফল হয়?

একটা করে আম, আতা, (পাকা) আর এঁচোড় (ছোটো মতো) জোগাড় করো। এবার এসো এদের মিলিয়ে দেখি :

	আম	আতা	এঁচোড়
ফলটাকে একটু জোরে চাপ দিয়ে দেখো, কী হয়			
ফলটাকে কেটে ভেতর দেখো, কতগুলো বীজ দেখতে পাচ্ছ			

কোন ফলটায় দেখেছ লেখো :

ফলের বর্ণনা	ফলের নাম	ফলের প্রকৃতি	আরো উদাহরণ
একটা বোঁটা, তার ওপরে একটামাত্র অংশ, আর তাতে একটা বীজ।	আম	এই রকম ফলকে সরল ফল বলা হয়।	
একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ, অংশ গুলো আলাদা করা যায়, আর প্রতিটি অংশে একটা করে বীজ।	আতা	এই রকম ফলকে গুচ্ছিত ফল বলে। বলোতো, এক থোকা আঙুর কী এই ধরনের ফল? হলে, কেন? না হলেই বা কেন?	
একটা বোঁটা, তার ওপরে অনেকগুলো অংশ, অংশ গুলো আলাদা করা যায় না, আর প্রতিটি অংশে একটা করে বীজ ।	এঁচোড়	এই রকম ফলকে যৌগিক ফল বলে।	

ফলটা এল কোথা থেকে?

তোমরা দেখেছ, ফুল থেকে ফল হয়। ফুলের কোন অংশটা থেকে ফল হয়? এসো দেখি। তোমার লাগবে একটা সিম, বক বা অপরাজিতা ফুল, আর তার একটা ফল। আর ফুল কাটার জন্য লাগবে একটা আলপিন।

আগে মনে করে লেখত, ফুলের অংশগুলো কী কী?

এবার আস্তে আস্তে ফুলের অংশগুলো আলাদা করো। তারপর ফলটাকে এক-একটা অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, কোনটার সঙ্গে ফলটার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি।

তোমার খাতায় এক একটা ঘরে ফুলের এক-একটা অংশের ছবি আঁকো	এবার ফুলের যে অংশটার সঙ্গে ফলের মিল সবচেয়ে বেশি তার পাশের খোপে ফলটার ছবি আঁকো

তাহলে ফুলের কোন অংশটি থেকে ফল তৈরি হয়? ....।

বীজ

নানা উদাহরণ

তোমার জানা যতগুলো পারো বীজের নাম লেখো। বীজগুলোর কোনটা কেমন দেখতে, আর কী কাজে লাগে তা লেখো আর ছবি এঁকে দেখাও।

বীজের নাম	কেমন দেখতে	কী কাজে লাগে	ছবি

ধান, মুগ ডাল, মুসুরি ডাল, কলাইয়ের ডাল, গোলমরিচ আর জিরে বা ধনে দিয়ে কাগজের ওপরে ছবি আঁকতে পারবে? বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে করো তো।

ধানের গান জানো? ধানের কোনো কবিতা পড়েছ? সবাই মিলে শোনো।

বীজের ভেতরে কী আছে

চলো, বীজের ভেতরে কী আছে দেখি। তোমার লাগবে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা মটর বীজ, বীজটা কাটার জন্য একটা আলপিন, আর একটা সাদা কাগজ।

প্রথমে গোটা বীজটা ভালো করে দেখো আর নীচের ছকে লেখো।

বীজটার আকৃতি কেমন?	
বীজটার রং কেমন?	
বীজটার ওপরে কোনো বিশেষ দাগ, ফুটো বা অন্য কিছু আছে কিনা? থাকলে তা কেমন দেখতে? ওই অংশ বা অংশগুলোর কাজ কী হতে পারে?	

এবার বীজটা কেটে দেখি (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন।):

আলপিন দিয়ে বীজের ওপরের আবরণীটি আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে ফেলো। আবরণীটির নাম কী? এটির কটি স্তর আছে?	
আবরণীটির ভিতরের অংশটি সরিয়ে রেখো। এবার আবরণীটিকে সাদা কাগজটির ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার ছবি আঁকো। শেষে আবরণীটি কেমন দেখতে নীচে লেখো।	
তারপর আবরণীটির ভিতরের অংশটি দেখো। এর নাম কী?	
এটিকে সাবধানে সামান্য চাপ দাও; এটি কটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	
তারপরে এটিকে কাগজের ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার একটা ছবি এঁকে চিহ্নিত করো। এবার এটি কেমন দেখতে অল্প কথায় লেখো।	

তাহলে বীজের সম্পর্কে কী কী জানলাম?

প্রথমে, বাইরের আবরণীটি:	
(a) এর নাম কী?	বীজত্বক
(b) এর রং কী?	সবুজ কিংবা হলুদ
(c) এর কটা স্তর?	দুটো
(d) স্তরগুলোর নাম কী কী?	বহিঃত্বক (Testa), অন্তঃত্বক (Tegmen)
(e) এর কাজ কী হতে পারে?	ভ্রূণসহ বীজের সমস্ত অংশকে রক্ষা করা
(f) এর ওপরে কী কী দাগ বা ফুটো দেখেছ?	দাগ- ডিম্বকনাভি (Hilum), ছিদ্র—ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle)
(g) তাদের কাজ কী কী?	অঙ্কুরোদগমের সময় ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ভ্রূণমূলবেরিয়ে আসে।

তারপরে ভেতরের অংশ :

(a) এর নাম কী?	অন্তর্বীজ বা ভ্রূণ (Kernel)
(b) এর রং কী?	
(c) এর আকৃতি কেমন?	
(d) একে চাপ দিলে কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
(e) ভাগগুলোর নাম কী?	বীজপত্র (Cotyledon)
(f) ভাগগুলোর আকৃতি কেমন?	
(g) ভাগগুলো অত মোটা কেন?	
(h) তাদের কাজ কী হতে পারে?	
(i) ভাগগুলো কোন অংশ দিয়ে একসঙ্গে আটকানো থাকে?	একটি ছোটো কবজার মতো বাঁকানো দণ্ড দিয়ে আটকানো থাকে।
(j) এই অংশটার নাম কী?	ভ্রূণাক্ষ (Tigellum)
(k) এই অংশটার ওপরের আর নীচের প্রান্ত দুটোকে কী বলে?	ভ্রূণমুকুল (Plumule) ভ্রূণমূল (Radicle)
(l) এই অংশটার মাঝখানে যেখানে বীজের ভাগগুলো আটকানো আছে, সেই জায়গাটার নাম কী?	পর্বসন্ধি (Nodal zone)
(m) পর্বসন্ধির ওপর ও নীচের অংশকে কী বলে?	ওপরের অংশ — বীজপত্রাধিকাণ্ড (Epicotyl) নীচের অংশ — বীজপত্রাবকাণ্ড (Hypocotyl)

তাহলে বীজটা থেকে গাছ জন্মায় কী করে?

এবার তোমার লাগবে একটা ভেজানো মটর বীজের খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশটা, একটা অঙ্কুরিত মটর বীজের (যার থেকে একটা মোটামুটি বড়ো চারাগাছ জন্মেছে) খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশটা, আর একটা ছোটো চারাগাছ।

আগে মনে করে নাও, বীজের খোসা ছাড়ানো ভেতরের অংশ কোনটার কী নাম?

(1) (2) (3) (4)

ভেজানো বীজের ভেতরের অংশটার ভাগগুলো সাবধানে আলগা করো, কিন্তু সেগুলো যেন মাঝখানে লেগে থাকে। এর খোলা দিকটা ওপরে করে সামনে রাখো। তারপরে চারাগাছটা তার পাশে রাখো। এবার মিলিয়ে দেখো তো, চারাগাছের কোন অংশের সঙ্গে বীজটার কোন অংশের মিল বেশি?

চারাগাছ	বীজ
মূল	
কাণ্ড	
পাতা	
	ভেজানো মটর বীজের ভেতরের অংশটা আর অঙ্কুরিত মটর বীজের ভেতরের অংশটা তুলনা করো; কী তফাত দেখেছ? কেন এই তফাত?

বীজের ভেতরে ছোট্ট গাছটা কোথায় আছে নীচে একটা ছবি এঁকে দেখাও। ছবিটা চিহ্নিত করো। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)

তাহলে এবার বীজের বিভিন্ন অংশের কাজ লেখো:

1. বীজত্বক	
2. ভ্রূণ	
3. বীজপত্র	
4. ভ্রূণমুকুল	
5. ভ্রূণমূল	

বীজ তৈরি হয় কোথা থেকে? ফুলের কোন অংশ থেকে?

এটা জানি, যে বীজ থাকে ফলের ভেতরে। মনে করে দেখো, ফল তৈরি হয় ফুলের কোন অংশ থেকে?

এবারে দেখি, ফুলের কোন অংশ থেকে বীজ তৈরি হয়। তোমার দরকার হবে একটা সাদা কাগজ, একটা সিম, মটর অথবা অপরাজিতা ফুল, তার একটা ফল, আর কাটবার জন্য একটা ব্লেড। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)।

ব্লেড সাবধানে ব্যবহার করবে, হাত যেন না কাটে।

ফুলের বৃতি, পাপড়িগুলো আর পুংকেশরগুলো সাবধানে কেটে ফেলো। তারপর গর্ভাশয়টি লম্বালম্বি কাটো। কাটা ফলটাকে একইভাবে কাগজের ওপরে গর্ভাশয়টির পাশে রাখো। এবার দুটিকে মিলিয়ে দেখো। গর্ভকেশরচক্রটির কোন অংশের সঙ্গে ফলের বীজটির মিল দেখতে পাচ্ছ?

তোমার খাতায় নীচের ছকের মতো পাশাপাশি ছবি আঁকো আর লেবেল করো।

কাটা গর্ভাশয়	
কাটা ফল	

এবার দুটি পাশ মেলাও:

গর্ভাশয়	বীজ
ডিম্বক	ফল

ফুলের কোন অংশ থেকে বীজ তৈরি হয়? ....

আমরা মটর বীজের গঠন জেনেছি। সব বীজের গঠনই কী একইরকম? এসো অন্য কোনো একটা বীজের গঠন দেখি। এবারে তোমার লাগবে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা ভুট্টা বীজ, বীজটা কাটার জন্য একটা আলপিন আর একটা ব্লেড, আর একটা সাদা কাগজ।

ব্লেড সাবধানে ব্যবহার করবে, হাত যেন না কাটে।

এবার মটর বীজের গঠন যেভাবে দেখেছিলে, সেই একইরকমে ভুট্টা বীজটার গঠন পরীক্ষা করে দেখো। (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় সাহায্য করবেন)

আলপিন দিয়ে বীজের ওপরের আবরণীটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে ফেলো। আবরণীটার নাম কী? এটির কটা স্তর আছে?	
আবরণীটার ভেতরের অংশটি সরিয়ে রাখো। এবার আবরণীটাকে সাদা কাগজটার ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার ছবি আঁকো।	

তারপর আবরণীটার ভেতরের অংশটি দেখো। এর নাম কী?	
এটিকে সাবধানে সামান্য চাপ দাও; এটি কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	
বীজটাকে দাঁড় করিয়ে সাবধানে ব্লেড দিয়ে সাবধানে লম্বালম্বি কাটো। বীজের ভেতরে কোথায় ছোটো গাছটা রয়েছে দেখো। (দরকারে শিক্ষক/ শিক্ষিকা তোমায় চিনিয়ে দেবেন।) ছোটো গাছটার নাম লেখো।	
বীজের ভেতরে ছোটো গাছটা ছাড়া বাকি অংশে কী রয়েছে?	
এটার কাজ কী?	
তারপরে এটাকে কাগজটির ওপরে রাখো, আর পাশের ছকে তার একটা ছবি এঁকে চিহ্নিত করো। এবার এটা কেমন দেখতে অল্প কথায় লেখো।	

এবার দেখি বীজটার গঠন সম্পর্কে কী কী জানলাম?

সম্পূর্ণ ভুট্টাবীজ

লম্বালম্বিভাবে কাটা ভুট্টাবীজ
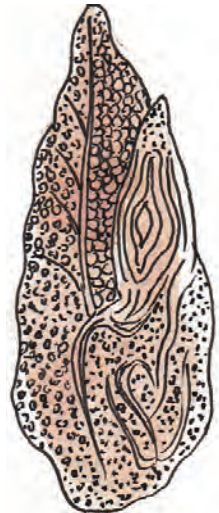
অন্তর্বীজ

প্রথমে বাইরের আবরণী:

(ক) এর নাম কী?	সংযুক্ত ফলত্বক ও বীজত্বক (United pericarp and seed coat)
(খ) এর রং কী?	
(গ) এর কটা স্তর?	দুটি স্তর; যদিও স্তর দুটিকে আলাদা করা যায় না।
(ঘ) স্তরগুলোর নাম কী কী?	ফলত্বক ও বীজত্বক
(ঙ) এর কাজ কী হতে পারে?	

তারপর ভেতরের অংশটি :

(ক) এর নাম কী?	শাঁস বা অন্তর্বীজ
(খ) এর রং কী	
(গ) এর আকৃতি কেমন?	
(ঘ) একে চাপ দিলে কটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়?	দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় - সস্য ও ভ্রূণ
(ঙ) বীজের ভেতরে কোথায় ছোটো গাছটা রয়েছে?	ভ্রূণে
(চ) গাছটির অংশগুলো কী কী?	বীজপত্র (স্কুটেলাম) ও ভ্রূণাক্ষ
(ছ) ছোটো গাছটার পাতা কটা?	একটা
(জ) ছোটো গাছটার মূল কী দিয়ে ঢাকা?	ভ্রূণমূলাবরণী বা কোলিওরাইজা
(ঝ) ছোটো গাছটার কাণ্ড কী দিয়ে ঢাকা?	ভ্রূণমুকুলাবরণী বা কোলিওপটাইল
(ঞ) গাছটার খাদ্য কোথায় রয়েছে?	সস্যে
(ট) ছোটো গাছটা আর তার খাদ্যের মাঝখানে কী রয়েছে?	এপিথেলিয়াম স্তর

দেখো তো মটর বীজ আর ভুট্টা বীজ, দুইটি বীজের মধ্যে কী কী মিল রয়েছে?

	মটর বীজ	ভুট্টা বীজ
বীজটার বাইরে কোনো আবরণ আছে কী?		
বীজটার ভেতরে ছোট্ট চারাগাছ আছে কী?		
বীজের ভেতরে ছোট্ট চারাগাছটির খাবার রয়েছে তো?		
ছোট্ট চারাগাছটির দেহে কী কী অংশ রয়েছে?		

দুটো বীজের সবটাই কী মিল, নাকি কিছু অমিলও আছে? দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

	মটর বীজ	ভুট্টা বীজ
বীজটার আবরণ কী কী স্তর দিয়ে তৈরি?		
আবরণের ভেতরে ছোটো চারাগাছটা ছাড়া আর কী অংশ রয়েছে?		
ওই অংশটার কাজ কী?		
ছোটো চারাগাছটার মূল কী দিয়ে ঢাকা?		
ছোটো চারাগাছটার কাণ্ড কী দিয়ে ঢাকা?		
ছোটো চারাগাছটার বীজপত্র কটা?		
ছোটো চারাগাছটার খাদ্য কোথায় রয়েছে?		

এবার তাহলে বীজগুলো কত রকমের তা ঠিক করি। কটা বীজপত্র রয়েছে তা দেখে বীজের নাম দেব।

• মটর বীজটার বীজপত্র কটা? • তাহলে মটর বীজটাকে কী বলব? • ভুট্টাবীজে কটা বীজপত্র রয়েছে? • তাহলে ভুট্টা বীজটাকে কী বলব? • তোমার জানা মটর বীজের মতো আর কয়েকটা বীজের নাম লেখো। • ভুট্টা বীজের মতো আর কয়েকটা বীজের নাম লেখো।	

পরাগমিলন ও সমস্যা

নীচের প্রাণীগুলোর দিকে তাকাও। তুমি কি এদের কখনও ফুলের ওপর বসতে দেখেছ বা পরাগ ছুঁতে দেখেছ?

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....

- আগের পাতার প্রাণীগুলো ফুলের কী সংগ্রহ করে?
- এই কাজে গাছগুলোর কী উপকার হয়?

তোমরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে/ বিদ্যালয়ের বাগানে/ বা অন্য কোনো পরিচিত বাগানে ওপরের প্রাণীগুলোর সঙ্গে কোন কোন ফুলের পরাগের সংযোগ ঘটতে পারে তার সারণি তৈরি করো।

প্রাণীর নাম	ফুলের নাম
1. প্রজাপতি	(a) উচ্ছে, কুমড়ো, ..., ...,
2. বাদুড়	(b) কদম, কাঞ্চন, কলা, ...,
3. শামুক	(c) কচু, ওল, ...,
4. পিঁপড়ে	(d) লিচু, ...,
5. মৌমাছি	(e) রাস্না, সরষে, নিম, খলসি, ...,
6. পাখি	(f) বিগোনিয়া, পলাশ, শিমুল, ...,

এই প্রাণীগুলো যে যে কাজ করতে পারে —

- একটি ফুলের থেকে পরাগরেণু সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।
- একটি ফুলের থেকে পরাগরেণু সেই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।
- একই ফুলের থেকে পরাগরেণু ওই ধরনের অন্য গাছের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করে।

কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন ওই ফুলে অথবা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে স্বপরাগযোগ (Self pollination) বলে।

- কোনো ফুলের পরাগরেণু যখন একইরকম অন্য উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে বা স্থানান্তরিত হয় তখন ওই ঘটনাকে ইতরপরাগযোগ (Cross pollination) বলে।
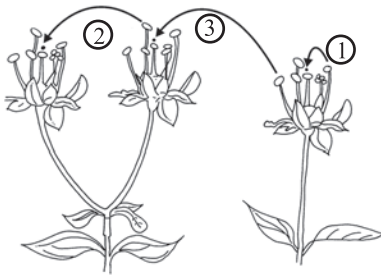
① স্বপরাগযোগ
② স্বপরাগযোগ
③ ইতরপরাগযোগ

ওপরের ছবিগুলো দেখো। এবার বলো -

1. কোন গাছের ফুলে একই সঙ্গে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে?

2. কোন গাছের ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর আলাদা ফুলে থাকে?

ওপরের গাছ দুটির মধ্যে কোনটিতে স্বপরাগযোগ অথবা ইতরপরাগযোগ ঘটে তার নাম লেখো।

a) স্বপরাগযোগ হয় যে ফুলে

b) ইতরপরাগযোগ হয় যে ফুলে

শিয়ালকাঁটা, শিমুল, দোপাটি, অপরাজিতা, সূর্যমুখী, চাঁপা, সন্ধ্যামালতী, আকন্দ, পদ্ম, কদম, কুমড়ো, জুঁই, সরষে ও মুসান্ডা- এই ফুলগুলোর মধ্যে কোনগুলোতে স্বপরাগযোগ বা ইতরপরাগযোগ ঘটে তা নিজেরা আলোচনা করে বা শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্যে নির্দিষ্ট সারণিভুক্ত করো।

স্বপরাগী ফুল	ইতরপরাগী ফুল
শিয়ালকাঁটা, দোপাটি ......, ...,	চাঁপা, ..., ..., আকন্দ, জুঁই, ..., মুসান্ডা, সন্ধ্যামালতী, ..., ..., ..., ...,

পরাগমিলনে সমস্যা

পোকামারার ওষুধ ব্যবহার	গাছপালা ধ্বংস	পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি	পরিবেশের উষ্ণতা হ্রাস

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে পরাগযোগের সমস্যা সম্পর্কে জানো।

1. বেশি পোকামারার ওষুধ ব্যবহারের ফলে মৌমাছির মতো পতঙ্গের অভাবে পরাগযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

2. উষ্ণতার তারতম্যের জন্য ফুল ফোটার সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। এর জন্যও পরাগযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

3. শিমুল জাতীয় গাছ কেটে ফেলার ফলে বাদুড়ের মতো পরাগযোগের বাহকের বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। এরজন্য পরাগযোগ ব্যাহত হতে পারে।

তোমার অঞ্চলে কোন কোন গাছের পরাগমিলনে সমস্যা হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষকদের বা আনাজ ব্যবসায়ীদের সাহায্য নাও।

1. পটোল
2.
3.
4.

ব্যাপন

হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখো:

1. একটা বড়ো ঘরের এক কোণে ধূপ জ্বালানোর পর পরই ধূপের কাছাকাছি জায়গায় যতটা সুগন্ধ পাওয়া যায় ঘরের দূরের কোণে কী তক্ষুণি ততটা গাঢ় গন্ধ পাওয়া যায়? তোমরা দেখেছ তা যায় না। ধূপ জ্বালানোর পর থেকে ধরলে সারা ঘরে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়তে একটু সময় লাগে, অন্তত কয়েক সেকেন্ড। ধূপ জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে দেখো। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রেখো, পাখা চালিও না।

2. একটা কাচের গ্লাসে জল নাও। জলের মধ্যে সাবধানে একফোঁটা লাল বা নীল কালি ফেলে পাশ থেকে তাকিয়ে দেখো। দেখবে রঙটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কালির ফোঁটা ফেলার পর রংটা সবজায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ লাগছে? আধঘণ্টা? একঘণ্টা? এক ঘণ্টারও বেশি? (এই পরীক্ষা করার সময় গ্লাসটাকে নাড়ানো/জলে ফুঁ দেওয়া/চামচ ডোবানো এসব করা চলবে **না**)।

যে দুটো পরীক্ষা করলে তাতে এই হাওয়ায় সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়া আর দ্রবণে কালির রং ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে একটা মিল আর একটা অমিল নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। সেগুলো কী?

মিল : গন্ধ বা রং বেশি গাঢ় অংশ থেকে কম গাঢ় অংশে ছড়িয়ে পড়ছে; **অমিল :** গ্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা ঘটছে অনেক তাড়াতাড়ি, দ্রবণে অনেক ধীরে।

অণুদের অবিশ্রান্ত গতির জন্য গ্যাসীয় অবস্থায় বা দ্রবণে এই বেশি গাঢ়ত্বের অংশ থেকে কম গাঢ়ত্বের অংশে পদার্থের অণুদের ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে বলা হয় ব্যাপন বা ডিফিউশন (Diffusion)। ওপরের উদাহরণে সুগন্ধি বা কালির রং হলো সেইসব পদার্থ যাদের অণুদের ব্যাপন ঘটছে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন যে :

- একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় অবস্থার চেয়ে দ্রবণে ব্যাপন ঘটে ধীরে।
- একই উষ্ণতায়, একই মাধ্যমে হালকা অণুদের চেয়ে ভারী অণুদের ব্যাপন ঘটে ধীরে।
- তাপমাত্রা বাড়লে ব্যাপন ঘটে তাড়াতাড়ি।

ব্যাপনের আণবিক 'ছবি' :

পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা হলো কঠিন, তরল আর গ্যাস। এইসব অবস্থায় যে অণুরা থাকে সেকথা আমরা একটু একটু জেনেছি। পরীক্ষা করে ব্যাপনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও আমরা লক্ষ করেছি। এই দুটোকে মিলিয়ে এবার আমরা জানতে চাইব ব্যাপনের আণবিক 'ছবি'টা কীরকম। এটা বুঝতে পাশের পাতার ছবিগুলো দেখো : এখানে জলের মধ্যে গাঢ় চিনির দ্রবণ মেশাবার পর থেকে কীভাবে চিনির অণুরা জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা দেখানো হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য দ্রবণের অংশটাকে তিনটে সমানভাগে ভাগ করা হলো।
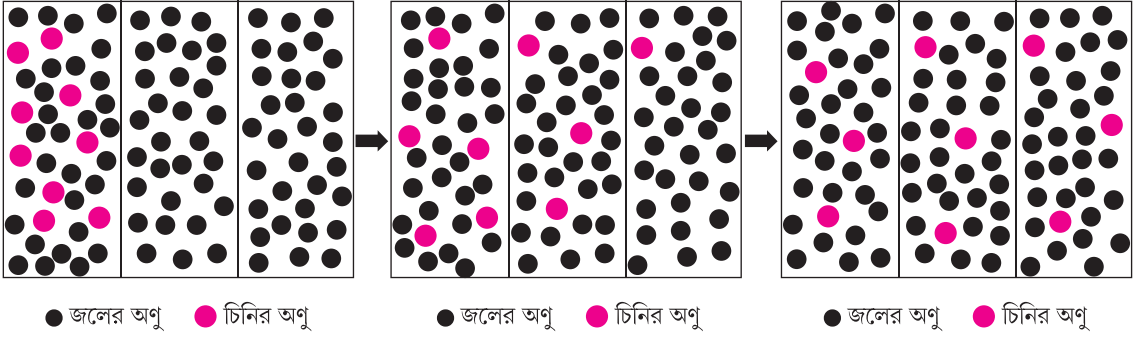
ব্যাপন সবে শুরু হচ্ছে : বাঁদিকে চিনির অণুর সংখ্যা ডানদিকের চেয়ে অনেক বেশি।

কিছুক্ষণ পর : ব্যাপনের ফলে চিনির অণুরা দ্রবণের মধ্যে কিছু দূর ছড়িয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ ব্যাপনের পর : চিনির অণুরা দ্রবণের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে এবং জীবজগতের অন্যত্র অণুদের ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণ :

- **পেঁয়াজ কাটার সময় চোখ জ্বালা করে;**
- **ফল কাটলে ছোটো ছোটো মাছিরা এসে ভিড় করে;**
- **ফুল ফুটলে মৌমাছিরা উড়ে আসে;**
- **ফল ধরলে রাত্রে বাদুড়রা ফল খেতে উড়ে আসে।**

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে উদবায়ী (যা সহজে বাষ্পীভূত হয়, Volatile) যৌগগুলো বাষ্পীভূত হয়। এইসব যৌগের অণুরা বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই অণুরা খুব কম পরিমাণে থাকলেও প্রাণীদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশেষ কিছু প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে মস্তিষ্কে গন্ধের অনুভূতি জাগে। **বাতাস বইলে গন্ধের যৌগের অণুগুলো আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে।** বিভিন্ন প্রাণীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা বিভিন্ন রকমের হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে ফল কাটলে একরকম ছোটো ছোটো মাছিরা উড়ে আসে। আবার সন্ধেবেলায় মানুষকে কামড়াতে যে অ্যানোফিলিস মশকীরা আসে তারা কিন্তু ফল কাটলে উড়ে আসে না। কেন এরকম হয় জানো?

ফল কাটলে যেসব ছোটো ছোটো মাছি উড়ে আসে তারা হলো ড্রসোফিলা। আবার অ্যানোফিলিস মশকী হলো ম্যালেরিয়ার বাহক। **এদের ‘গন্ধ ধরার’ প্রোটিনগুলোয় তফাত আছে** — ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য যেসব উদবায়ী যৌগ দায়ী তাদের অ্যানোফিলিস চিনতে পারে না, ড্রসোফিলা মাছিরা পারে। আবার, মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধে যেসব উদবায়ী যৌগ থাকে সেগুলোকে অ্যানোফিলিস মশকী চিনে নিতে পারে। তাই সন্ধেবেলায় তারা রক্তপানের উদ্দেশ্যে সেই ধরনের উৎসের দিকে উড়ে আসে।

- **সাপ কেন প্রায়ই জিভ বার করে জানো?**

বিভিন্ন প্রাণীর দেহ থেকে নানান উদবায়ী যৌগের অণু বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাপের জিভে সেইসব যৌগের অণুরা আটকে যায়। তারপর সাপ মুখের মধ্যে জিভটা ঢুকিয়ে নিয়ে উপরের তালুতে ঠেকায়। সেখানে থাকে একটি বিশেষ অঙ্গ। একে বলা হয় জেকবসন অরগ্যান (Jacobson Organ)। সাপ যখন জিভটা সেখানে ঠেকায় তখন সেই গন্ধের অণুগুলো মস্তিষ্কে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সেই থেকে সাপ চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে পারে।

● ফেরোমোন (Pheromone)

জীবজগতে পোকামাকড়, হাতি, বাঘসহ অন্যান্য তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীদের প্রজননে বিভিন্ন ধরনের উদবায়ী রাসায়নিক পদার্থের (ফেরোমোন) গুরুত্ব অপরিসীম। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কিছু প্রজাতির পুরুষ মথেরা স্ত্রী মথের দেহনিঃসৃত ফেরোমোনের গন্ধে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও উড়ে এসে হাজির হয়। এত কম সংখ্যক অণু থাকলেও পুরুষ মথ তা এত দূর থেকে ধরতে এবং চিনে নিতে পারে যে তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।

এবার ভেবে বলো তো :

- খোলা হাওয়ায় বিষাক্ত অনুদবায়ী তরল বা কঠিনের চেয়ে বিষাক্ত উদবায়ী তরল বেশি বিপজ্জনক কেন?
- অজ্ঞান করার জন্য চেতনানাশক পদার্থগুলো গ্যাস রূপে প্রশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কেন?
- যক্ষ্মার জীবাণু মানুষের দেহে নানা অঙ্গে (ফুসফুস, হাড়, অন্ত্র, বৃক্ক) বাসা বাঁধে। ধরো, দুজন যক্ষ্মারোগী আছেন — একজনের দেহে জীবাণু বাসা বেঁধেছে শুধু পিঠের হাড়ের মধ্যে, অন্যজনের ফুসফুসে। কোন রোগীর দেহ থেকে যক্ষ্মা ছড়াবার সম্ভাবনা বেশি? (ইঙ্গিত : ফুসফুসে যক্ষ্মা হলে কাশি হয়।)

দৈনন্দিন জীবনে সাবধানতা :

- বাড়িতে গ্যাস লিক করলে দরজা জানালা খুলে দিয়ে হাওয়া চলাচল করতে দিতে হয়। কোনো আগুন জ্বালাতে নেই। সুইচ জ্বালানো-নেভানোও চলবে না। অবিশ্রান্ত গতির ফলে গ্যাসের অণুগুলো এখন ঘরের মধ্যে বেশ কিছু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য স্ফুলিঙ্গেও গ্যাসে আগুন ধরে যেতে পারে এবং বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
- বন্ধ নর্দমা বা সেপটিক ট্যাঙ্কে বিষাক্ত গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S) জমে থাকে। তাই সেখানে নামলে প্রশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে ঢোকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটায়। বহুক্ষণ খোলা রাখলে কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে গেলেও তা নিরাপদ হয় না। এর কারণ হলো H_2S গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী বলে গ্যাস অণুদের ছড়িয়ে পড়াটা ঘটে অপেক্ষাকৃত ধীরে।

হাতেকলমে নীচের পরীক্ষাগুলো করে দেখো :

(i) দুটো একই রকমের গ্লাসে একই পরিমাণ জল নিয়ে এক‌ফোঁটা করে কালি ফেলে দাও। এবার একটাকে চামচ দিয়ে নাড়ো, অন্যটা স্থির থাকুক। কোনক্ষেত্রে জলে কালির মিশে যাওয়াটা বেশি তাড়াতাড়ি ঘটছে?

(ii) ধূপ জ্বালিয়ে ঘরের পাখা চালিয়ে দাও কিংবা ঘরের জানালা-দরজা খুলে দাও। দেখো গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে পাখা না-চালানোর অবস্থার চেয়ে কম সময় লাগল কিনা।

(iii) দুটো একই রকমের গ্লাসে সমান পরিমাণ জল নিতে হবে : একটায় সাধারণ উষ্ণতার জল, আরেকটায় বেশ গরম জল। এবারে দুটোতেই এক‌ফোঁটা কালি ফেলে লক্ষ করো কোনটায় কালি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে।

নীচের ছকে তোমার পরীক্ষার ফলাফল লেখো :

প্রথমবারের পরীক্ষা	দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা	কখন কম আর কখন বেশি সময় লাগল
পাখা না চালিয়ে ধূপ জ্বালানো হলো	ধূপ জ্বালিয়ে পাখা চালানো হলো	
জল না নাড়িয়ে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	কালির ফোঁটা ফেলে জল নাড়ানো হলো	
ঠান্ডা জলে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	গরম জলে কালির ফোঁটা ফেলা হলো	

অভিস্রবণ

পট্যাটো চিপস কী করে তৈরি করে জানো? আলুকে পাতলা, গোল চাকতি করে কেটে নুনজলে ভিজিয়ে রাখা হয় দু-তিন ঘন্টা। এতে কী হয় বলো তো? নুনজলে রাখলে আলুর টুকরোগুলো থেকে জল বেরিয়ে যেতে থাকে :

তোমার মা কিছু কিশমিশ ভিজিয়ে রেখেছিলেন। ঘন্টাকয়েক পর তুমি দেখলে কিশমিশগুলো জল শুষে ফুলে উঠেছে :

ওপরের ঘটনা দুটো পরস্পরের ঠিক উলটো : প্রথম ক্ষেত্রে বাইরে নুনের গাঢ়ত্ব বেশি ছিল তাই আলু থেকে জল বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিশমিশের মধ্যের দ্রবণটা গাঢ় ছিল তাই জলে ডোবাতে কিশমিশ জল শুষে নিয়েছে।

দুটো ক্ষেত্রেই কোশের পর্দার মধ্যে দিয়ে জল ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। গ্যাস বা তরলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন যৌগের অণুর ব্যাপনের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এখানে জীবন্ত কোশের পর্দার মধ্যে দিয়ে ব্যাপন ঘটছে। কোশপর্দাকে আমরা প্রাথমিকভাবে অর্ধভেদ্য বলতে পারি কারণ এর মধ্যে দিয়ে জল অণুরা যেতে-আসতে পারলেও সব অণু আর আয়নরা পারে না। কোনো কোনো অণু বা আয়ন চলাচল করতে পারে বলে একে বিভেদমূলক ভেদ্য পর্দাও বলা যেতে পারে।

অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে দ্রবণে দ্রাবকের অণুদের যাওয়া-আসার ঘটনাকে বলে অভিস্রবণ বা অসমোসিস (Osmosis)। জীবকোশ ছাড়া কী অন্য কোথাও অভিস্রবণ হয় না? নির্জীব পরিবেশে তো অভিস্রবণের জন্য কোশপর্দা নেই? কৃত্রিম অর্ধভেদ্য পর্দা সেলুলোজ অ্যাসিটেট দিয়েও তৈরি করা যায়। ভেড়া, ছাগল, বাছুর ইত্যাদি প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি পার্চমেন্ট হলো প্রকৃতিজাত অর্ধভেদ্য পর্দা।

এবার আমরা একটা ছবি দেখি। একটা দু-মুখ খোলা ইউ (U) আকৃতির নলের মাঝখানে একটা অর্ধভেদ্য প্রাচীর বা পর্দা আছে। বাঁদিকে 'A' অংশে আছে গাঢ় চিনির দ্রবণ, ডানদিকে 'B' অংশে আছে বিশুদ্ধ জল। **অর্ধভেদ্য পর্দাটা এমনই যে জলের অণুরা পারলেও চিনির অণুরা তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না।** আগে নুনজলে ভেজানো আলুর টুকরোর কী হয় তা তোমরা জেনেছ। তা থেকে বলো : পর্দার কোন দিকটা থেকে কোনদিকে জল ঢুকতে শুরু করবে?

নীচের কোন কথাটা ঠিক ঃ

1. চিনির দ্রবণে অভিস্রবণ শুরু হবার কিছুক্ষণ পর চিনির মোট পরিমাণ (মানে যত গ্রাম চিনি দেওয়া হয়েছিল) কমে যাবে, গাঢ় দ্রবণটায় জল ঢুকে পাতলা হয়ে যাবে।
2. চিনির দ্রবণে অভিস্রবণ শুরু হবার কিছুক্ষণ পর চিনির মোট পরিমাণ (মানে যত গ্রাম চিনি দেওয়া হয়েছিল) একই থাকবে, গাঢ় দ্রবণটায় জল ঢুকে পাতলা হয়ে যাবে।

তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অভিস্রবণ কি থামানো সম্ভব?

যদি আমরা প্রথমেই চিনির দ্রবণের দিকটা (A নল) একটা পিস্টন দিয়ে বাইরে থেকে চাপ দিই তাহলে অভিস্রবণ থামানো যেতে পারে। যে ন্যূনতম (অন্তত পক্ষে যতটুকু) চাপ দিলে গাঢ় দ্রবণের দিকে জলের অণু ঢুকে পড়া থামানো যায় তাকে বলে গাঢ় দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ। চিনির দ্রবণে চিনির গাঢ়ত্ব যত বাড়বে অভিস্রবণ চাপও তত বাড়বে।

কোশ এবং তার জলীয় পরিবেশে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে কী ঘটে ঃ

- অভিস্রবণ চাপ সমান এমন দুটো দ্রবণকে যদি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে কোনো ব্যাপন ঘটবে না। এর মানে জলের অণুরা কোনো দিকে বেশি পরিমাণে ঢুকতে থাকছে এমন কিছু ঘটবে না। এরকম দ্রবণকে পরস্পর আইসোটনিক (isotonic; গ্রিক iso = সমান) বলা হয়।
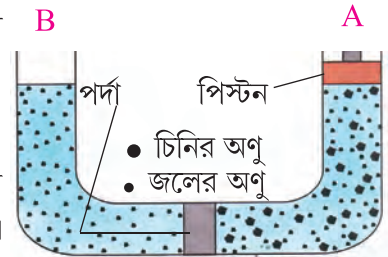
- যদি কোনো কোশের বাইরের দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ কোশের মধ্যের দ্রবণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে? তাহলে বাইরের দ্রবণটাকে কোশের তুলনায় হাইপারটনিক (hypertonic; গ্রিক hyper = বেশি) বলা হবে। এক্ষেত্রে কোশ থেকে ক্রমশ জল বেরিয়ে যেতে থাকবে।

- যদি কোশের মধ্যের দ্রবণের অভিস্রাবণ চাপ বাইরের চেয়ে বেশি হয়? তাহলে বাইরের দ্রবণটাকে কোশের তুলনায় হাইপোটনিক (hypotonic; গ্রিক hypo = কম) বলা হবে। এক্ষেত্রে ক্রমশ বাইরে থেকে কোশের মধ্যে জল ঢুকতে থাকবে।

এবার নীচের সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক:

- লোহিত রক্তকণিকারা যাতে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে ফেটে না যায় তাই সাবধান হতে হয়। আন্ত্রিক বা কলেরা আক্রান্ত রোগীর শিরার মধ্যে নুন-গ্লুকোজ মেশানো যে জল দেওয়া হয় তার প্রকৃতি কী? [ভেবে দেখো : লোহিত রক্তকণিকার মধ্যের দ্রবণের সঙ্গে রক্ত কিরকম হলে লোহিতকণিকা ফেটে বা কুঁচকে যাবে না? হাইপারটনিক/হাইপোটনিক/ আইসোটনিক]
- যদি কলেরা-আক্রান্ত রোগীর শিরায় গাঢ় নুন জল দেওয়া হয় তাহলে রক্তকণিকার কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

টুকরো কথা

গাঢ় নুনজল হলো লোহিত রক্তকণিকার সাপেক্ষে হাইপারটনিক। এই দ্রবণ মেশালে রক্তের অভিস্রবণ চাপ অনেক বেড়ে যায়। তখন রক্ত রক্তনালীর (জালকের) বাইরে থেকে প্রচুর কোশরস টেনে নেয়। এর ফলে রক্তের আয়তন ও রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং বিপদের সূচনা ঘটে।

জীবজগতে অভিস্রবণের গুরুত্ব

- গাছের মূলরোমের মাধ্যমে মাটি থেকে জলশোষণ অভিস্রবণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। শোষিত জল জাইলেম নলগুলো দিয়ে কাণ্ড হয়ে পাতায় পৌঁছোয়।
- ব্যাকটেরিয়া কোশের কোশপ্রাচীর সঠিকভাবে তৈরি না হলে কোশের ভিতর ও বাইরে অভিস্রবণ চাপের পার্থক্যে কোশ ফেটে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাকটেরিয়াঘটিত নানা রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। এইজাতীয় ওষুধের অণুরা ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর তৈরিতে বাধা দেয়। এর ফলে ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর সঠিকভাবে তৈরি হতে পারে না। তখন ভিতরের অভিস্রবণ চাপে কোশপ্রাচীর ফেটে কোশ মরে যায়।

নীচের ঘটনাগুলোকে অভিস্রবণ চাপের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারো কী?

- রসগোল্লার গাঢ় রস সহজে পচে না।
- কাঁচা মাছে নুন মাখিয়ে রোদে রেখে দিয়ে শুঁটকী মাছ তৈরি করা হয়।
- জর্ডনের ডেড সীর জলে প্রচুর নুন আছে। এইরকম জলে কি রুই কিংবা কাতলা মাছ বাঁচতে পারে?
- মধুকে কোনো ব্যাকটেরিয়া সহজে নষ্ট করতে পারে না।

অঙ্কুরোদগম

তোমরা এর আগেই জেনেছ, যে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ থেকে চারাগাছের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয়। একবার মনে করে লেখো:

- চারাগাছের কাণ্ড তৈরি হয় ভ্রূণের .... অংশ থেকে।
- চারাগাছের মূল তৈরি হয় ভ্রূণের .... অংশ থেকে।

এবার কীভাবে বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি হয় তা দেখি। তোমার দরকার হবে 5-6 টা শুকনো ছোলাবীজ, 5-6 টা ছোটো বোতলের ছিপি, ডট পেন, 1 টা আলপিন। সবমিলিয়ে সময় লাগবে 5-6 দিন।

তুমি প্রথম দিন একটা ছিপিতে জল নিয়ে তাতে একটা ছোলাবীজ ভেজাও। তার পর চারদিন একটা একটা করে ছিপিতে একটা একটা করে ছোলাবীজ ভেজাও। ষষ্ঠদিনে সবকটা ছোলাবীজের তুলনা করো।

প্রথমে এসো বাইরে থেকে দেখি :

	1ম বীজ	2য় বীজ	3য় বীজ	4র্থ বীজ	5ম বীজ
বীজটা কোঁচকানো, বা ফোলা					
বীজটা শক্ত, না নরম ?					
বীজটা থেকে কিছু বেরিয়েছে ?					

এবার বীজের খোসাটা আলপিন দিয়ে সাবধানে ছাড়াও। বীজপত্র দুটো সাবধানে আলগা করো, যেন দুটো পুরোপুরি আলাদা হয়ে বাইরে যায়। তারপর ভেতরটা লক্ষ করো।

	1ম বীজ	2য় বীজ	3য় বীজ	4র্থ বীজ	5ম বীজ
ভ্রূণমূলটার কী পরিবর্তন ঘটেছে ?					
ভ্রূণমুকুলটার কী পরিবর্তন ঘটেছে ?					
বীজপত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা ?					
ঘটে থাকলে, কেন ?					

তাহলে এবার বলো-

ভ্রূণমূল থেকে কী তৈরি হলো ....।

ভ্রূণমুকুল থেকে কী তৈরি হলো ....।

ছোলাবীজের বীজপত্রের কাজ কি ? ....।

একটা বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি হবার এই প্রক্রিয়াটি নামই হলো অঙ্কুরোদগম (Germination)

● কুমড়ো,তেঁতুলের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বক ফাটিয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে। একে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম (Epigeal Germination) বলে।

● মটর, ছোলা বা আমের বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় বীজত্বকে আবদ্ধ বীজপত্র কখনোই মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে আসে না। একে মৃদবর্তী অঙ্কুরোদগম(Hypogeal Germination) বলে।

অঙ্কুরোদগমের শর্তসমূহ

তোমরা মুদির দোকানে দেখেছ বস্তা ভরতি করে ছোলাবীজ থাকে, অঙ্কুর বেরোয় না। আবার চানা-মটরওয়ালার কাছে যে ছোলাবীজগুলো থাকে, তাতে অঙ্কুর বেরিয়ে যায়। তাহলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে গেলে কী কী দরকার? এসো দেখি তাই।

তোমায় জোগাড় করতে হবে গোটা দশ-বারো শুকনো ছোলার বীজ, তিনটে মাটির খুরি, খানিকটা ঝুরো মাটি, আর লাগবে জল। তোমার সময় লাগবে দিন তিন-চার।

প্রথমে খুরিগুলোতে প্রায় ভরতি করে মাটি নাও।

একটা মাটিভরতি খুরিতে তিন-চারটে ছোলাবীজ মাটির অল্প নীচে পুঁতে দাও। দ্বিতীয় একটা মাটিভরতি খুরিতে আরও তিন-চারটে ছোলাবীজ মাটির অল্প নীচে পুঁতে দাও; এই খুরিটায় ভালো করে জল দাও। তৃতীয় মাটিভরতি খুরিটায় বাকি তিন-চারটে ছোলাবীজ একেবারে মাটির নীচে পুঁতে দাও;এই খুরিটায় বেশি করে জল দাও। এবার খুরিগুলোকে তিন দিন রেখে দাও।

তিন দিন বাদে সবকটা খুরিতে ছোলাবীজগুলোকে তুলে পরীক্ষা করো। কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

	প্রথম খুরির বীজ	দ্বিতীয় খুরির বীজ	তৃতীয় খুরির বীজ
	মাটিতে জল দেওয়া হয়নি	মাটিতে জল দেওয়া হয়েছে	মাটিতে অনেক জল দেওয়া হয়েছে, বীজ মাটির অনেক নীচে ছিল
কটা বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে বীজের অঙ্কুর কতটা বড়ো হয়েছে			

এসো ভালো করে বুঝে নিই:

- কোন খুরির বীজ সবচেয়ে ভালো অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ একটু কম অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ সবচেয়ে কম অঙ্কুরিত হয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ বাতাস পেয়েছে, কিন্তু জল পায়নি? ....।
- কোন খুরির বীজ বাতাস আর জল দুটোই পেয়েছে? ....।
- কোন খুরির বীজ জল পেয়েছে, কিন্তু বাতাস পায়নি ? ....।

উপরের সারণির দুটো দিক মিলিয়ে দেখো। এবার কেন এমন হয়েছে বলতে পারো?

• যে খুরির বীজ সবচেয়ে ভালো অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে?	
• যে খুরির বীজ একটু কম অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে, আর কী কী পায়নি?	
• যে খুরির বীজ সবচেয়ে কম অঙ্কুরিত হয়েছে, তা কী কী পেয়েছে, আর কী কী পায়নি?	

করে দেখো : থার্মোকল দিয়ে ছোটো ঢাকনাওয়ালা বাক্স বানাও। একটা খুরিতে মাটির অল্প নীচে বীজ পুঁতে জল দাও, তারপর ওই খুরিটা বাক্সটার ভেতরে রেখে ঢাকনা লাগিয়ে দাও। দিন তিনেক মাছের বাজার থেকে রোজ কিছু বরফ এনে ওই খুরিটার মাটিতে দাও। তারপর বীজটা বাক্সটার ঢাকনা তুলে দেখো, কেমন অঙ্কুর বেরিয়েছে।

কেন এমন হলো, তার কারণ বলতে পারো?

তাহলে অঙ্কুরোদগমের জন্য কোন কোন উপাদান বা শর্ত অবশ্যই প্রয়োজন?

1. 2. 3.

ওইসব উপাদান অঙ্কুরোদগমের সময়ে কী কী ভূমিকা পালন করে?

একটু মনে করা যাক :

- জল আমাদের খাদ্যবস্তুকে তরল করে, আর দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়।
- অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে, আর খাদ্যবস্তু থেকে শক্তি মুক্ত করতে সাহায্য করে।
- তাপ আমাদের জৈবনিক কাজগুলি চলতে সাহায্য করে।

এই পরীক্ষাটা আবার করো :

(a) অন্য কোনো বীজ নিয়ে

(b) পচা পাতা যুক্ত মাটি নিয়ে

(c) গোবর সার দেওয়া মাটি নিয়ে

বলো তো :

- চাষের সময়ে বীজের অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বেরোতে গেলে কী করা যায়?
- বীজ মাটির অনেক গভীরে পোঁতা উচিত কিনা?
- বীজতলা বেশি শুকনো বা জল অনেকটা বেশি হলে কী হবে?

অঙ্কুরোদগমে ব্যাপন আর অভিস্রবণের ভূমিকা

বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটতে গেলে ব্যাপন আর অভিস্রবণ দরকার হয় কেন?

এবার এসো, বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়ে ব্যাপন আর অভিস্রবণ কেন দরকার হয় দেখি।

ব্যাপন আর অভিস্রবণ পড়তে গিয়ে আমরা যা জেনেছি সেগুলো একটু মনে করো। যে কথাগুলো সত্যি তাদের পাশে '✓' চিহ্ন আর যেগুলো ভুল তাদের পাশে '×' চিহ্ন দাও।

1. একই উষ্ণতায় তরলের চেয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ব্যাপন ঘটে ধীরে। ☐
2. তাপমাত্রা কমলে ব্যাপন ঘটে তাড়াতাড়ি। ☐
3. ব্যাপনের সময় অণুরা বেশি গাঢ় অংশ থেকে কম গাঢ় অংশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ☐
4. অভিস্রবণের সময় দ্রাবের অণুরা অর্ধভেদ্য পর্দা পেরিয়ে যেতে-আসতে পারে না। ☐
5. জলে একটুখানি গাঢ় চিনির দ্রবণ দেওয়া হলো। যত সময় যাবে চিনির অণুরা জলের মধ্যে দিয়ে ততই ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে দ্রবণের বিভিন্ন অংশে চিনির পরিমাণের তফাত ক্রমশ কমে আসবে। ☐

- পাশের খোপে একটা মটর বীজের ভিতরের ছবি আঁকো, যেখানে বীজটির বীজপত্র দুটি মেলে রাখা হয়েছে, আর ভ্রূণটি দেখা যাচ্ছে।
- এবার ওই ছবিতে লেবেল করে দেখাও, বীজটির ভেতরে কোথায় ভ্রূণটির খাদ্য জমা করে রাখা আছে।
- তারপরে লেবেল করে দেখাও,বীজটির কোন অংশটি বেড়ে উঠে অঙ্কুর হয়েছে।
- তাহলে কোন পথে খাদ্য তার সঞ্চয়স্থান থেকে ভ্রূণটির বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয় তা রেখা এঁকে বুঝিয়ে দাও।
- পাশের খোপে একটা ভুট্টা বীজের ভিতরের ছবি আঁকো, যেখানে বীজটি কেটে রাখা হয়েছে, আর ভ্রূণটি দেখা যাচ্ছে।
- এবার ওই ছবিতে লেবেল করে দেখাও, বীজটির ভেতরে কোথায় ভ্রূণটির খাদ্য জমা করে রাখা আছে।
- তারপরে লেবেল করে দেখাও, বীজটির কোন অংশটি বেড়ে উঠে অঙ্কুর তৈরি করছে।
- তাহলে কোন পথে খাদ্য তার সঞ্চয়স্থান থেকে ভ্রূণটির বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয় তা রেখা এঁকে বুঝিয়ে দাও।
- বলত, ওই খাদ্য কোন প্রক্রিয়ায় সঞ্চয়স্থান থেকে বাড়ন্ত অংশে পৌঁছোয়?

এবার আগে ফিরে একবার মনে করে দেখি, বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য কোন কোন উপাদান প্রয়োজন (এগুলো তোমরা কিছু আগেই পড়েছ)।

1. 2. 3.

এদের মধ্যে কোন উপাদানটি গ্যাসীয় পদার্থ, আর কোনটিই বা তরল পদার্থ?

গ্যাসীয় পদার্থ	
তরল পদার্থ	

এদের সম্পর্কে আমরা কী কী জানি? এসো নীচের ছকে লিখি :

	গ্যাসীয় উপাদান	তরল উপাদান
অঙ্কুরোদগমে কী ভূমিকা পালন করে		
কোথা থেকে বীজ পায়		
কী প্রক্রিয়ায় বীজের দেহে প্রবেশ করে		
কী প্রক্রিয়ায় বীজের দেহে ছড়িয়ে পড়ে		

তাহলে অঙ্কুরোদগমের সময়ে ব্যাপন আর অভিস্রবণ কী কী ভূমিকা পালন করে?

ব্যাপন	
অভিস্রবণ	

পরিবেশে জীবের অস্তিত্বরক্ষায় ব্যাপন ও অভিস্রবণের ভূমিকা

তোমার দেহে জলের ভাঁড়ার

দেখো তো এগুলো বলতে পারো কিনা :

- বছরের কখন তোমার বারবার তেষ্টা পায়? আর কোন সময়ে তেষ্টা পায় খুব কম? ....।
- বছরের কোন সময়েই বা তোমার ঘাম হয় খুব বেশি? আর কখন ঘাম হয় খুব কম? ....।
- ঘাম তো জলের মতো তরল। তাহলে ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে কোন পদার্থ সবচেয়ে বেশি বেরিয়ে যায়? ....।
- এর ফলে দেহে জলের মোট পরিমাণ কমে যায় না বেড়ে যায়? ....।
- তাহলে আমাদের জানতে হবে, শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে হলে আমাদের কী করা দরকার।
- প্রথমে দেখি, দেহে জলের পরিমাণ ঠিক রাখা দরকার কেন।
- আমাদের দেহে জল কী কাজ করে? এসো দেখি।

তোমার খুব তেষ্টা পেলে শরীরে কীরকম অস্বস্তি হয়?

কীরকম অস্বস্তি হয়	তার কারণ কী? (মনে রেখো, তোমার রক্তের প্রায় 90 শতাংশ জল, তোমার লালারও প্রায় তাই, আর তোমার দেহের কোশগুলোর মধ্যেও প্রায় 70 শতাংশ জল)
1.	
2.	
3.	
4.	

যখন খুব ঘাম হয়, ঘাম শুকোবার পর তোমার জামায় আর প্যান্টে কীরকম দাগ পড়ে? সেটা কীসের দাগ? (দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে জেনে নাও।) তাহলে ওই সময়ে তোমার দেহ থেকে ঘামের সঙ্গে কী বেরিয়ে যায়? ....।

- তাহলে দেখি, দেহে নুনের পরিমাণ ঠিক রাখা দরকার কেন।
- আমাদের দেহে নুন কী কাজ করে? এসো দেখি।
- অনেকক্ষণ হুটোপুটি করে খেললে তোমার শরীরে কীরকম অস্বস্তি হয়?

কীরকম অস্বস্তি হয়	তার কারণ কী? (মনে রেখো, তোমার দেহে এক শতাংশের সামান্য কম নুন থাকে।)
1.	
2.	
3.	
4.	

- ফুটবল খেলতে গিয়ে ফুটবল খেলোয়াড়দের মাঝে মধ্যে কীসে টান ধরে?
- তোমার কখনও ওই রকম হয়েছে কী?
- তাহলে, দেহে জল আর নুনের অভাব হলে আমরা তা পূরণ করি কী উপায়ে? ভেবে দেখো।
- তোমার তৃষ্ণা পেলে বুঝতে হবে, যে তোমার দেহে জলের অভাব হয়েছে; তখন তুমি কী করো?
- তুমি কি নুন ছাড়া ভাত খেতে ভালোবাসো? তাহলে সাধারণ নুনযুক্ত খাবার খেলে তোমার দেহে কী প্রবেশ করে?
- এবার তাহলে বলো, তোমার দেহে জল আর নুনের অভাব কী উপায়ে পূরণ হয় :
- জলের অভাব পূরণ করতে কী করি : ....
- নুনের অভাব পূরণ করতে কী করি : ....

- কখনও পেট খারাপ হলে, তরল মল আর মূত্রের সঙ্গে অনেক জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। তখন শরীরে কী কী অস্বস্তি হয়?

- তাহলে ওই সময়ে কীভাবে দেহের ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব?

ওই সময়ে এক বড়ো গ্লাস জলে তিন চামচ চিনি আর এক বড়ো চিমটি নুন মিশিয়ে নাও। এবার ওইরকম তিন গ্লাস জল সারা দিন ধরে আস্তে আস্তে খেয়ে নাও। তাহলে তোমার দেহে জল আর নুনের অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে। এইরকম শরবতকে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (Oral Rehydration Solution) বা ওআরএস (ORS) বলে।

- আচ্ছা, খুব গরমে অনেকক্ষণ জল না খেয়ে থাকলে, আর খুব ঘামলে, দেহে কীসের অভাব হতে পারে?

- আগে যেমনটি দেখেছ, দেহে জল আর নুনের খুব অভাব হলে, কী কী অস্বস্তি হয়?

তাহলে ওই সময়ে মানুষ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে; একে বলে সান স্ট্রোক। তাহলে তখন কী করতে হবে? ওই অসুস্থ মানুষটিকে শুইয়ে দিয়ে, জামাকাপড় আলগা করে দিতে হবে। তার পর তাকে ঠান্ডা জল খাওয়াতে হবে ও ঠান্ডা জলে গা ধুইয়ে দিতে হবে।

তোমার দেহে যেমন, অন্যান্য জীবের দেহেও কী জলের ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার?

এসো গাছের ক্ষেত্রে জলের ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকে দেখি।

বাড়িতে প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়ে রাখা শাকসবজি আর ফুলের প্যাকেটের ভেতরে জলকণা জমে থাকতে দেখেছ তো? ওই জলকণা কোথা থেকে আসে?

করে দেখো ও ছবি আঁকো : তোমার লাগবে দুটো টবে লাগানো ছোটো চারাগাছ, দুটো প্লাস্টিকের প্যাকেট, দু-টুকরো সুতো আর দুটো পলিথিন শিট।

একটা গাছওয়ালা টবে জল দেবে আর অন্যটায় জল দেবে না। টব দুটোকে পলিথিন শিট দিয়ে মুড়ে দাও। এবার প্লাস্টিকের প্যাকেট আর সুতো দিয়ে দুটো গাছের বিটপ অংশটা ঢেকে ফেলো। একটা গাছে জল দাও, অন্যটায় দিও না। এবার গাছদুটোকে তিন-চার ঘন্টা রেখে দাও।	
1. তারপর দেখো : প্যাকেটের ভেতরে কোন গাছটা থেকে জল বেরিয়ে গেছে?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :
2. এবার দু-দিন বাদে ওই গাছদুটোকে আবার দেখো: দুটো গাছই কি সমান তাজা রয়েছে? না থাকলে গাছদুটির মধ্যে কি তফাত দেখা যাচ্ছে?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :
3. তফাত থাকলে তার কারণ কী? তাহলে গাছ তার হারানো জল কোথা থেকে আর কীভাবে ফেরত পায়?	জল দেওয়া গাছ : জল না-দেওয়া গাছ :

- মাছ তো জলেই থাকে। মাছের দেহে কী হয় দেখি।

তুমি কি কখনও পুকুরের বা নদীর জল আর সমুদ্রের জল পান করেছ? পুকুর বা নদীর জল আর সমুদ্রের জলের মধ্যে স্বাদের কী ফারাক রয়েছে বলো?

এই পার্থক্যের কারণ কী?

তাহলে ওই দুরকম জলে থাকা মাছদের দেহেও কি একইরকমভাবে জল ধরে রাখা হয়? এসো জানার চেষ্টা করি।

একটা করে নদী বা পুকুরের আর সমুদ্রের মাছের নাম লেখো।

প্রথম দেখি, পুকুরের জলে পুকুরের মাছের অবস্থা কেমন হয়, আর সমুদ্রের জলে সমুদ্রের মাছের কী অবস্থা হয়। সেটা বুঝতে হলে নীচের পরীক্ষাটি করো।

করে দেখো : তোমার লাগবে ছয়-সাতটা শুকনো কিশমিশ, দুটো ছোটো গ্লাস, আর চার-পাঁচ চামচ নুন।

1. গ্লাস দুটোয় জল নাও।
   একটা গ্লাসের জলে ওই নুনটা গুলে ফেলো।
   অন্য গ্লাসটার জলে নুন দিও না।

2. প্রথমে নুন না দেওয়া গ্লাসের জলে চারটা শুকনো কিশমিশ ফেলে দাও; চারটে-পাঁচ ঘন্টা রেখে দাও।
3. মনে করো বলো তো, কেন এমন পরিবর্তন হয়েছে?
4. এবার ওই ভেজা কিশমিশগুলোর দুটো নিয়ে নুনগোলা জলের মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা রেখে দাও।
5. এবার সাধারণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর সঙ্গে তুলনা করে বলো তো, নুন জলে ভেজা কিশমিশগুলোর কী পরিবর্তন হয়েছে?
6. কেন আবার এমন পরিবর্তন হয়েছে বলো তো?

জেনে রেখো, পুকুরের বা নদীর মাছের দেহে যা নুন রয়েছে, পুকুর বা নদীর জলে নুন রয়েছে তার চেয়ে কম। তাহলে ওইসব মাছের অবস্থা হয় সাধারণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর মতো।

- বলো তো, ওইসব মাছের দেহে জলের পরিমাণের কী পরিবর্তন হয়?
- তাহলে, নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে ওইসব মাছেরা কী করে? (তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় দরকারে সাহায্য করবেন।)

আবার, সমুদ্রের মাছের দেহে লবণ রয়েছে, সমুদ্রের জলে লবণ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে ওইসব মাছের অবস্থা হয় লবণ জলে ভেজা কিশমিশগুলোর মতো।

- এবার বলো তো, ওই সব মাছের দেহেই বা জলের পরিমাণের কী পরিবর্তন হয়?
- তাহলে, নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে ওইসব মাছেরাই বা কী করে? (তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমায় দরকারে সাহায্য করবেন।)

এবার তাহলে নীচের ছক থেকে কোন রকমের মাছ কীভাবে নিজের দেহে জলের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে তা জেনে নাও :

• পুকুরের বা নদীর মাছ কী করে :	1.লঘু মূত্র ত্যাগ করে; ফলে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়। 2.ফুলকার মাধ্যমে জল থেকে আয়ন শোষণ করে।
• সমুদ্রের মাছ কী করে :	1.ঘন মূত্র ত্যাগ করে; ফলে খুব কম জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। 2.ফুলকার মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত আয়ন ত্যাগ করে।

শব্দভাণ্ডার : একেবারে জল খায় না; সারা দিন অনেকটা জল মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বার করে দেয়;অত্যন্ত অল্প মূত্র ত্যাগ করে; দেহ থেকে অনেকটা লবণ বার করে দেয়; জল থেকে অনেকটা লবণ টেনে নেয়।
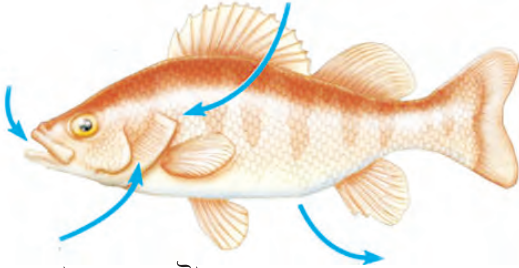
পাশে মিষ্টি জলের ও নীচে নোনা জলের একটি করে মাছের ছবি দেওয়া আছে। ওরা কীভাবে দেহে জল ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে তা ওপরের শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে তিরচিহ্নের নীচে বা ওপরে লেখো (শব্দভাণ্ডারের সূত্রগুলো একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারো)।

7 পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ
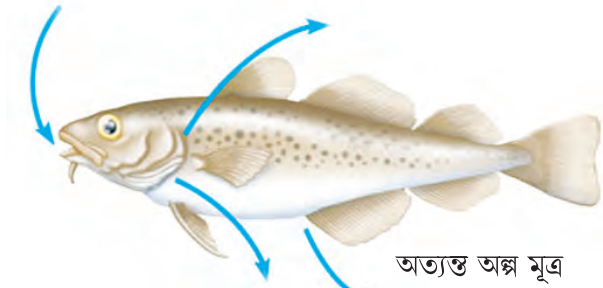
জলবায়ুর পরিবর্তন

ওপরের ছবিগুলোতে কী ঘটেছে বলো? এর কারণ কী হতে পারে তা লেখার চেষ্টা করো।

....

....।

এসো জানার চেষ্টা করা যাক **আবহাওয়া** আর **জলবায়ু** শব্দ দুটোর অর্থ ঠিক কী?

আবহাওয়া হচ্ছে এমন একটা বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা যেখানে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি, জল দিনে দিনে, ঘন্টায় ঘন্টায় এমনকী মুহূর্তে মুহূর্তেও বদলায়। কাছাকাছি থাকা দুটি স্থানের মধ্যেও আবহাওয়া বদলাতে দেখা যায়।

জলবায়ু হচ্ছে আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের (বছর) গড় অবস্থা। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জলবায়ু দেখা যায়।

তাহলে এবারে বলো তো **আবহাওয়া** আর **জলবায়ু**-র মধ্যে পার্থক্য কী?

আবহাওয়া	জলবায়ু

আবহাওয়া আর জলবায়ু কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? লেখার চেষ্টা করো।	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

1. আম গাছে কখন মুকুল আসে? ....।
2. বাইরের দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা কখন এদেশে আসে? ....।
3. ইলিশ মাছ কখন ডিম পাড়ে? ....।
4. পলাশ ফুল কখন ফোটে? ....।
5. এইরকম আরও কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার কথা লেখো যেগুলো বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়।
   a) c)
   b) d)
6. আমাদের দেশে বছরের কোন সময়ে বেশি গরম পড়ে? ....
7. গরম, বর্ষা, শরৎ আর শীত ছাড়া আর অন্য কোনো ঋতুর কথা কি তোমরা জানো? ....
8. বর্ষা কি বছরের নির্দিষ্ট সময়েই আসে? ....
9. তোমার অঞ্চলে শীত ঋতুর স্থায়িত্ব কত দিনের? ....

প্রতিটি ঋতুর স্থায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ের থেকে বেশি বা কম হলে কি কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে? নীচের সারণিতে লেখো।

ঋতুর নাম	স্থায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি বা কম হলে কী সমস্যা হতে পারে
1. গ্রীষ্ম	1.
2.	2.
3.	3. .
4.	4.

প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা — একে এককথায় আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল বলে ধরে নিতে পারি।

এসো এবারে তোমাদের এলাকায় এই পরিবর্তন কেমন তা খোঁজার চেষ্টা করি।

বাবা-মা বা এলাকার বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কর্মপত্রটা ভর্তি করার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

তারিখ : ....

1. আপনার নাম কী? ....

2. আপনার বয়স কত? ....

3. আপনি যে অঞ্চলে থাকেন সে অঞ্চলের নাম ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য কী? ....

4. আপনার অঞ্চলে ছোটোবেলার জলবায়ুর সঙ্গে এখনকার জলবায়ুর (উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

5. এখনকার জলবায়ুর সঙ্গে 20 বছর আগেকার জলবায়ুর কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

6. জলবায়ুর এই পরিবর্তনের পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

7. জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে কোনো শারীরিক সমস্যার কথা কী আপনার জানা আছে?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

8. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শারীরিক সমস্যা ছাড়াও আর কী কী সমস্যা আপনার এলাকায় হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

9. জলবায়ুর পরিবর্তন যাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না করে, সেই বিষয়ে করণীয় কী বলে আপনার মনে হয়?

i) .... iii) ....

ii) .... iv) ....

পৃথিবীর ঘোমটা
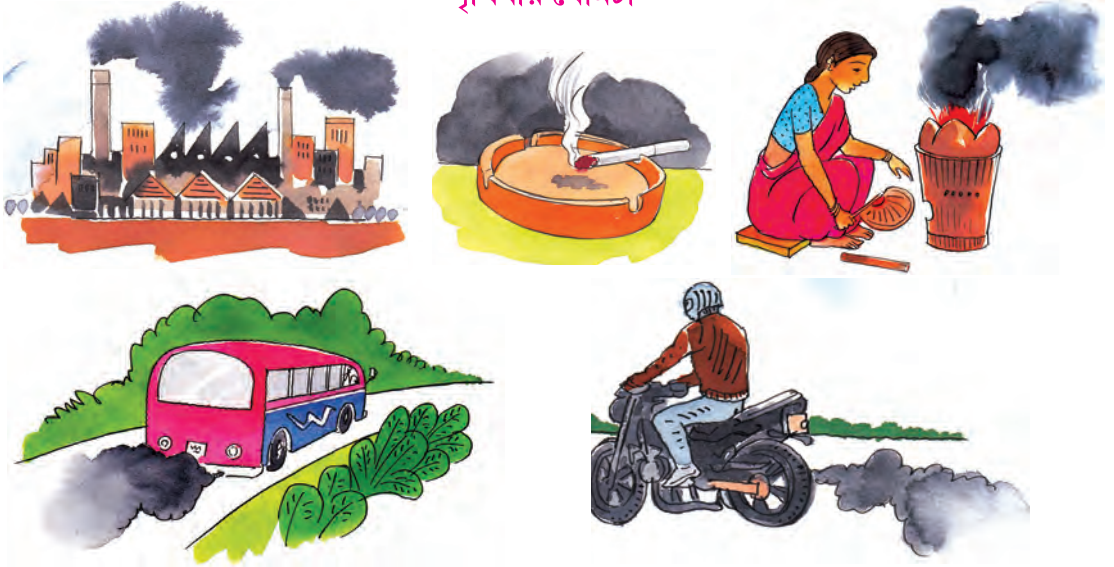
i) ওপরের ছবিগুলো থেকে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

ii) বিভিন্ন উৎস থেকে বেরোনো ধোঁয়া কোথায় যায়? ....।

বিভিন্ন উৎস থেকে বেরোনো এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকে নানাধরনের গ্যাসীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ভাসমান কণা (Suspended particulate matter)। যেমন - কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস এবং ধুলো, কার্বন ইত্যাদির কণা। এই পদার্থগুলো বায়ুমন্ডলে গিয়ে জমা হয় আর পৃথিবীকে একটা চাদরের মতো মুড়ে রাখে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়াও থাকে ওজোন আর জলীয় বাষ্প।

পৃথিবীর ছেড়ে দেওয়া তাপশক্তির একটা অংশকে বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখতে সাহায্য করে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের এই চাদর। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে রাখার পেছনে এই গ্যাসীয় পদার্থগুলোর (CO_2, CH_4, জলীয় বাষ্প) ভূমিকা অনেকখানি। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড না থাকলে পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা -18^oC-এ নেমে যেত। তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। কিন্তু উলটোদিকে আবার আমাদের নানারকম কাজকর্মের ফলে পরিবেশে এইসব গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন এইসব গ্যাসীয় পদার্থগুলোই প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাপকে পৃথিবীতে আটকে রাখে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এটাই বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming)। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের এক গভীর সম্পর্ক আছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

নীচে দেওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাগুলো ভালো করে পড়ো।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি

- কিছু গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে স্বাভাবিকভাবে থাকে। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জেনেছেন যে গত কয়েক যুগ ধরে এই গ্যাসগুলো মাত্রায় অনেকটা বেড়ে গেছে।

- মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে সৃষ্টি হওয়া গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অন্যতম। 1970 থেকে 2004 সালের মধ্যে পরিবেশে এই গ্যাস মেশার বার্ষিক হার প্রায় 80 শতাংশ বেড়ে গেছে।

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা 2006 সাল থেকে এত মাত্রায় বেড়েছে যা গত কয়েক লক্ষ বছরে আর কখনোই এতটা বাড়েনি।

- 2001 সালের গোড়ায় জানা যায়, গত 100 বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে 1°C।

- মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (NASA) জানিয়েছে, 2005 সাল ছিল গত এক শতাব্দীর মধ্যে উষ্ণতম বছর।

- 1980-88 সালের মধ্যে ভারতে 18 টি তাপপ্রবাহের (Heat wave) ঘটনার কথা জানা গেছে। এরফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

- 2005 সালে রাজস্থানে বন্যা আর উত্তর-পূর্ব ভারতে খরা হয়। এমনিতে রাজস্থান খুব শুকনো। কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চল। আর উত্তর-পূর্ব ভারত বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চল।

- 2007 সালে 4 বার মরশুমি নিম্নচাপ হয়, যা স্বাভাবিকের থেকে দ্বিগুণ। এর ফলে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে ভয়ংকর বন্যা হয়। প্রচুর মানুষের জীবন আর জীবিকা নষ্ট হয়। একইসঙ্গে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি হারায়।

- গত 5 হাজার বছর ধরে মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কাশ্মীরের অমরনাথের গুহায় জমা বরফের উচ্চতা থাকত প্রায় 12 ফুট। অথচ 2007-এ জুন মাসের শেষেই অমরনাথের ওই জমা বরফ গলে 4-5 ফুট উচ্চতার হয়েছিল।

- উত্তরাখণ্ডে 2013 সালের মেঘভাঙা বৃষ্টি থেকে বিধ্বংসী বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছেন। বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। বাড়িঘর আর অন্যান্য সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

হিমবাহের বরফের গলন ও নদীর জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি

হিমবাহকে বরফের জমাটবাঁধা নদী বললে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না। কারণ পৃথিবীর মিষ্টিজলের বৃহত্তম ভাণ্ডার হলো এই হিমবাহগুলো। এই হিমবাহগুলোর বরফগলা জলে পুষ্ট হয় বিভিন্ন নদনদী। পৃথিবীর প্রায় 99% হিমবাহের অবস্থান উত্তর আর দক্ষিণমেরুতে। হিমালয় পর্বতমালাতেও আছে অনেকগুলো হিমবাহ।

এদের মধ্যে অন্যতম হলো গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, জেমু। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর উৎস হলো হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ। হিমবাহের বরফগলা জলেই এরা পুষ্ট হয়। হিমালয় এশিয়ার নয়টি বড়ো বড়ো নদীকে পুষ্ট করে। এর ফলে প্রায় 120 কোটি লোকের জলের বন্দোবস্ত হয়।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ

যমুনোত্রী হিমবাহ

জেমু হিমবাহ

বৃষ্টিপাত, বায়ুর উষ্ণতা প্রভৃতি আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন পৃথিবীর হিমবাহগুলোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বেড়ে গেলে হিমবাহগুলোর বরফ বেশি মাত্রায় গলতে আরম্ভ করবে।

- গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রতি বছর একটু একটু করে ছোটো হয়ে আসছে।
- উত্তরমেরু সংলগ্ন আলাস্কা উপকূলে যে বরফের স্তর রয়েছে, তা গত 30 বছরে 40% কমে গিয়ে পাতলা হয়ে গেছে।

হিমবাহগুলো গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলতল বেড়ে যেতে পারে।

- 1993 থেকে 2005 সালের মধ্যে সমুদ্রের জলতল প্রতি বছরে গড়ে বেড়েছে 3 মিমি (0.1 ইঞ্চি)।
- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের হিমবাহগুলো গলে যাওয়ার প্রভাব পড়বে সমুদ্রের জলতলের ওপর। এই বিষয়ে একটি গবেষণা বলছে যে 2100 সালের মধ্যে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা প্রায় 70 সেমি বেড়ে যেতে পারে।

সমুদ্রের জলতল বেড়ে গেলে উপকূল অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেবে। উপকূল অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়বে। প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা দেখা দেবে। সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের উপকূলে বাস করা অসংখ্য মানুষ।

- ভারত ও বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও আজ এই বিপদের সম্মুখীন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাঘের আবাস এই সুন্দরবন। আর এই অঞ্চলে বাস করে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ। এদের সকলেরই অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে।

উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ পুরো গলে গেলে ভবিষ্যতে ওই হিমবাহের জলে পুষ্ট নদ-নদীর জল প্রথমে বেড়ে যাওয়ার ও পরে কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। প্রথমে বন্যা আর পরে দেখা দিতে পারে তীব্র জলসংকট।

হিমবাহ প্রায় 80 শতাংশ সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত করে আর প্রায় 20 শতাংশ শোষণ করে। হিমবাহ সম্পূর্ণ গলে গেলে ওই 80 শতাংশ সূর্যরশ্মি ভূভাগ দ্বারা শোষিত হয়ে পৃথিবীর উষ্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

প্রবাল দ্বীপ - প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস

প্রবাল বা **কোরাল** হলো একধরনের সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা নিডারিয়া পর্বভুক্ত। এরা একসঙ্গে দল বেঁধে কলোনি তৈরি করে বাস করে। প্রবালরা নিজেদের দেহের বাইরে ক্যালশিয়াম কার্বনেট-এর একটা বহিঃকঙ্কাল তৈরি করে। এই বহিঃকঙ্কাল এদের দেহকে রক্ষা করে। মৃত প্রবালের সাদা বা রঙিন কঙ্কালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়। শৌখিন দ্রব্য ও গয়না হিসেবে এদের কদর পৃথিবীব্যাপী।

একসঙ্গে বাস করা অনেক প্রবালের দেহের বাইরে থাকা ক্যালশিয়াম কার্বনেটের বহিঃকঙ্কাল একটা শক্ত প্রাচীরের মতো গঠন তৈরি করে। এটাই প্রবাল প্রাচীর।

পৃথিবীর সমুদ্রতলের মাত্র 0.1% দখল করে থাকা প্রবাল প্রাচীর প্রায় 25% সামুদ্রিক প্রজাতির আশ্রয়স্থল। মাছ, মোলাস্কা, ইকাইনোডারমাটা, স্পঞ্জ, ক্রাস্টেশিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্রবাল প্রাচীরে বাস করে। জীববৈচিত্র্যের নিরিখে প্রবাল প্রাচীরের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমুদ্রের জলের উষ্ণতার সামান্যতম তারতম্য প্রবাল প্রাচীরের স্থায়িত্বের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

আর প্রবাল দ্বীপ কি জানো? মৃত প্রবাল আর অন্যান্য জৈব বস্তুর সাহায্যে সাধারণত প্রবাল প্রাচীরের অংশ হিসাবে **প্রবাল দ্বীপ** তৈরি হয়। ক্রান্তীয় আর উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাধারণত প্রবাল দ্বীপ দেখা যায়। প্রবাল দ্বীপগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক মিটার উঁচু হয়ে জেগে থাকে। উপকূলীয় নারকেল গাছের সারি আর সাদা প্রবালের বালি দিয়ে ঘেরা থাকে অগভীর সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপ।

- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীরগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 1988 সালে পৃথিবীর প্রায় 16% প্রবাল সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

- বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ভারত মহাসাগরে জলের উষ্ণতা বেড়ে গেছে। এই অঞ্চলের প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে অনেক ধরনের মাছ। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে এই প্রবাল প্রাচীরগুলো আর ওইসব মাছেদের আদর্শ বাসস্থান থাকছে না। লোভী মানুষও প্রবাল চুরির নেশায় এদের ধ্বংসে মেতেছে।

তোমরা তো খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন পড়ো। দেখো বিশ্ব উষ্ণায়ন আর জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত কী কী খবর পাও। এই বিষয়ে তোমরা যা যা পড়লে নীচের সারণিতে ছোটো করে লেখো।

বিষয়	খবর
(i) হিমবাহের গলন	
(ii) সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি	
(iii) জীববৈচিত্র্য ধ্বংস	

জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাস

মেরু ভালুক

এশিয়ার হাতি

বুনো কুকুর (ঢোল)

লায়ন-টেলড ম্যাকাক

লেদারব্যাক টার্টল

মাউন্টেন গরিলা

আমেরিকান কনডর

জায়েন্ট পান্ডা

আমুর লেপার্ড

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড

অ্যাটেনবোরোস পিচার প্ল্যান্ট

পিগমি হগ

সুইসাইড পাম

হোয়াইট-বেলিড হেরন

ব্যাক্ট্রিয়ান উট

জীববৈচিত্র্য কী?

রেহানা সেদিন স্কুলে এসে বলল — জানিস কালকে না আমাদের বাড়ির পাশের বকুল গাছে একটা বেনে-বউ এসে বসেছিল। শ্যামল বলল — বেনে-বউ! সে গাছে উঠল কী করে?

রেহানা হোহো করে হেসে বলে উঠল — দূর বোকা! বেনে-বউ তো একটা পাখি, হলুদ রঙের, মাথাটা কালো।

শুভজিৎ বলল — ওহ! ওই পাখিটাকে তো হলুদ পাখিও বলে।

পরশু দিন রাতে অপূর্বদের বাড়ির ছাদে একটা ভাম এসেছিল। তার লাফালাফিতে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছিল। আওয়াজের চোটে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

স্কুলের কাছে বড়ো পুকুরটার ধারে ইমতিয়াজ একটা জলের সাপ দেখছিল। সেকথা ইমতিয়াজ তার বন্ধুদের বলল। সাপটার গায়ে হলুদ রঙের উপর চৌকো চৌকো কালো ছোপ। রমেশ কাকু মাছ ধরছিল, বললেন—ঢোঁড়া সাপ, ওটার কিন্তু বিষ নেই। রেহানাদের স্কুলের কাছেই আম, জাম আর অন্য অনেক গাছের একটা ছোটোখাটো বাগান প্রায় জঙ্গলের চেহারা নিয়েছে। বন্ধুরা ঠিক করল যে এরপর থেকে তারা ওই বাগানের গাছগুলোর প্রত্যেকের নাম জানার চেষ্টা করবে। আর অন্যান্য পশুপাখিদেরও চেনার চেষ্টা করবে।

তোমার বাড়ি বা স্কুলের আশেপাশে যেসব জীবেরা থাকে তাদের একটা তালিকা তৈরি করো। এর বাইরেও কোনো জায়গায় কোনো জীবকে দেখলে তাদেরও এই তালিকায় যুক্ত করো।

বাসস্থানের প্রকৃতি	কী কী উদ্ভিদ দেখেছ (বীরুৎ/গুল্ম/বৃক্ষ)	কী কী প্রাণী দেখেছ (মেরুদন্ডী/অমেরুদন্ডী)
1. জলা		
2. ভিজে আল		
3. পুকুরের পাড়ের ঘন ঝোপ		
4. ইঁদুরের গর্ত		
5. পুরোনো মোটা গাছের গুঁড়ির কোটর		
6. উই ঢিপি		
7. পুরোনো বাড়ির ইটের ফাটল		
8.		
9.		

বাগান, পুকুর বা গ্রামের ঝোপজঙ্গলে রেহানারা কেউ দেখেছে কেউটে সাপ, কেউ বা দাঁড়াশ সাপ। অপূর্ব একদিন দেখল বেজির পরিবার। আর জলার ধারে শ্যামল দেখেছিল মেছো বেড়াল। ইমতিয়াজ ওর দাদুর কাছে থেকে বাড়ির পাশে ঘৃতকুমারী আর কুলেখাড়া গাছ চিনে জানতে পারল এরা একধরনের ওষধি । স্যার ওদের বললেন — এরকম অসংখ্য নাম না জানা উদ্ভিদ ও প্রাণী ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর আনাচেকানাচে। আর আছে খালি চোখে দেখা যায় না যে জীবদের — সেই জীবাণুর জগৎ। কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী আর জীবাণুর বৈচিত্র্য নিয়েই জীবনের বৈচিত্র্য, যাকে এককথায় বলা হয় **জীববৈচিত্র্য**। সমস্ত সৌরজগতে পৃথিবীতেই একমাত্র জীবন ও জীববৈচিত্র্য আছে। অন্য কোনো গ্রহে এখনও প্রাণের সন্ধান মেলেনি।

কোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে থাকা বিভিন্ন জীব প্রজাতি ও একেকটি অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য একেক রকম। যেমন, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হিমালয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য থেকে একদম আলাদা। আবার, আমাদের ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্য, ইংল্যান্ডের বা ব্রাজিলের জীববৈচিত্র্য থেকে অনেক আলাদা।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (Biodiversity Hot spot)
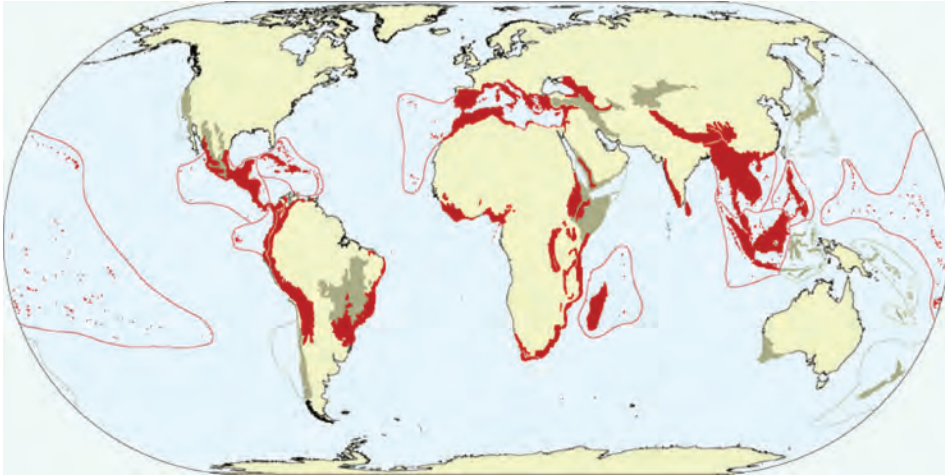
পৃথিবীতে এরকম বহু অঞ্চল আছে যেখানে খুব বেশি সংখ্যক প্রজাতির জীব পাওয়া যায়। আবার সেইসব অঞ্চলে এমন সব প্রজাতির জীবও পাওয়া যায়, যা অন্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেরকম অঞ্চলকে বলা হয় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ইংরাজিতে একে বলে বায়োডাইভারসিটি হটস্পট (Biodiversity Hot spot)। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটা বায়োডাইভারসিটি হটস্পট খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।পৃথিবীর বায়োডাইভারসিটি হটস্পটগুলো ওপরের মানচিত্রে লাল রঙে দেখানো হলো। তার মধ্যে চারটি বায়োডাইভারসিটি হটস্পট হলো :

1) **পূর্ব হিমালয় (Eastern Himalayas) :** সিকিম, দার্জিলিং,ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চল।

2) **পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং শ্রীলঙ্কা (Western Ghat and Srilanka) :** ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল বরাবর ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল।

3) **ইন্দো-বার্মা (Indo Burma) :** উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ (যেমন-মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ)।

4) **সুন্দাল্যান্ড (Sundaland):** ভারতের আন্দামান-নিকোবর অঞ্চল।

আমাদের ভারতবর্ষের জীববৈচিত্র্যও এত বেশি যে ভারতবর্ষকে একটি অতি বৈচিত্র্যের দেশ বা মেগাডাইভারসিটি নেশন (Megadiversity Nation) বলা হয়। পৃথিবীতে এরকম আরও কয়েকটি দেশ আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার, ইকুয়েডর ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য ও ভারত

- আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্যের সম্ভার বিপুল। পৃথিবীর সতেরোটি অতি জীববৈচিত্র্য-সম্পন্ন (Mega Biodiversity) দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় 91,212 প্রজাতির বন্য প্রাণী ও পোকামাকড়, শামুক, কেঁচো ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া গেছে।
- ভারতীয় ভূখণ্ডের আয়তন 33 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে প্রায় 19.7% বা প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ এলাকা অরণ্যে ঢাকা।
- সারা বিশ্বের উদ্ভিদজগতের সাত শতাংশ (7%) আর প্রাণীজগতের সাড়ে ছয় শতাংশের (6.5%) বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। এছাড়াও আছে কয়েক হাজার জাতের দেশি ধান ও অন্যান্য ফসল, কয়েকশো জাতের দেশি গবাদিপশু। এরা সবাই আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জীববৈচিত্র্য থেকে আমরা কী পাই?

এই যে এতসব উদ্ভিদ আর প্রাণী — এদের কাছ থেকে কি আমরা কোনো উপকার পাই? এসো তো লিখে ফেলার চেষ্টা করি। এই তালিকায় তোমরা আরও অন্যান্য উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নাম যোগ করতে পারো।

উদ্ভিদের নাম	উপকার	প্রাণীর নাম	উপকার
1. ধান		1.তেচোখা মাছ	
2. বট		2. সাপ	
3.নিম		3. বাদুড়	
4.		4.	

ধান

বট
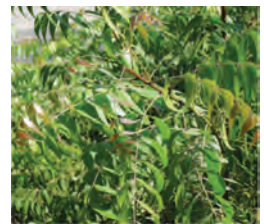
নিম

জীববৈচিত্র্য অর্থাৎ বিচিত্ররকম জীবের এই সম্ভার আমাদের সবসময় নানাভাবে সাহায্য করছে। এসো এবারে দেখে নেওয়া যাক, জীববৈচিত্র্য কীভাবে আমাদের নানা কাজে লাগে। জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন গুরুত্বের কথা পরের দুটো পাতায় দেখানো হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের আরও কিছু গুরুত্ব তোমরাও যোগ করতে পারো ।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব
খাদ্যের উৎস
1. খাদ্যশস্যের বিচিত্র সম্ভার কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
2.
পরিবেশের দূষণ রোধ
1. অণুজীবরা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে ফেলে ওইসব পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করতে সাহায্য করে।
2.
জলবায়ুর স্থিতাবস্থা
1. পরিবেশে CO_2 পরিমাণ বাড়লে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। একমাত্র উদ্ভিদ আর কিছু অণুজীবরাই CO_2 শোষণ করে পরিবেশে O_2- CO_2 ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।
2. উদ্ভিদেরা মূল দিয়ে যে জল শোষণ করে, তার অতিরিক্ত অংশ বাষ্পাকারে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। বৃষ্টিপাত বজায় রাখতে বনভূমি তথা উদ্ভিদেরা এইভাবে সাহায্য করে।
3.
মৃত্তিকা সংরক্ষণ
1. ঘাসজাতীয় উদ্ভিদরা মাটির গঠন রক্ষা করতে সাহায্য করে।
2. মূলযুক্ত উদ্ভিদ মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।
3. ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সহায়ক বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়তা করে।
4.
পরিবেশের বিভিন্ন মৌলের ভারসাম্য রক্ষা
1. মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন অণুজীব অন্যান্য মৃত জীবের দেহ বা বর্জ্য পদার্থগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ফলে মাটি তার হারানো মৌলগুলোকে আবার ফিরে পায়।
2.

ওষুধের উৎস

1. সিঙ্কোনা- কুইনাইন
2. সর্পগন্ধা- রেসারপিন
3. পেনিসিলিয়াম- পেনিসিলিন
4.
5.
6.
7.
8.

কাঠ

1. জ্বালানি রূপে
2. কাগজ তৈরিতে
3.

অন্যান্য শিল্প

1. রেশম শিল্প - রেশম কীট তুঁত গাছে বাসা বাঁধে
2. লাক্ষা-শিল্প - ....
3.

জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য গুরুত্ব

বিনোদন এবং ভ্রমণ

1. পশুপাখিদের তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে দেখার আনন্দ।
2. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য জঙ্গলে ভ্রমণ।
3.

শিল্প ও সাহিত্যে প্রভাব

1. কোনো কোনো গাছ ও পশু পাখি অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের উপাস্য।
2. সাহিত্য রচনার উপাদান।
3.

বিভিন্ন জীবদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

1. খাদ্য-খাদক সম্পর্ক
2.

নীচের কর্মপত্রটা তোমার পরিবারের বা পাড়ার কোনো বয়স্ক ব্যক্তির সাহায্যে ভরতি করো।

কর্মপত্র

তোমার নাম: স্থান: তারিখ:

1. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত, অথচ এখন আর দেখা যায় না, এইরকম কয়েকটা উদ্ভিদের নাম লেখো।

....

2. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত, অথচ এখন আর দেখা যায় না, এইরকম কয়েকটা প্রাণীর নাম লেখো।

....

3. এইসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর হারিয়ে যাওয়ার পিছনে কী কী কারণ আছে বলে মনে হয়?

হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ বা প্রাণীর নাম	হারিয়ে যাওয়ার কারণ
(i) বট	(i) কেটে ফেলা হচ্ছে
(ii)	(ii)
(iii)	(iii)

4. এইসব প্রাণী বা উদ্ভিদেরা হারিয়ে যাওয়ায় তোমাদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি হয়ে থাকলে সেগুলো কী কী? ....।

5. তোমার এলাকায় আগে দেখা যেত না, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে এমন নতুন ধরনের কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণী কি এসেছে? যদি এসে থাকে, তদের নাম লেখো। ....

....।

6. এই নতুন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী তোমার এলাকায় আসার ফলাফল কী হতে পারে বলে মনে হয়?

কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এসেছে	কী ক্ষতি বা লাভ হয়েছে

7. তোমার এলাকায় কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের সংখ্যা কী আস্তে আস্তে কমছে? তাদের নাম লেখো।

উদ্ভিদ	**প্রাণী**

8. এইসব উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংখ্যা কমার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

....।

9. তোমার এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কী কী করা যেতে পারে নীচে লেখো।

i) iii)

ii) iv)

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ

এবার এসো আমরা জানার চেষ্টা করি আমাদের পৃথিবী গ্রহে জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাসের পিছনে কী কী কারণ আছে।

1. হারিয়ে যাচ্ছে বাসস্থান

প্রকৃতি থেকে জীবদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে একটা বড়ো কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আমাদের ভোগবিলাসের সামগ্রী তৈরির প্রয়োজনে (যেমন কাঠের শৌখিন আসবাবপত্র), কখনও বা চাষের জমি বাড়ানোর জন্য, আবার কখনও বা থাকার জায়গা বাড়ানোর জন্য জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলা হয়। এমনকি পুরো জঙ্গলও সাফ করে ফেলা হয়।

সাইবেরিয়ার বাঘের (Siberian Tiger) অস্তিত্ব সংকটের অন্যতম কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

জীবের থাকার জায়গা নানা কারণে ধ্বংস হতে পারে। চট করে কয়েকটা কারণ লেখার চেষ্টা করো।

জীবের থাকার জায়গা ধ্বংস হওয়ার কারণ	
1. কাঠের জন্য জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলা।	3.
2.	4.

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

কাঠের জোগানের জন্য সুন্দরবনের পুরো জঙ্গল একদিন উধাও হয়ে গেল : ....
....।

2. অবৈধ শিকার/ চোরাশিকার

চোরাশিকারিদের লোভ অনেক প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে কিছু কিছু বন্য জন্তুর হাড়, চামড়া ইত্যাদি ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও দাঁত, চামড়া বা শিং — এসবের লোভেও বিভিন্ন প্রাণী চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ হারায়।

এসো তো খুঁজে দেখার চেষ্টা করি কোন কোন প্রাণী এইসব জিনিসের জন্য চোরাশিকারিদের লোভের বলি হয়।

প্রাণীদের হত্যা করে পাওয়া জিনিসের নাম	কোন কোন প্রাণী হত্যা করে পাওয়া যায়	কী কাজে ব্যবহার করা হয়	প্রাণী হত্যা না করেও কীভাবে ওই জিনিস পাওয়া সম্ভব
1. দাঁত			
2. চামড়া			
3. শিং			
4. লোম বা ফার			
5. মৃগনাভি			

এইভাবে চোরা শিকারের কবলে পড়ে গন্ডার, বাঘ, হাতি এরকম অনেক বন্য প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে।
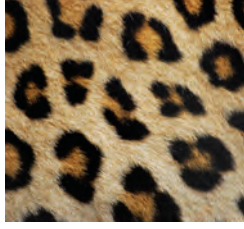
এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

চোরাশিকারের ফলে একটা বনে বাঘ বা অন্য বড়ো মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে গেল : ....
....।

3. পরিবেশে নতুন জীবের আগমন

বাইরে থেকে আসা নতুন প্রাণী অনেক সময় স্থানীয় প্রাণীদের সংখ্যা হ্রাসের কারণ হয়। যেমন বিংশ শতাব্দীতে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বাইরে থেকে কুকুর, শুয়োর আর ছাগল নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ছাগলরা কচ্ছপের খাবার যেমন ঘাস, পাতা খেয়ে নিত। আবার কুকুর, শুয়োরেরা খেত কচ্ছপের ডিম। ফলে একসময় দেখা গেল কচ্ছপের সংখ্যা কমে গেল। গ্রাম বাংলার জলাভূমিতে আফ্রিকা থেকে তেলাপিয়া আর বিশাল মাগুর জাতের মাছ এনে ছেড়ে দেওয়ার ফলে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে মৌরলা, পুঁটি, খলসের মতো স্থানীয় মাছেদের।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

একটা জলাশয়ে এমন কিছু মাছ এনে ছেড়ে দেওয়া হলো যারা অন্য ছোটো মাছদের খেয়ে নেয় : ....
....।

4. জলবায়ুর পরিবর্তন :

জলবায়ুর পরিবর্তন পালটে দিতে পারে জীবের চেনা পরিবেশ। আর কোনো জীব নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারলে সেই জীবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। আর তার ফলে মেরু ভালুকের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। বরফ গলে যাওয়ার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে এম্পারার পেঙ্গুইন, মেরু শিয়ালের মতো প্রাণীরা।

মহাসাগরের জলের অম্লত্ব ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছে বিভিন্ন কোরাল বা প্রবালরা।

পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়ায় ইউক্যালিপটাস গাছের পাতার খাদ্যগুণ যাচ্ছে কমে। এর ফলে সমস্যায় পড়ছে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা (Koala) ভালুক - যাদের খাবার এই ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেল: ....।

5. পরিবেশ দূষণ

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অনেক সময় ডেকে আনতে পারে জীবের বিনাশ। চাষের জমিতে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে হারিয়ে গেছে বেশ কিছু শস্যভুক পাখি। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য পদার্থ খাল, বিল, নদীর জলে এসে মিশছে। এর ফলে বহু মাছ ও জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এসে পড়ায় প্রচুর মাছের মৃত্যুর খবর হয়তো তোমরা অনেকে পড়েছ।

শিল্প আর কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ গঙ্গায় এসে মেশে। ফলে গঙ্গায় মাছের সংখ্যা খুব কমে গেছে। সেই সঙ্গে বিপন্ন হচ্ছে গঙ্গার শুশুক (Gangetic Dolphin)।

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো

নদীর জলে কলকারখানার দূষিত পদার্থ ফেলা হলো : ....।

6. অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার

কোনো বিশেষ উদ্ভিদ বা প্রাণীর অর্থকরী গুরুত্ব যদি খুব বেশি হয়, তবে অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ওইসব জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

হিমালয়ের কস্তুরী মৃগ (Musk Deer) হলো এরকমই এক প্রাণী। এদের থেকে পাওয়া যায় মৃগনাভি। আর এই মৃগনাভি থেকে তৈরি হয় নানা সুগন্ধি দ্রব্য। মানুষের সুগন্ধি দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্খা মেটাতে গিয়ে এই প্রাণীর অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে।

এসো এবারে লিখে ফেলি অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এমন কোন কোন জীবকে আমরা খুব বেশি মাত্রায় আমাদের কাজে লাগাচ্ছি।

জীবের নাম কী	কী কী প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়

এমন যদি হয় কী হবে ভেবে দেখো তো :

গাছের কোনো অংশ থেকে ওষুধ তৈরি হয়, এমন গাছকে বেশি মাত্রায় কাজে লাগানো :............
....।

পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য হ্রাস

গত 500 বছরে 784 টি প্রজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে আছে 338 টি মেরুদণ্ডী প্রজাতি, 359 টি অমেরুদণ্ডী প্রজাতি ও 87 টি উদ্ভিদ প্রজাতি । গত 20 বছরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রায় 27 টি প্রজাতি।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় 15,500 টি প্রজাতি ধ্বংসের মুখে।

যে জীবগুলি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে তাদের কয়েকটি হলো :

বাংলার বাঘ

বাংলার শকুন

একশৃঙ্গ গন্ডার

গঙ্গার শুশুক

চিতা

শিম্পাঞ্জি

ওরাং ওটাং

গিংকো

গরিলা

বর্জ্য ও মানব স্বাস্থ্যের ঝুঁকি

1. .... 2......................... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

ওপরের ছবিগুলিতে কোন কোন উৎস থেকে বর্জ্য বেরোচ্ছে তা ছবির নীচে উল্লেখ করো।

ওপরের ছবিগুলিতে থাকা বিভিন্ন বর্জ্যের উৎস প্রকৃতি ও উপাদান উল্লেখ করো।

ক্রমিক নং	বর্জ্যের উৎস	বর্জ্যের প্রকৃতি (কঠিন/তরল/গ্যাসীয়)	বর্জ্যের উপাদান
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

ওপরের ছবিগুলো থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন বর্জ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। এবার তোমার এলাকার বর্জ্য মানচিত্র তৈরি করো।
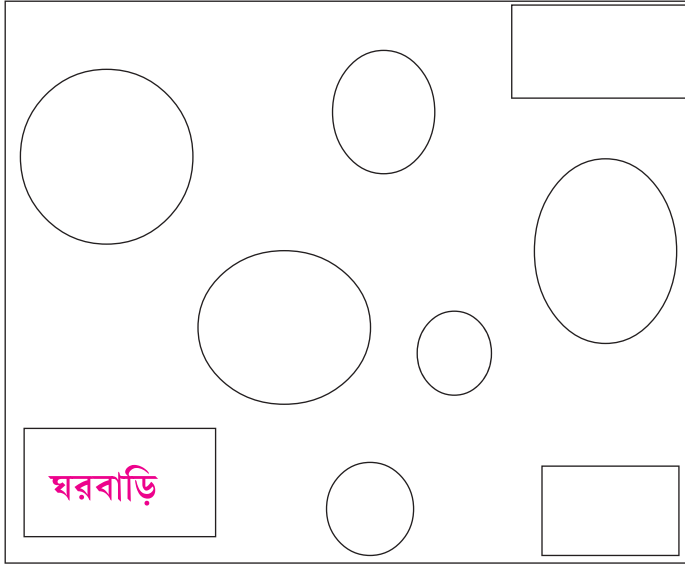
- বিদ্যালয়
- চালকল
- পুকুর
- চাষের ক্ষেত
- হাসপাতাল
- বাজার
- খেলার মাঠ
- বাসস্ট্যান্ড
- ঘরবাড়ি

ওপরের বিভিন্ন উৎস থেকে কী কী বর্জ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার তালিকা ও প্রকৃতি নির্ণয় করো।

উৎস	বর্জ্যের নাম	বর্জ্যের প্রকৃতি
1. বিদ্যালয়		
2. চালকল		
3. পুকুর		
4. চাষের ক্ষেত		
5. হাসপাতাল		
6. বাজার		
7. খেলার মাঠ		
8. বাসস্ট্যাণ্ড		
9. ঘরবাড়ি		

ওপরের বিভিন্ন উৎস থেকে যে সব বর্জ্য নির্গত হয় তার মধ্যে কতকগুলো মানব শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মলমূত্রের মাধ্যমে জীবাণুরা পানীয়জল বা খাদ্যের উৎসে মিশলে এবং পরবর্তী সময়ে সুস্থ মানবশরীরে প্রবেশ করলে নানারকমের রোগের প্রকাশ ঘটে।

রোগগুলো হলো :

1. বাহক (মশা, মাছি, ইঁদুর, ..., ...) দ্বারা সংক্রামিত রোগ — ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়ারিয়া, প্লেগ, ..., ...।

2. হাসপাতালে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিত্যক্ত বা রোগীর ব্যবহৃত উপাদান দ্বারা সংক্রামিত রোগ — হেপাটাইটিস, ..., ..., ...।

3. কলকারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন অপরিশোধিত যৌগ বা ধাতু থেকে সংক্রামিত রোগ — ক্যানসার, স্নায়ুরোগ, হাড়ের যন্ত্রণা, চর্মরোগ, ..., ...।

এবার তোমার চেনা পরিচিত অথবা কোনো প্রতিবেশীর দেহে এমন কী কোনো সমস্যা রয়েছে? খুঁজে দেখে নীচে লেখো :

তিনি কোথায় কাজ করেন	কী কারণে হয়ে থাকতে পারে	সমস্যাটি কী	কী করণীয়
1. অ্যাসবেস্টসের কারখানায়	অ্যাসবেস্টস	ফুসফুসের সমস্যা	ডাক্তারেরপরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন
2.			
3.			
4.			

তাহলে এই সকল রোগ আর ঝুঁকির জন্য আমাদের কী কী অসাবধানতা আর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দায়ী তা চিহ্নিত করো।

রোগ/ ঝুঁকি	কারণ	কোন অসাবধানতা/ অস্বাস্থ্যকর আচরণ দায়ী	কী করা দরকার
হেপাটাইটিস	পানীয় জলে ভাইরাসের সংক্রমণ	দূষিত জল পান করা ...., ...,	জল ফুটিয়ে খাওয়া,

পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা

পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষ্যে পীযূষদের স্কুলে এবার আলোচনার বিষয়-পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা। সে উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েরা নানা ছবি এঁকে এনেছে।

1.

2.

3.

4.

5.
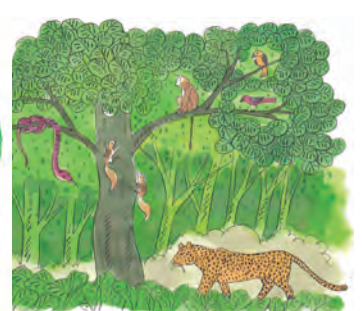
6.

ওপরের ছবিগুলো দেখিয়ে স্যার বললেন— তোমার জীবনে গাছের ভূমিকা কী কী হতে পারে তা নীচে লেখো।

গাছ না থাকলে কী হয়	গাছ থাকলে কী হয়
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

সিধু একটা বইতে সে দিন পড়ল আমাজন নদীর দু-পাড়ের মাইলের পর মাইল ঘন জঙ্গল নাকি রাবার চাষের জন্য কাটা পড়ছে। বিজ্ঞানীরা এজন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একথা বলায় স্যার বললেন, গাছ ছাড়া আমরা বাঁচার কথা ভাবতেও পারি না। এসো এবার আমরা আলোচনা শুরু করি গাছ পরিবেশ রক্ষায় কী কী ভূমিকা পালন করে।

বায়ুমণ্ডল ও গাছ

সূর্যের আলো পেলে গাছের সবুজ পাতার পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। আর তা দিয়ে প্রবেশ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। সূর্যের আলো, জল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে লাগিয়ে গাছ খাদ্য তৈরি করে নিজে পুষ্ট হয়। আজ থেকে প্রায় 350 কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির প্রথম দিকে, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল খুব কম। আনুমানিক 250 কোটি বছর আগে প্রথমে কিছু অণুজীব সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করে। আরো অনেক পরে গাছ সালোকসংশ্লেষের ফলে প্রচুর O_2 গ্যাস ছাড়তে শুরু করলো। সালোকসংশ্লেষের সময় অণুজীব ও গাছেরা শোষণ করতে শুরু করল CO_2। এতে বাতাসের উপাদানের পরিমাণ ধীরে ধীরে বদলে গেল। তবে সবধরনের উদ্ভিদের CO_2 শোষণ ক্ষমতা সমান নয়।

টুকরো কথা

কানাডার সরলবর্গীয় প্রাচীন বনভূমিতে খুব কম পরিমাণে CO_2 শোষিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু ইউরোপ, চিন বা সাইবেরিয়ার নতুন তৈরি বনভূমিতে ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটে। বায়ুতে CO_2 -এর ঘনত্ব যত বাড়ছে এসব অরণ্যের গাছরাও অতিরিক্ত CO_2 শোষণের জন্য নিজেদের বদলে নিচ্ছে। বিদেশে ওক, বার্চ কিংবা মেপল গাছে শীতের শেষে নতুন পাতা গজানোর সময় প্রায় 20-25 দিন এগিয়ে এসেছে। আর শেষপাতা ঝরে পড়ার সময়ও প্রায় 10-12 দিন পিছিয়ে গেছে। ফলে এরা আরও বেশিদিন ধরে CO_2 শোষণ করতে পারছে।

যে পাতার ক্ষেত্রফল যত বেশি তার CO_2 গ্যাস শোষণের হার তত বেশি। নীচের গাছগুলোর মধ্যে কোন কোন গাছের পাতা একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেশি CO_2 গ্যাস বাতাস থেকে নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? (তেঁতুল, শাল, কাঁঠাল, ধান, আখ, আলু, বট, কদম, ছাতিম, পাইন, গরান, ঘাস)

গাছ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

পৃথিবীতে মোট জীবের প্রায় 99% হলো উদ্ভিদ। আর মাত্র 1% হলো প্রাণী। সবুজ গাছপালা খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি জমিয়ে রাখে, তার 10-20% শক্তি প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতে ব্যয় হয়। অরণ্য যদি কমতে থাকে তাহলে এসব প্রাণীর বেঁচে থাকার শক্তিতেই টান পড়বে। আজকের পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন লাখ জাতের উদ্ভিদবৈচিত্র্য দেখা যায়। আর প্রাণীবৈচিত্র্য হলো প্রায় দশ লাখের মতো। এর মধ্যে প্রায় সাত লাখ প্রাণীর খাদ্য হলো গাছপালার নানা অংশ বা সম্পূর্ণ গাছ।

তোমার জানা নীচের প্রাণীগুলো কীভাবে অরণ্যের উদ্ভিদের ওপর খাদ্যের বিষয়ে নির্ভরশীল তা নীচের তালিকাতে উল্লেখ করো :

প্রাণীর নাম	কী খায়, আর তা কোথা থেকে পায়	সারাবছর একই পরিমাণ খাদ্য পায় কি?	উৎসগুলো নষ্ট হলে ভবিষ্যতে প্রাণীগুলো কী হতে পারে?
হরিণ			
হাতি			
একশৃঙ্গ গন্ডার			
বাদুড়			
কাঠবিড়ালি			
ধনেশপাখি			
লালপান্ডা			

গাছ ও খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

অরণ্যে সূর্যের আলো ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। আর নানা অঙ্গে তারা খাদ্য সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত খাদ্য নানা প্রাণী ব্যবহার করে। তাই অরণ্যে উদ্ভিদরা হলো উৎপাদক আর প্রাণীরা হলো খাদক। খাদ্য-খাদকের এই সম্পর্কটাই হলো খাদ্যশৃঙ্খল। অরণ্য যতো বড়ো হয়, অরণ্যে গাছপালার যত বৈচিত্র্য বাড়ে তত নতুন নতুন খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি হয়। আর একটা খাদ্যশৃঙ্খল অন্যান্য খাদ্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তৈরি করে খাদ্যজাল।

ওপরের ছবিতে যে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নীচে লিখে সম্পূর্ণ করো:

1. ফুলের মধু → ☐ → ☐
2. গাছের পাতা → ☐ → ☐
3. মশার লার্ভা → মাছ → ☐
4. গাছের ডাল → ☐
5. শস্যের দানা → ☐ → ☐
6. মাছ → ☐ → ☐
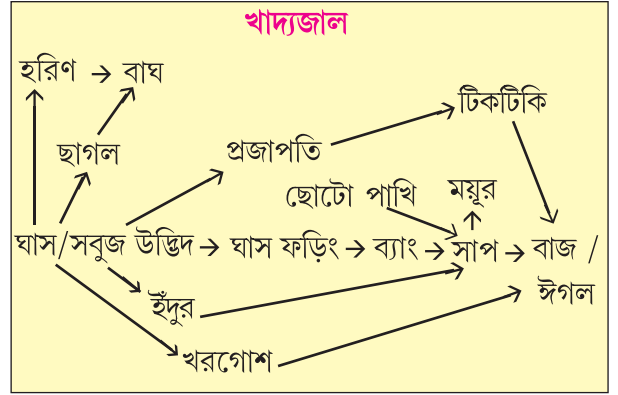
এবার নীচের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলির সাপেক্ষে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করো।

ঘাস, ছাগল, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ, মাছরাঙা, বক, চিল, ইঁদুর, বাজপাখি, ধানগাছ, মাজরা পোকা, মুরগি, চিতাবাঘ, জেব্রা, সিংহ, গন্ডার, বাঘ।

খাদ্যশৃঙ্খলের ক্রমিক সংখ্যা	খাদ্যশৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত জীব	খাদ্যশৃঙ্খলের চেহারা
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

গাছ ও জলচক্র

সিধু বইতে আমাজন, মালয়েশিয়া, কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালি আর আফ্রিকার বর্ষা অরণ্যের কথা পড়ছিল। গাছ থেকে এত জল বাষ্পীভূত হয় যে এসব অরণ্যে সারা বছরই নাকি বৃষ্টি হয়। অরণ্যের গাছপালার ঘন আবরণ জলীয় বাষ্পকে উবে যেতে দেয় না। সেই বাষ্প ঘন হয়ে জমে ফোঁটা ফোঁটা জল হয়ে মাটিতে পড়ে। তারপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিশে জলের সোঁতা তৈরি করে। সোঁতাগুলো মিলতে মিলতে একসময় নদীর জন্ম হয়।

বর্ষার জলও নানা ঢাল বেয়ে নেমে একসঙ্গে মিলে নদীর জন্ম দেয়। হিমালয়ের বরফগলা জলে জন্ম নেওয়া নদীরা বাদে ভারতবর্ষের আর সব নদীর-ই জন্ম কিন্তু এভাবে। পর্বতের ঢাল যদি অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা না থাকে তাহলে সেই জলও তাড়াতাড়ি উবে যায় বাষ্প হয়ে। জলকে বাষ্প হতে না দিয়ে মাটির ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির তলায় ওই জলকে জমতে সাহায্য করে অরণ্য। কুয়ো খুঁড়ে বা টিউবওয়েল বসিয়ে আমরা সেই জল পাই। জঙ্গলে যদি লম্বা আর বড়ো পাতাযুক্ত গাছ বেশি থাকে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে, জল বিশুদ্ধ থাকে এবং জলের প্রবাহও নিয়ন্ত্রিত হয়।

গাছ ও পরিবেশের তাপমাত্রা

স্কুলে যাওয়ার পথে মৌমিতারা গরমের দিনে কিছুক্ষণ বট গাছটার নীচে দাঁড়ায়। ডালপালা ও পাতার ছাউনি দিয়ে ছাতার মতো কাজ করে ওই গাছটা। গাছের নীচে মাটিতে পা রাখলে ওরা বুঝতে পারে মাটি কত ঠান্ডা। আমবাগানের আম পাহারা দিতে দিতে রহিমদের মাঝে মাঝে আরামে ঘুম চলে আসে। একটা বড়ো আমগাছ জল বাষ্প করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। জল বাষ্প করতে উদ্ভিদদেহ থেকে তাপ শোষিত হয়। এরফলে আশেপাশের পরিবেশও ঠান্ডা হয়ে যায়।

তোমার বাড়ির আশেপাশের আর এরকম কোন কোন গাছ পরিবেশের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে?

1. 2. 3. 4.

গাছ ও ঝড়ের গতিবেগ

কয়েকবছর আগে 'আয়লা' নামক এক সামুদ্রিক ঝড় ধেয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের দিকে। এরকম ঝড়ের মধ্যেই রফিক, নিরঞ্জনদের বাবা-কাকারা মাঝেমধ্যেই যায় সুন্দরবনে মাছ ধরতে। ওর মুখে একথা শুনে স্যার হেসে বললেন - এত প্রবল ঝড়েও দ্বীপগুলোর তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। বাদাবনের গরান, হেঁতালের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বাতাসের বেগ কমে যায়। এভাবেই তো শত শত বছর ধরে বাদাবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঝড়ের বেগ ষাট থেকে আশি শতাংশ কমিয়ে দেয়। যেসব দেশে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন এত গভীর বা ঘন হয় না, সেখানে নাকি প্রায়ই এরকম ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়। প্রচুর লোক মারা যায়। বাড়িঘরের ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

এবার বলো তো —

1. বাতাসের গতি কমাতে গেলে গাছের সারি কেমনভাবে লাগানো উচিত ? (বাতাসের গতির সাপেক্ষে সমান্তরাল / আড়াআড়ি ভাবে)।

2. তুমি এরকম বাতাসভাঙা আর কোন কোন গাছের কথা জানো? বট, ঝাউ, ...।

গাছ ও পরিবেশ দূষণ

গরমকালে আমগাছগুলোকে দেখলে ইতুর মায়া হয়। কেমন ধুলোয় ভরা। স্যার ইতুর কথা শুনে বললেন — এত রাসায়নিক পদার্থ, আর গ্যাস বাতাসকে ক্রমাগত দূষিত করছে। আর এই দূষণ থেকেই তো মানুষের এত রোগ। ইতু শুনে বলল — তাহলে আমাদের সামনে খুব বিপদ।

স্যার শুনে বললেন— কদম, বেল, শিরীষের মতো গাছের পাতা এইসব কণাকে ছাঁকনির মতো আটকে রাখে।

ইতুর এবার জানার ইচ্ছে হলো — কোন ধরনের গাছরা ধূলিকণা আটকাতে পারে?

— যেসব গাছের পাতা চওড়া ও লম্বাটে ধরনের তারা বেশি দূষক পদার্থ ধারণ করতে পারে। এরকম তিনটি গাছ হলো— 1. বট 2. আম 3. অশ্বত্থ।

এছাড়াও রাস্তার ধারে চলার সময়ে তুমি লক্ষ করবে কোন কোন গাছের পাতা ওই ধরনের। আবার যে সব গাছে যৌগিক পাতা দেখা যায় তারাও ধোঁয়ার বিভিন্ন গ্যাস শুষে নেয়, ধুলোগুলো পাতার ওপর জমতে থাকে । এরকম গাছগুলি হলো— 1. কৃষ্ণচূড়া 2. গুলমোহর 3. 4. 5.

গাছ ও মাটির ক্ষয়

কিছুদিন ধরেই অম্লান লক্ষ করছে নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে। ও জানে এই অল্প বৃষ্টিতেই যদি জল এমন বাড়ে তবে সামনে ভরাবৃষ্টির মরশুমে আবার বন্যা হবে। দুর্গতির সীমা থাকবে না। কেন এমন হয়?

— মাটির ওপর যদি ঘাসের মোটা চাদর না থাকে ।

স্যারের উত্তর শুনে অম্লান কিছুক্ষণ ভাবল। গোরুগুলো যখন ওরকম ঘাসশূন্য মাটিতে চরে, তখন ওদের খুরের ঘষায় মাটির চাঙড় উঠে যায়।

— এর ফলে দুটো ক্ষতি হয় :

(i) জলেভেজা মাটির স্তর ওপরে উঠে আসে। এই জল সূর্যের আলোর প্রভাবে বাষ্প হয়ে গেলে মাটির কণা আরও আলগা হয়ে যায়।

(ii) বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লেই আলগা মাটি ধুয়ে নদীতে চলে যায়।

নদীর গর্ভে যদি এভাবে ক্রমশ পলি জমতে থাকে তবে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে। সামান্য বৃষ্টিতেই দু-কূল উপচে জল চলে আসে বসতি এলাকায়। এজন্য আগে যেসব অঞ্চলে বন্যা হতো না, আজকাল সেখানেও বন্যা হচ্ছে। আর ওপরের মাটির সঙ্গে পুষ্টিও ধুয়ে চলে যাওয়ায় মাটিও উর্বরতা হারাচ্ছে।কোন ধরনের গাছ মাটিতে পুঁতলে এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়? ....।

গাছ ও জীবের আশ্রয়স্থল

তোমার বাড়ির পাশে যদি কোনো আম/বট/অশ্বত্থ/শিমুল/তেঁতুল বা অন্য কোনো বড়ো গাছ থাকে তবে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখো তো গাছে কোন কোন প্রাণী বাস করে।

1. পোকামাকড় —
2. পাখি —
3. স্তন্যপায়ী —
4. সরীসৃপ —

একটা গাছ যদি এত প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, তবে বুঝতেই পারছ একটা বনে কত রকমের প্রাণী থাকতে পারে। এবার বলো তো নীচের অরণ্যগুলিতে কোন কোন প্রাণী থাকে বা থাকতে পারে।

1. সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যে (সূঁচের মতো পাতাযুক্ত গাছের বন) — তুষারচিতা, লালপান্ডা, ..., ...।
2. পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে — বাঘ, হাতি, ..., ...।
3. ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের অরণ্যে — বাঘ, খাঁড়ির কুমির, ..., ...।
4. ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের অরণ্যে — একশৃঙ্গ গন্ডার, হরিণ, ..., ...।
5. জলাভূমি সংলগ্ন অরণ্যে — বেজি, ভোঁদড়, ..., ...।
6. বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড়ে — গোসাপ, শেয়াল, ..., ...।

গাছ ধ্বংস হওয়ার জন্যই আজ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কত প্রাণী। এরকম কয়েকটি বিপন্ন প্রাণীর নাম করো যারা বেঁচে থাকে গাছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে।

প্রাণীর নাম	খাদ্য/আশ্রয়দাতা গাছের নাম
1. হাড়গিলে	
2. প্যাঁচা	
3. ভাম	
4. হনুমান	

গাছ ও শব্দদূষণ

আজ কদিন ধরে যাত্রার প্রচার উপলক্ষ্যে মাইকটা দিনরাত বেজে চলেছে। কবীরের কান ঝালাপালা। বুকটাও কেমন ধড়ফড় করছে। ও বুঝতে পারছে না রাতে শোয়ার অনেকক্ষণ পরেও ঘুমটা কেন আসছে না। শব্দ এভাবেই নাকি আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। গাছ শব্দের এই তীব্রতাকে কোনোভাবে কমাতে পারে কী?

— শব্দকে জব্দ করতে পারে বেল, ছাতিম ও জারুলের মতো গাছ। বনের গভীরতা যত বাড়ে শব্দের প্রাবল্য তত কমে। শব্দের প্রাবল্য কমানোর জন্য তুমি ‘অরণ্য সপ্তাহে’ কোথায় কোথায় গাছ পুঁতবে -

1. যানবাহন চলাচলের পথের দু-পাশে
2.
3.
4.
5.

পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষ্যে পীযূষরা গাছের এত উপকারের কথা জানতে পেরে অবাক হয়ে গেল। পরিবেশবিদ প্রধান অতিথি বললেন — সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য পরিবেশের সবরকম জৈব ও অজৈব উপাদানের ভাণ্ডার। উপকূলবর্তী অঞ্চলকে বছরের পর বছর ধরে উর্বর রেখেছে। একটা পরিণত ম্যানগ্রোভ

গাছ বছরে প্রতি এক হেক্টর জমিতে 47 কেজি নাইট্রোজেন, 26 কেজি পটাশিয়াম, 99 কেজি ক্যালশিয়াম, 34 কেজি ম্যাগনেশিয়াম আর 32 কেজি সোডিয়াম সরবরাহ করে। এজন্য এদের বাঁচিয়ে রাখা খুব জরুরি। গাছ তথা অরণ্য ধ্বংস করলে মানুষ শুধু কাঠ পায়। কিন্তু তার ফলে পরিবেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এবার তাহলে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে তোমরা পরিবেশকে বাঁচায় এমন কোন কোন গাছ পুঁতলে তা লিখে ফেলো:

(i) বিদ্যালয়ে ....

(ii) রাস্তার দু-ধারে ....

(iii) চাষের জমির আশেপাশে ....

(iv) পুকুর পাড়ে ....

8 পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য

পরিবেশের সংকট ও দৈহিক স্বাস্থ্য

জ্বর মাপার জন্য আমরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করি? ....।

ইলেকট্রিক বালব বা টিউবলাইটের বদলে রাস্তায় ইদানীং কোন ধরনের আলো ব্যবহার করা হচ্ছে? ....।
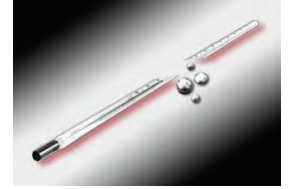
থার্মোমিটারে তরল রূপে বা ফ্লুওরেসেন্ট বালব তৈরি করতে বাষ্প রূপে একটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার করা হয়। ধাতুটি তরল প্রকৃতির। ধাতুটি কী? ....।

CFL

ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষ নানা প্রয়োজনে তামা, লোহা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, পারদ ও নিকেলের মতো বহু ধাতু ব্যবহার করেছে। এই সকল ধাতুর নানা অজৈব ও জৈব যৌগ মানুষের দেহে খাদ্য বা পানীয়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ থেকে প্রবেশ করেছে। আর তা থেকেই নানা রোগ দেখা দিচ্ছে।

টুকরো কথা

জাপানের সমুদ্রের ধারে এক ছোটো শহর হলো মিনামাতা। 1908 সালে সেখানে চিসো কর্পোরেশন একটা কারখানা খোলে। ওই কারখানা থেকে পারদ মেশানো বর্জ্য ক্রমাগত সমুদ্রের জলে মিশতে থাকে। 1930-এর দশক থেকে দেখা গেল ওখানে বেড়াল ও মানুষ এক অজানা কারণে মারা যেতে লাগল। 1956 সালে বহু মানুষের দেহে একইরকম উপসর্গ দেখা যেতে লাগল — পেশির খিঁচুনি, দেহ ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া, জিভ ও মুখের পেশি অসাড় হয়ে যাওয়া। অনেক বিকলাঙ্গ ও অন্ধ শিশুরও জন্ম হলো। খোঁজখবর করে জানা গেল যে ওই এলাকার আক্রান্ত মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রের মাছ ও কাঁকড়া খেয়েছেন। আর তার মধ্য দিয়েই বিষাক্ত পারদের যৌগ ওই মানুষদের দেহে প্রবেশ করেছে। আর তা থেকেই এই সংকটের সূচনা।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো মানুষের দেহে আর কোন কোন উৎস থেকে পারদ প্রবেশের ঝুঁকি থাকতে পারে।

(1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....।

সুবীর নস্করের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগণা আর মনোজ হেমব্রমের বাড়ি বীরভূম জেলায়। দীর্ঘদিন ধরে অন্যদের মতো ওরাও চামড়া ও দাঁত, হাড়ের সমস্যায় ভুগছে।

সুবীর নস্করের অসুখ	মনোজ হেমব্রমের অসুখ
(1) হাতের ওপরের তালুতে খসখসে উঁচু উঁচু ছোপ।	(1) দাঁতে ছোপ ছোপ দাগ।
(2) চামড়ার রং কালো।	(2) দাঁত ও হাড় প্রায়ই ভেঙে যায়।
(3) বুকে ও পিঠেতে কালো ছোপ।	(3) পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।
(4) পায়ের নানা জায়গায় ক্ষত।	(4) চলার সময় হাঁটু দুটি ঠোক্কর খায়।

সুবীর ও মনোজকে দেখে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইডের প্রভাবেই নাকি এই ধরনের অসুখ হয়।

টুকরো কথা

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার মাটির নীচে আর্সেনিকের বেশ কিছু খনিজের একটা স্তর আছে। কৃষিজমিতে সেচ ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভের জল নলকূপ দিয়ে তুলতে শুরু করে। নলকূপের মধ্য দিয়ে বায়ুর অক্সিজেন ঢুকতে শুরু করে। ওই অক্সিজেনের সঙ্গে আর্সেনিকের অদ্রাব্য খনিজ বিক্রিয়া করে নানা দ্রাব্য যৌগে পরিণত হতে শুরু করে। ওই যৌগ মেশানো জল দীর্ঘদিন ধরে পান করলে দেহে সুবীরের অসুখের মতো অসুখ দেখা যায়। এক লিটার জলে 0.05 মিলিগ্রাম বা তার বেশি মাত্রায় আর্সেনিক থাকলে সেই জল খাওয়া উচিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মালদহ জেলায় মাটির নীচে ফ্লুওরিনের কিছু খনিজ পদার্থ আছে। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভূগর্ভস্থ জলে কিছুটা ফ্লুওরাইড আয়ন দ্রবীভূত হয়। নলকূপের সাহায্যে ওই জল তুলে দীর্ঘদিন পান করলে মনোজের অসুখের মতো অসুখ দেখা যায়। এক লিটার পানীয় জলে 1.5 মিলিগ্রামের বেশি ফ্লুওরাইড থাকলে দাঁত ও হাড়ের নানা সমস্যা দেখা দেয়।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো মানুষের দেহে আর কোন কোন উৎস থেকে আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড প্রবেশের ঝুঁকি থাকতে পারে।

(1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....।

মানুষের বিভিন্ন পেশা-সমস্যা ও রোগ

পাশের ছবিগুলোর মতো এমন পেশায় অসংখ্য মানুষ আজ যুক্ত। দেখা যায়, দীর্ঘদিন ওই পেশায় যুক্ত থাকার পর ওইসব মানুষরা কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাহলে কী ওপরের ছবির মানুষরাও নানা রোগে আক্রান্ত? নীচের তালিকায় ওই সকল পেশায় যুক্ত মানুষদের সমস্যাগুলো লক্ষ করো। সংশ্লিষ্ট পেশা ও রোগের মধ্যে সমতা বিধান করো।(একই অসুবিধা/রোগ একাধিক পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে)

উপরের ছবিতে উল্লিখিত বিভিন্ন পেশা	সংশ্লিষ্ট রোগ
1. মোটর গাড়ি চালানো	(ক) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা, চোখের সমস্যা
2. কারখানায় কাজ করা	(খ) পায়ের পাতার হাড়ে সূক্ষ্ম চিড়
3. মাটি কাটা	(গ) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা
4. ফুটবল খেলা	(ঘ) হাড় ভেঙে যাওয়া, কার্টিলেজ ছিঁড়ে যাওয়া
5. উনুনের সামনে রান্না করা	(ঙ) হাঁটু মুচড়ে কার্টিলেজ ছিঁড়ে যাওয়া
6. খনিতে কাজ করা	(চ) ফুসফুসে কয়লার গুঁড়ো জমে যাওয়া
7. মাঠে ধান রোওয়া ও চাষ করা	(ছ) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা
8. ল্যাবরেটরিতে কাজ করা	(ঝ) হাতে ও ঘাড়ে ব্যথা
9. মাথায় করে ভারী জিনিস বহন করা	(ঞ) ঘাড়ে ব্যথা ও চোখের সমস্যা
10. মাংস কাটা	(ট) হাতের সমস্যা
11. হাতুড়ি ও ছেনি দিয়ে কাজ করা	(ঠ) ক্যানসার
12. চাষের জমিতে ফসল কাটা	

পেশাগত রোগের বিভিন্ন কারণ

মানুষ বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘ সময় থেকে কাজ করে। এ সকল ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাবক মানুষের শরীরে নানারকম প্রভাব ফেলে। এবার এসো দেখি কোন কোন প্রভাবকের জন্য মানুষের শরীরে নানা পেশাগত ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

(A) **ভৌত পরিবেশ :**

1) **আলো :** আলোর উৎসের ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করো—

(a) কেমন বাড়িতে থাকেন? খুব খোলামেলা/ অল্প খোলামেলা/কম খোলামেলা।

(b) কীরকম জায়গায় কাজ করেন? কারখানা/স্টুডিয়ো/ মাঠ/রাস্তা/বাজার/ বাস/ ট্রেন/খনি।

(c) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলোর উৎস কৃত্রিম না প্রাকৃতিক? ....।

(d) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলোর উজ্জ্বলতা কেমন ? ....।

(e) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় থেকে আলোর উৎসের দূরত্ব কত (পায়ে মেপে দেখো) ?
................................।

(f) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলো এক জায়গায় লাগানো নাকি হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করা যায়? .... ।

(g) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় ব্যবহৃত আলোর রঙের বৈশিষ্ট্য কী? .... ।

এবার ওপরের আলোচনার সাপেক্ষে নীচের পেশায় কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

- অন্ধকার খনিতে বা ডার্করুমে যারা একটানা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করেন .... ।
- চোখ ঝলসানো আলোর নীচে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করতে থাকলে .... ।
- মৃদু আলোতে দীর্ঘ সময় ধরে লেখালেখির কাজ করলে .... ।

শব্দভাণ্ডার : চোখের দৃষ্টিতে সমস্যা, পিঠে ও ঘাড়ে সমস্যা, মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরা।

(2) **এক্স রশ্মি :** রোগীর শরীরের ভেতর আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এই রশ্মি বেশি এবং বারবার সরাসরি কোশের সংস্পর্শে এলে কোশের ক্রিয়া অস্বাভাবিক করে দিতে পারে। এমনকি কোশ ধ্বংস করে দিতে পারে। ফলে মানবদেহের নানা অঙ্গে কী কী প্রভাব পড়তে পারে তা নীচে লেখো (শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে লেখো)।

(a) খাদ্যনালী .... ।

(b) ফুসফুস .... ।

(c) অস্থিমজ্জা .... ।

ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি পদার্থ ও তাদের যৌগ থেকে অবিরাম ভাবে কিছু অদৃশ্য রশ্মি বের হয়। এইসব রশ্মি ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

শব্দভাণ্ডার : রক্তকোশ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, বমির ভাব, খিদের ভাব না হওয়া, পাতলা পায়খানা, শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ, ক্যানসার।

এছাড়াও একাধিক ভৌত কারণে বিভিন্নরকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে এবং মানবদেহে নানা ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। নীচের তালিকাটি তোমরা বন্ধু বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে পূরণ করো।

পেশাগত ক্ষেত্রের ব্যাধি সৃষ্টিকারী অন্যান্য ভৌত কারণসমূহ	সৃষ্ট রোগ/উপসর্গসমূহ
1. বিদ্যুৎ	শক লাগা, ..., ...,
2. তাপ	পুড়ে যাওয়া ...., ..., ...,
3. শৈত্য	তুষার ক্ষত, ..., ...,
4. শব্দ	বধিরতা, ..., ...
5. তেজস্ক্রিয় পদার্থ	রক্তাল্পতা, ..., ...

(B) **রাসায়নিক পরিবেশ :** মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসেছে। নানারকম রোগও এর ফলে মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে। এবার তোমরা নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো—

1. প্রাচীন মিশরীয়রা পোড়ামাটির বাসনপত্র অলংকৃত করতে কোন ধাতুর যৌগ ব্যবহার করত? ....। (লোহা/তামা/জিঙ্ক)

2. খনির বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কোন গ্যাস থাকলে শ্রমিকদের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে?
   .... (হাইড্রোজেন/অক্সিজেন/কার্বন মনোক্সাইড)।

3. প্রসাধনী সামগ্রী, সুতিবস্ত্র ইত্যাদি রং করতে কোন রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়?
   .... (জল/সোডিয়াম ক্লোরাইড/ সংশ্লেষিত জৈব রঞ্জক)।

4. দেয়ালের রং, খেলনা, গাড়ির ব্যাটারি তৈরি করতে কোন ধাতু বা ধাতুর যৌগ ব্যবহার করা হয়?
............(লোহা/সোডিয়াম/সিসা)

ওপরের আলোচনায় আমরা রাসায়নিক পরিবেশের নানা ধরনের উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হলাম। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী এরা হলো —

রাসায়নিক প্রকৃতি	উপাদানের নাম
1. গ্যাস	............., ..., ..., ... ।
2. ধাতু	........, ... ।
3. সংশ্লেষিত যৌগ	............, ... ।

আদিম মানুষকে শিকার, পশুপালন কিংবা অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হতো। ফলে রক্তের ফ্যাট বা গ্লুকোজকে অনবরত পোড়াতে হতো। কিন্তু যন্ত্র যখন থেকে মানুষের নানা কাজে বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হতে থাকল পরিশ্রম ততই কমতে থাকল। বহু মানুষ এমন পেশায় যুক্ত হতে থাকলেন যেখানে কায়িক শ্রমের তুলনায় মানসিক শ্রম বেশি। চেয়ার-টেবিলে বসে লেখা, হিসেব-নিকেশ করা, কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করার মতো পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশির সঞ্চালন কম হয়। বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। এই পেশাগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের রক্তের গ্লুকোজ বা ফ্যাটকে সেভাবে পোড়ানোর দরকার হয় না। অতিরিক্ত গ্লুকোজ ও ফ্যাট রক্তে ক্রমাগত জমা হতে থাকে। এবার বন্ধুদের, শিক্ষক/শিক্ষিকা বা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো এধরনের পেশায় কোন কোন রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(1) ডায়াবেটিস (2) উচ্চ রক্তচাপ (3) ঘাড়ে ব্যথা, (4) অনিদ্রা, (5) ...., (6) .... ।

তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে-কোনো পেশাতেই কোনো না কোনো রোগের প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এবার নীচের পেশাগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কী কী রোগ হয় বা সমস্যা প্রকাশ পায় তা লেখার চেষ্টা করো।

পেশার নাম	সংশ্লিষ্ট রোগ/সমস্যা
1. যাঁরা চা পাতা তোলার কাজ করেন	
2. যাঁরা ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন	
3. যাঁরা কাঠের কাজ করেন	
4. যাঁরা মাল বহন করেন	
5. যাঁরা রিকশা টানেন	
6. যাঁরা উনোনের সামনে দীর্ঘ সময় রান্না করেন	
7. যাঁরা তুলো নিয়ে কাজ করেন	
8. যাঁরা হাসপাতালে কাজ করেন	
9. যাঁরা বিভিন্ন খনিতে কাজ করেন	
10. যাঁরা নির্মাণ শিল্পে কাজ করেন	
11. যাঁরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন	
12. যাঁরা নানা ধরনের কারখানায় কাজ করেন	
13. যাঁরা পাটকলে কাজ করেন	
14. যাঁরা বিভিন্ন জিনিস ফেরি করেন	

শব্দভাণ্ডার : বাত, পেশিতে খিঁচধরা, ঘাড়ে ব্যথা, বমিবমিভাব, কম বা বেশি খিদে পাওয়া, চোখজ্বালা, শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, ত্বকে ক্ষত, হাড় ভেঙে যাওয়া, অস্থিরতা, বধিরতা, আগুনে পুড়ে যাওয়া, ক্যানসার, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, হিট ক্র্যাম্প, আঙুলের ডগায় পচন, পায়ের শিরায় অসুখ।

স্বাস্থ্যের প্রকৃতি (দৈহিক, মানসিক)

স্বাস্থ্য বলতে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতাকে বোঝায় কেবল নীরোগ অবস্থাকে নয়। অনেক সময় আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যা বাইরে ধরা পড়ে না। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে নীরোগ দেখালেও ভিতর থেকে আমরা অসুস্থ।

তুমি তোমার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি কি করো ?

সকালে	দুপুরে	বিকালে	রাত্রে
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.

তোমার শেষ কবে শরীর খারাপ হয়েছিল? তখন কি হয়েছিল?

তখন কি কি অসুবিধা হয়েছিল ?
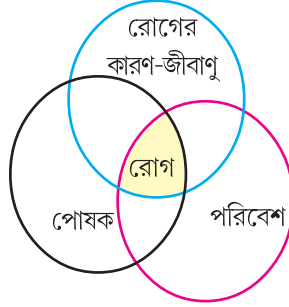
রোগ সৃষ্টির কারণ (যেমন জীবাণু, দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ ইত্যাদি) আর পোষক এই দুয়ের আন্তঃক্রিয়াই রোগ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন রোগের অনুকূল পরিবেশ (যেমন আর্দ্রতা , তাপমাত্রার পার্থক্য ইত্যাদির কারণে রোগ হয়)। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা করতে প্রয়োজন রোগপ্রতিরোধ। যা কয়েকটি ধাপে হতে পারে—

(1) টিকাকরণ কর্মসূচি, খাদ্যে বাইরে থেকে পুষ্টি উপাদান(আয়োডিন, আয়রন, ভিটামিন) যোগ করা।

(2) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।

(3) ভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন (Differently abled) মানুষের পুনর্বাসন।

(4) জীবনকুশলতা শিক্ষা।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তার মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়াও নানাসময়ে আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে হয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এসবের মধ্য দিয়েই সংবেদনশীল ও সমাজমনস্ক মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা হলো জীবনকুশলতা শিক্ষা।

Unicef, WHO পরিকল্পিত দশটি জীবনকুশলতা আমরা আলোচনা করব।

ভাবার কুশলতা	সামাজিক কুশলতা	বাধাবিপত্তি এড়ানোর কুশলতা
1. আত্মসচেতনতা 2. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা 3. সিদ্ধান্ত নেওয়া 4. সমস্যা দূর করা 5. সৃজনশীল চিন্তা	6. পারস্পরিক সংযোগস্থাপন 7. পারস্পরিক সম্পর্ক 8. সমানুভূতি	9. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ 10. আবেগ নিয়ন্ত্রণ

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে চারটি করে কার্ড দেওয়া হলো। এবার চটপট লিখে ফেলো তো।

1. ওপরের ছবিগুলোতে কি কি দক্ষতা দেখানো হয়েছে?
2. তোমার কি কি দক্ষতা আছে বলে মনে করো? (আলাদা কার্ডে লেখো)
3. তোমার কোন কোন কুশলতার বিকাশের প্রয়োজন আছে বলে মনে করো?

লেখা শেষে কার্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

World Health Organization (WHO)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের অধীন। বিশ্বের মানবসম্পদের স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করে। 1949 সালে 9ই এপ্রিল স্থাপিত হয়। হেডকোয়ার্টার হলো সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়।

UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে মানবিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। 1946 সালের 11ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে এই সংস্থা গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জরুরিকালীন খাদ্য এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই এই সংস্থা গঠিত হয়।

পাশের ছবিটিতে দেখানো গল্পটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।
তারপর নীচের কাজটি করে ফেলো।

গল্পে কাক কীভাবে তার সমস্যার মোকাবিলা করেছিল ?

সমস্যা কী কী ছিল	কাক কীভাবে সমাধান করেছিল
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

এবার তোমরা তোমাদের জীবনে সমস্যা সমাধানে কী কী কুশলতা প্রয়োগ করতে পারো তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো।

সমস্যা	জীবনকুশলতা
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

নিজেকে জানো

নীচের ছবিগুলিতে কি কি ধরনের অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে তা নীচের বক্সে লিখে ফেলো।
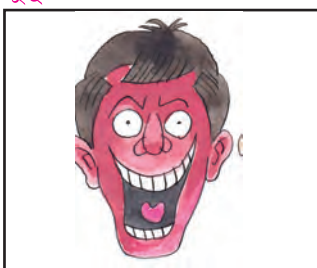
কর্মপত্র

1. আমার নাম : ....।

2. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক : ....।

3. আমার সবথেকে ভালো লাগে : ....।

4. আমার প্রিয় রং : ....।

5. আমার খুব আনন্দ হয় যখন: ....।

6. আমার খুব দুঃখ হয় যখন : ....।

7. আমার খুব রাগ হয় যখন : ....।

8. আমার শরীরে যা যা অসুবিধা হয় : ....।

9. অসুবিধা হলে আমার মনের অবস্থা : ....।

10. যেসব অসুবিধা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি : ....।

11. যেসব অসুবিধা এখনও রয়ে গেছে : ....।

12. বন্ধুদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য আমি যা যা করি :.......................................।

স্নায়ু ও মনের স্বাস্থ্য

সার্বিক স্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে শারীরিক এবং মানসিক দু-ধরনের স্বাস্থ্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে, যা থেকে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এটা উলটোদিক থেকেও সত্যি।

মানসিক সমস্যার কারণ:

1. জন্মগত ত্রুটি - গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ জন্মের পর শিশুর মন ও বুদ্ধির বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে।
2. মানসিক চাপ - আশেপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির চাপ (বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা) আমাদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। অনেক সময় সেই মানসিক চাপ আমরা সহ্য করতে পারি না।
3. আমাদের বাড়ির অভ্যন্তরের নানা টানাপোড়েন।
4. মানসিক দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত নিতে না পারা।
5. নেশা।

ওপরের কারণগুলির জন্য কী কী সমস্যা হতে পারে তা জানার চেষ্টা করো :

1. ডিসলেক্সিয়া (পড়া বুঝতে মনে রাখতে আর লিখতে অসুবিধা হয়। অক্ষর চিনতে ও লিখতে, বানান মনে রাখতে, অঙ্কের হিসাব করতে, নানা তথ্য মনে রাখতে আর বুঝতে অসুবিধা হয়।)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

এসো দেখি নীচের কারণগুলো কী কী ধরনের মানসিক সমস্যা তৈরি করে -

রামের দাদার তুলনায় রাম অনেক দেরিতে হাঁটতে, চলতে, কথা বলতে শেখে।

রামের সমস্যা

লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাওয়া
নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কাজে আগ্রহ হ্রাস
ডান-বাম চিনতে না পারা
নিজের কাজ করতে না পারা
সমাজে মানিয়ে চলতে না পারা
হতাশা ও অবসাদ

সমস্যাটি হলো মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

আয়েষা দু-বছর বয়স পর্যন্ত অন্য শিশুদের মতোই ছিল, তারপরে ওর বাবা -মা এই সমস্যাগুলো লক্ষ করতে থাকেন।

আয়েষার সমস্যা

একই কাজ বারবার করা
আত্মীয় পরিজনদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া
সামান্য উত্তেজনাতেও অতিরিক্ত সংবেদনশীল
অনেকসময় বেশি উত্তেজনাতেও সাড়া দেয় না
অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে না
পড়াশোনায় পিছিয়ে যাওয়া

সমস্যাটি হলো অটিজম।

জোসেফের সমস্যা

ক্লাসে স্থিরভাবে বসতে পারে না।
সহপাঠীদের ক্রমাগত বিরক্ত করে।
একই কাজে বা খেলায় মনোনিবেশ করতে পারে না।
বাড়িতেও একই সমস্যা চলতে থাকে।
রেগে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

অফিস থেকে ফেরার পর জোসেফের বাবা প্রায়ই ভীষণ রেগে থাকেন ও কারণে-অকারণে ওকে মারধর করেন।

সমস্যাটি হলো মনোযোগহীনতা।

তানিয়া ও রোহনের সমস্যা

ক্রমাগত উদবেগে ভোগা।
শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি।
উদ্যোগহীনতা।
উদবেগজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা।
কখনো-কখনো ভীষণ রেগে যাওয়া।

তানিয়া রোহন দুই ভাইবোন। মা বাবা ভীষণ কড়া। কখন এবং কেন শাস্তি পেতে হবে, সেই ভয়ে দুজন তটস্থ থাকে। ওরা মায়ের কাছে বসতে ভয় পায়। পারতপক্ষে চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। তানিয়ার প্রায়দিনই রাতে ঘুম আসে না। খিদেও পায় না। রোহনের অবস্থা ঠিক তার উলটো।

সমস্যাটি হলো মানসিক উদবেগ।

সমীরের সমস্যা

বানান করে পড়তে অসুবিধা।
নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।
পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব।
পড়াশোনার বাইরে কোনো একটা বিষয়ে অন্যদের তুলনায় বিশেষ পারদর্শী।

সমস্যাটি হলো পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া।

লিখতে এবং অঙ্ক করতে সমীরের ভীষণ অসুবিধা

রতনের সমস্যা

খিদে খুব বেড়ে যাওয়া।
ঘুম বেড়ে যাওয়া।
প্রায় সময়েই কাঁদা।
মন খারাপ করে একা একা বসে থাকা।
সবসময় অসহায় বোধ করা।

সমস্যাটি হলো মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেসন।

সবসময় খেতে ও ঘুমোতে রতনের খুব ভালো লাগে।

মনোবিদ ও মনোচিকিৎসক

মনোবিদরা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেখভাল করেন। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েনে আমরা মনোবিদদের সাহায্য নিই। তাঁরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা শনাক্তকরণ ও তার থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দেন।

মনোচিকিৎসকদের কাজ প্রায় মনোবিদদেরই মতো। তবে অনেকসময় যেখানে ওষুধের দ্বারা মানসিক রোগ নিরাময় সম্ভব এবং যেখানে শারীরিক ও মানসিক অসুখ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেখানে মনোচিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আমরা যা কিছু করি:

1. ব্যবহারিক পরিবর্তন (কু-অভ্যাস শনাক্তকরণ ও দূরীকরণ)
2. মনোবল বৃদ্ধি (কোনো কুঅভ্যাস ছাড়ার জন্য মনের জোরকে বাড়িয়ে তোলা)
3. মনের কথা খুলে বলা।
4. বিতর্কিত ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করা।
5. ধ্যান ও একাগ্রতা বৃদ্ধি।
6. পাঠক্রম-বহির্ভূত ব্যাপারে চর্চা — ছবি আঁকা, গান, খেলাধুলা ইত্যাদি।

ওপরের বিষয়গুলি দেখে তুমি তোমার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি কি করবে তার তালিকা তৈরি করো :

1. --।
2. --।
3. --।
4. --।
5. --।
6. --।

নীচের ছবিগুলো থেকে তুমি কোনগুলোকে বেছে নেবে তোমার রাগ কমানোর জন্য এবং কেন?

রাগ কমানোর উপায়	রাগ কমানোর উপায়টি কেন বেছে নিলে

সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার

বায়ুবাহিত রোগ

সুস্থ তো আমরা সবাই থাকতে চাই। কিন্তু রোগ তাও আমাদের পিছু ছাড়ে না। তোমার পরিবারে বা পাড়ায় তুমি নিশ্চয়ই বিভিন্ন লোককে নানারকম রোগে ভুগতে দেখেছ। এমনকি তুমি নিজেও হয়তো কখনও অসুস্থ হয়েছ।

তোমার পরিবারের বা তোমার পাড়ায় তুমি কী কী রোগ দেখেছ তার একটা তালিকা তৈরি করো। একইসঙ্গে ওই রোগগুলি কীভাবে ছড়াতে পারে সেটা একটু ভেবে লেখার চেষ্টা করো তো।

রোগের নাম	কীভাবে ছড়ায়
1.সাধারণ সর্দিকাশি	1. বায়ুর মাধ্যমে
2. আমাশয়	2. জলের মাধ্যমে
3. ম্যালেরিয়া	3.
4.	4.
5.	5.

তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে, বিভিন্ন ধরনের রোগ বিভিন্নভাবে ছড়ায়— কখনও জল, কখনও বা বায়ু, আবার কখনও বা অন্য কোনো জীবের সাহায্যে।

অনিল আর খালেদ খুব বন্ধু, ক্লাসে পাশাপাশি বসে। খালেদের আজ সকাল থেকেই খুব হাঁচি হচ্ছে। আর সে বারেবারে হাত দিয়ে নাক মুছছে। অনিল আবার আজ বিজ্ঞানের বই আনেনি। বিজ্ঞান ক্লাসে তারা দুজনে গায়ে গা লাগিয়ে বসে খালেদের বই নিয়েই পড়াশোনা করল। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলায় অনিল খেয়াল করল যে তারও হাঁচি হচ্ছে আর নাক ভরে গেছে পাতলা সর্দিতে। অনিল বুঝল খালেদের সর্দির জীবাণু তার দেহেও প্রবেশ করেছে।

বসন্ত রোগের আক্রমণ

কানাডা ভূখণ্ডের দখল নিয়ে তখন লড়াই চলছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সেখানকার অধিবাসী ফরাসি আর স্থানীয় আমেরিকান আদিবাসীদের(ফ্রেঞ্চ-ইন্ডিয়ান ওয়ার : 1754-1763)। এখনকার পিটসবার্গে ফোর্ট পিট (Fort Pitt)-এ ব্রিটিশ সৈন্যদের আটকে রেখেছিল একদল আমেরিকান। ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড জেফ্রি

আমহার্স্ট আমেরিকানদের এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর কথামতো অবরুদ্ধ দুর্গের ক্যাপ্টেন সাইমন ইকুইয়েয়ার (Captain Simon Ecuyer) সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন আমেরিকান উপজাতির সর্দারের কাছে। আর সঙ্গে পাঠালেন দুটি কম্বল ও রুমাল। ওই কম্বলগুলো আসলে ছিল বসন্ত রোগ (Small Pox)-এ আক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যবহার করা কম্বল। জেনারেল আমহার্স্ট চেয়েছিলেন এইভাবে আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে বসন্ত রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে। আর জেনারেলের উদ্দেশ্যও সফল হয়েছিল পুরোপুরি। অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকান উপজাতি সৈন্যদল বসন্ত রোগের ভয়াবহ সংক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ব্রিটিশরাও ফোর্ট পিটের দুর্গটি দখল করে নিল।

এতো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারলে বসন্ত রোগ কীভাবে ছড়ায়?

আরেকটা খবর তোমাদের জানাই, শুধু টিকাদানের মাধ্যমে 1977 সালের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে গুটি বসন্ত (Small Pox)-কে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল।

বায়ুর মাধ্যমে কীভাবে রোগ ছড়ায়?

বায়ুর মাধ্যমে রোগগুলো কীভাবে ছড়ায় বলতে পারবে কি? এসো তো সাধারণ সর্দি-কাশি কীভাবে ছড়ায় লিখে ফেলি।

সাধারণ সর্দি-কাশি কীভাবে ছড়ায়?	সাধারণ সর্দি-কাশি হয়েছে এমন ব্যক্তির কী কী করা উচিত যাতে ওই রোগটি না ছড়ায়?
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

বায়ুর মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ কীভাবে ছড়ায় এসো দেখা যাক।

কণা সংক্রমণ :

- হাঁচি বা কাশির সময়, জোরে কথা বলা বা থুতু ফেলার সময় রোগীর নাক আর মুখ দিয়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো তরল কণা (droplet) দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে আর বাতাসে ভাসতে থাকে।
- প্রত্যেক তরল কণাতে থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু।
- রোগজীবাণুভরা এই তরল কণা সুস্থ লোকের নাক আর মুখ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে।

ধুলো সংক্রমণ :

- হাঁচি বা কাশির সময় বা জোরে কথা বলার সময় রোগীর নাক আর মুখ দিয়ে ছোটো ছোটো তরল কণার সঙ্গে কিছু বড়ো বড়ো তরল কণাও দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।
- এই তরল কণাগুলোতেও থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু।

- এই তরল কণাগুলো আকারে বড়ো হওয়ায় নিজেদের ভারে মাটিতে এসে পড়ে। আর শুকিয়ে যায়।
- এরপর এইসব রোগজীবাণু ধুলোর কণার সঙ্গে মিশে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। আর নাক ও মুখ দিয়ে এইসব রোগজীবাণু সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে।

পশু থেকে মানুষের দেহে এল রোগ :

কৃষি সভ্যতার তখন প্রথম যুগ। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে শিখে নিল পশুপালন। মানুষ আর পশু-পাখি পাশাপাশি থাকতে আরম্ভ করল । নিজের নানা কাজে সে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল পশুদের — পশুদের দুধ পান করা, তাদের চামড়া দিয়ে জামাকাপড়, জুতো তৈরি করা। আর পশুপাখিদের মলমূত্রের মধ্য দিয়ে তাদের নানা সংক্রামক অসুখ সঞ্চারিত হলো মানুষের দেহে।

ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির সময়ে খোদাই করা একটি পাথরে সম্ভবত পৃথিবীর যক্ষ্মা (TB) রোগের স্বীকৃত প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়। যক্ষ্মা সংক্রামক রোগ। নগরায়ন বা শিল্পায়নের সময় অনেক লোক যখন একসঙ্গে ছোটো জায়গায় থাকতে আরম্ভ করল, যক্ষ্মা নিল মহামারির আকার।

একই জায়গায় বহু লোকের একসঙ্গে উপস্থিতি বায়ুবাহিত রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার চেনা ডাক্তারবাবুর সাহায্যও নিতে পারো।

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	রোগের প্রতিকার
1. যক্ষ্মা	i.. একনাগাড়ে জ্বর ii. কাশি iii. থুতুর সঙ্গে রক্ত পড়া	i. স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অসুখের চিকিৎসা করা দরকার। ii. যথেষ্ট জল পান করা দরকার। iii. পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। iv.
2. সাধারণ সর্দিকাশি	i. নাক দিয়ে জলের মতো পাতলা সর্দি ii. কাশি	i. ii. iii.
3. ইনফ্লুয়েঞ্জা	i. হাঁচি ও কাশি ii. গা, হাত, পায়ে ব্যথা iii. জ্বর iv.	i. ii. iii. iv.

কাঠের গুঁড়ো, ফুলের রেণু আর হাঁচি-কাশি

সেদিন স্কুলের মিড-ডে মিলে ডিমের তরকারি হয়েছে। অমিত বলল, আমি ডিম খাব না। ডিম খেলে আমার গায়ে লাল লাল দাগ বেরিয়ে যায়, হাঁচি হয়, কখনও বমিও হয়।

রফিক বলল, সে কী রে, তুই ডিম খেতে পারিস না। তাহলে তোর ডিমটা আমাকে দিস। তোর কী কষ্ট রে! অমিত বলল, ডাক্তারবাবু বলেছেন যে আমার ডিমে অ্যালার্জি আছে।

প্রেরণা বলল, অ্যালার্জি কী রে?

আয়েষা বলল, ঠিক জানি না। তবে জানিস তো আমারও না অমিতেরই মতো সমস্যা আছে। তবে ডিমে না, ধুলোয়। বাড়িতে বইপত্তর, লেপ-তোশকের ধুলো আমার নাকে গেলেই হাঁচি শুরু হয়, চোখ নাক জ্বালা করতে থাকে আর জল পড়ে।

তোমরাও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। আর নিজেরাও ভেবে দেখো তো, তোমাদের কার কার এই ধরনের সমস্যা হয়। আর ওই সমস্যার মূলে কোন জিনিসটা দায়ী, সেটাও লিখে ফেলার চেষ্টা করো।

কী জিনিস থেকে সমস্যা	কী সমস্যা হয়েছিল	কী করে সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছিলে
1. ডিম খেলে		
2. ধুলো নাকে গেলে		
3.		
4.		

বিভিন্ন বস্তুর কাছাকাছি এলে বা খেলে তোমাদের দেহে যে নানারকম সমস্যা (গায়ে লাল লাল দাগ, হাঁচি, চোখ নাক জ্বালা করা, বমি ইত্যাদি) দেখা যায়, সেটাই হলো **অ্যালার্জি**। আর যেসব বিভিন্ন বস্তু তোমাদের দেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে, তারাই হলো **অ্যালার্জেন**। কয়েকটি অ্যালার্জেন হলো ডিম, ধুলো,..............., ... , ... ।

বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণভাবে কী কী করা উচিত এসো তো লিখে ফেলি।
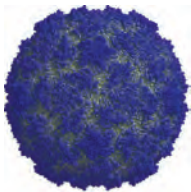
বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায়
1. অসুস্থ অবস্থায় হাঁচি/ কাশির সময় মুখে আর নাকে রুমাল চাপা দেওয়া।
2. যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা।
3.
4.

বায়ুবাহিত আরো কিছু রোগ সম্বন্ধে জেনে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি (ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া)	লক্ষণ	প্রতিকার	কীভাবে এই রোগটি সম্বন্ধে জানলে

কিছু বায়ুবাহিত রোগ আর তাদের জীবাণু। নীচের সারণিতে দেওয়া জীবাণুর ছবিগুলো অনেকগুণ বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

রোগের নাম	জীবাণুর ছবি	জীবাণুর প্রকৃতি
1. সাধারণ সর্দিকাশি		ভাইরাস
2.যক্ষ্মা		ব্যাকটেরিয়া

জলবাহিত রোগ

প্রথম তিনটে ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

শেষ দুটো ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

ছবিগুলো একসঙ্গে দেখে তোমার কী মনে হলো? ....।

আসলে ওপরের ছবিগুলোতে যেসব খাদ্য বা পানীয়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রধান উপাদান হলো জল। অনেকসময় ওইসব খাদ্য বা পানীয় তৈরি করতে বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করা হয় না। আর ওই দূষিত জল থেকেই আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে কলেরা, টাইফয়েডের মতো বিভিন্ন রোগের জীবাণু। তার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

তোমার কি কখনও এই রকম অসুখ হয়েছিল? কী হয়েছিল আর কীভাবে সেরেছিল সেটাও নীচের সারণিতে লেখো।

কবে হয়েছিল	কী সমস্যা হয়েছিল	কীভাবে অসুখ সেরেছিল

কলেরা রোগের ইতিহাস

বিসূচিকা বা **কলেরা** রোগের সঙ্গে ভারতের পরিচয় প্রায় 2500 বছরের।

বাংলায় 1817 সালে কলেরা মহামারি দেখা দেয়। বঙ্গোপসাগরে চলাচল করা ব্রিটিশ জাহাজের মাধ্যমে বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছে যায় এই মহামারি। তারপর এই মহামারি সেখান থেকে পারস্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

2010 সালেও সারা পৃথিবীতে কলেরার শিকার হয়েছিল প্রায় 1,00,000 - 1,30,000 মানুষ। আর প্রায় 30-50 লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

1827 সালে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা, কলকাতা আর তার আশপাশের অঞ্চল থেকে দ্বিতীয় কলেরা মহামারির সূচনা। এরপর এই মহামারি গঙ্গার উজান বেয়ে লাহোর আর পাঞ্জাবে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে উটের ক্যারাভানের পথ ধরে কাবুল, আফগানিস্তান, বুখারা হয়ে রাশিয়ায় ছড়িয়ে যায় এই মহামারি। 1835 সালের মধ্যে এই মহামারি আমেরিকা আর ইউরোপে পৌঁছে যায়।

1900 থেকে 1920 সালের মধ্যে এই রোগে ভারতে আনুমানিক 80 লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

কলেরা রোগ আর কলেরা রোগী

কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির বারেবারে বমি আর মলত্যাগ। মলের রং চাল ধোয়া জলের মতো। মলে কোনো দুর্গন্ধ থাকে না।

রোগীর শরীর থেকে দিনে 10–11 লিটারের মতো জল (আর নুন) বেরিয়ে যায়। শরীর থেকে এতটা জল আর নুন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাত পায়ে সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভূতি হয় - এর থেকেই **বিসূচিকা-র সূচিক** কথাটার উৎপত্তি।

এই রোগে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি শিশু আর বয়স্কদের, যাদের শরীর এই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার ধকলটা নিতে পারে না।

বমি, পায়খানা, জল-তেষ্টা, পেট-ব্যথা, অবসন্ন বোধ করা, পায়ের চামড়ার শিথিলতা বা চামড়া কুঁচকে যাওয়া, রোগীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়া, জ্ঞান হারানো আর সবশেষে মৃত্যু। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগে খুবই অল্প — কখনও বা মাত্রই 24–48 ঘন্টা।

জানো কি কলেরা রোগের পিছনে কে রয়েছে?

জল

জল সংক্রমণ থেকেই ছড়ায় কলেরা রোগ।

প্রতি ৪ সেকেন্ডে এই গ্রহে একজনের মৃত্যু হচ্ছে জল সংক্রমণের কারণে।

জল আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করি চট করে লিখে ফেলো।

জলের ব্যবহার	ওই জলে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে থাকলে আমাদের কী কী ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?
i) পানীয় জল হিসাবে	i)
ii) জামাকাপড় কাচতে	ii)
iii)	iii)

নীচের সারণিতে দেখো জলের বেশ কিছু উৎসের নাম লেখা আছে। এদের মধ্যে কোন কোন উৎসের জলকে তুমি পানীয় জল হিসাবে বেছে নেবে? আর কোনগুলোকেই বা তুমি পানীয় জল হিসেবে বেছে নেবে না? তোমার মতামতের পেছনে যে কারণগুলো আছে সেটাও নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজন মনে করলে, তুমি আরও কয়েকটা উৎসের নাম নীচের সারণিতে যোগ করতে পারো। এই সারণি পূরণ করার সময় তোমরা আগের পাতার ছবিগুলোর সাহায্য নিতে পারো।

জলের উৎস	পানীয় জল হিসাবে বেছে নেবে কি?	পানীয় জল হিসাবে বেছে না নেওয়ার কারণ	পানীয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন জল পান করলে কি সমস্যা হতে পারে?
1. নদী	গ্রহণযোগ্য নয়	কলকারখানার বর্জ্য বস্তু, জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ ফেলা হয়।	
2. পুকুর			
3. কুয়ো			
4. নলকূপ/টিউবওয়েল			
5. মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশনের জল			
6. ফোটানো জল			
7. ফিলটার/পরিশুদ্ধ করা জল			
8.			
9.			

ওপরের তালিকাটা থেকে তোমরা তাহলে বুঝতে পারলে যে পানীয় জলের উৎস ঠিক হওয়াটা কতটা জরুরি। পানীয় জলের বিভিন্ন উৎসে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এসে মেশে। তেমনই আমাদের অসাবধানতার জন্য নানা রোগের জীবাণুও অনেক সময় পানীয় জলে এসে মেশে আর সেই জলের মাধ্যমেই ছড়ায়। জলের মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় তারাই হলো **জলবাহিত রোগ**।

জলের মাধ্যমে ছড়ায় এমন বিভিন্ন রোগে তুমি নিজেও হয়তো কখনও ভুগেছ। এমনও হতে পারে, তুমি নিজে না ভুগলেও তোমার পরিবারে বা পাড়ায় হয়তো কাউকে এই রোগে ভুগতে দেখেছ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বা তোমার বাড়ির/পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে পরের পাতার কর্মপত্রটি পূরণ করার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

1. তোমার নাম :

2. তুমি নিজে বা তোমার বাড়ির কেউ কখনও জলবাহিত রোগে ভুগেছ? কবে ভুগেছ?

   ....

   ....।

3. ওই রোগের লক্ষণ কী কী ছিল?

   i)

   ii)

   iii)

4. ওই রোগ সারাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

   i)

   ii)

   iii)

5. কতদিন লেগেছিল ওই রোগ সারতে?

   ....

   ....।

6. ডাক্তার দেখিয়েছিলে কি? দেখিয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ওই রোগের কী নাম বলেছিলেন ?

   ....

   ....।

7. আগে থেকে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ওই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত বলে তোমার মনে হয়।

   i)

   ii)

   iii)

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে আমাদের সুস্থ নীরোগ জীবনযাপনের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল কতটা প্রয়োজন। আর সেটা না হলেই আমরা নানারকম রোগের কবলে পড়তে পারি।

বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগ ও তার লক্ষণ

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর শিক্ষিক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের পাতার সারণিটি ভরতি করো। প্রয়োজনে তোমার চেনা ডাক্তারবাবুর সাহায্যও নিতে পারো।

রোগের নাম	লক্ষণ	প্রতিকার
1. কলেরা	i. বারেবারে পাতলা জলের মতো মল ত্যাগ; মলের রং চাল ধোয়া জলের মতো ii. বমি iii. হাত ও পায়ে সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভূতি	i. জল পান করে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলের ঘাটতি পূরণ করা। ORS (Oral Rehydration Solution) পান করানো। ii. বিশুদ্ধ/ফোটানো জল পান করা iii. iv.
2. সাধারণ ডায়ারিয়া	i. বারেবারে খড়-ধোয়া জলের মতো মল ত্যাগ ii. শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া	i. ii.
3. পোলিও	i. হাত পায়ের মাংসপেশির অস্বাভাবিক শিথিলতা সমেত পক্ষাঘাত (Flaccid Paralysis) ii. ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া iii. জ্বর (উচ্চ তাপমাত্রা)	i. পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
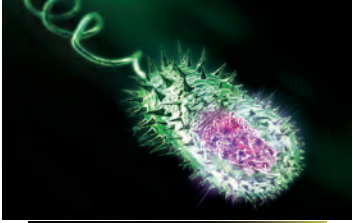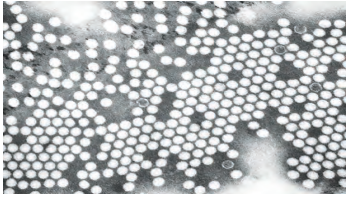
জলবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণভাবে কী কী করা উচিত এসো লিখে ফেলি।

জলবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায়
i) বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা ।
ii) মাটির নীচে আর ছাদের ওপরের জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
iii)
iv)
v)
vi)

জলবাহিত আরো কিছু রোগ সম্বন্ধে জেনে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া	লক্ষণ	প্রতিকার	কীভাবে এই রোগটি সম্বন্ধে জানলে

কিছু জলবাহিত রোগ আর তাদের জীবাণু। নীচের সারণিতে দেওয়া জীবাণুর ছবিগুলো অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

রোগের নাম	জীবাণুর ছবি	জীবাণুর প্রকৃতি
1. কলেরা		ব্যাকটেরিয়া
2. সাধারণ ডায়ারিয়া		ভাইরাস
3. পোলিও		ভাইরাস

রোগ সংক্রমণে বাহকের ভূমিকা ও প্রতিকার
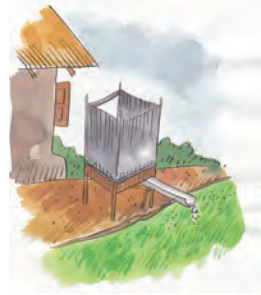
ওপরের ছবিগুলোতে যে যে বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে, তার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

বিষয়	কারণ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

ম্যালেরিয়া রোগটি কে ছড়ায় লেখো : ....।

ম্যালেরিয়া রোগটার কথা তো তোমরা প্রায়ই শোনো। এবারে এসো তোমাদের ম্যালেরিয়া রোগের একটা গল্প শোনাই।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বেড়ে ওঠার জন্য চাই একটা জীবদেহ। আর ঠিক এই কারণেই সেই জীবাণুদের সঙ্গে মশার পরিচয় হয় আজ থেকে প্রায় 30 কোটি বছর আগে। আজকের মতো মানুষ তখন পৃথিবীতে কোথায়! আজকের মতো মানুষ এসেছিল তার অনেক পরে — আজ থেকে মাত্র এক লক্ষ 30 হাজার বছর আগে।

বংশবৃদ্ধির জন্য মশার দেহ ছাড়াও ম্যালেরিয়া জীবাণুর চাই আরেকটা প্রাণীর দেহ। প্রায় 100-র বেশি বিভিন্ন প্রজাতির ম্যালেরিয়া জীবাণু, সাপ থেকে আরম্ভ করে পাখি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ম্যালেরিয়া জীবাণুর মাত্র চারটি প্রজাতি ছাড়া আর অন্য কোনো প্রজাতি মানুষকে তাদের বংশবৃদ্ধির নিয়মিত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। এই ফাঁকে তোমাদের ম্যালেরিয়া জীবাণুর একটা প্রজাতির নাম জানিয়ে রাখি — *Plasmodium vivax*। মানুষের রক্ত পরীক্ষা করলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে লোহিত রক্তকণিকায় এই জীবাণুগুলো দেখা যায়।

প্লাসমোডিয়াম যে মশা আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে আশ্রয় নেয়, তারা হলো **পোষক**।

এই পোষকদেরও আবার রকমফের আছে। প্লাসমোডিয়াম জীবাণু বেঁচে থাকার জন্য মশা ও অন্য আর একটা মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন- মানুষ) ওপর নির্ভরশীল। মশার দেহে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। আবার মানুষ বা অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে এরা বেড়ে ওঠে। তাই মশা হলো **মুখ্য** বা **নির্দিষ্ট পোষক** আর মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হলো **গৌণ** বা **অন্তর্বর্তী পোষক**।

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মানুষের চেনা জানা

আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ ভবঘুরে জীবন ছেড়ে কৃষিজীবনে প্রবেশ করে। তখন থেকেই ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। কী এমন হলো যে প্লাসমোডিয়ামের হামলায় মানুষ কাবু হয়ে পড়ল— নীচে লেখার চেষ্টা করো দেখি।

ভবঘুরে জীবন ছেড়ে মানুষ কৃষিজীবন আরম্ভ করার সঙ্গে প্লাসমোডিয়ামের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

1. মানুষ দল বেঁধে একসঙ্গে একজায়গায় দীর্ঘদিন থাকতে আরম্ভ করল।
2.
3.
4.

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় হয় আফ্রিকায়। পরের দিকে খাবার আর থাকার জায়গার খোঁজে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আর মানুষ তার নিজের শরীরে বহন করে নিয়ে চলল ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে। আফ্রিকা থেকে ম্যালেরিয়া, ইউরোপে আর গোটা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোও ম্যালেরিয়ার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। তুষার যুগে আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে সাইবেরিয়া থেকে আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়েছিল ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া।

1600 সালে পেরুর পাদরি জুয়ান লোপেজ, আবার কারোর কারোর মতে 1633 সালে কালাঞ্চা সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়া জ্বর সারানোর ওষুধ আবিষ্কার করেন।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ তো আবিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ম্যালেরিয়া জীবাণুকে তখনও কেউ চোখে দেখেনি। 1880 সালের 24 ডিসেম্বর ফরাসি সামরিক বাহিনীর ডাক্তার চার্লস লুই আলফাঁসো লাভেরাঁ আলজেরিয়ায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু খুঁজে পান।

ম্যাপে পৃথিবী জুড়ে ম্যালেরিয়ার যাত্রা পেন বা পেনসিলের সাহায্যে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখাও।

ম্যালেরিয়া যে মশাবাহিত রোগ, তার প্রমাণ দিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর এক ডাক্তার — **রোনাল্ড রস।** 1897 সালের 20 আগস্ট সেকেন্দ্রাবাদে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার পাকস্থলীতে তিনি ম্যালেরিয়া জীবাণুর সন্ধান পান। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমান SSKM হাসপাতাল) গবেষণার বাকি কাজটুকু শেষ করেন। তাঁর এই কাজের জন্য রোনাল্ড রস 1902 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

আচ্ছা আরও কয়েকটি রোগের নাম লেখার চেষ্টা করো, যে রোগগুলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো না কোনো জীবের ভূমিকা আছে। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	রোগ ছড়ানোতে যে জীবের ভূমিকা আছে
1. ম্যালেরিয়া	
2. ডেঙ্গু	
3. টাইফয়েড	
4. প্লেগ	
5. কলেরা	
6.	
7.	
8.	

প্লেগ - ব্ল্যাক ডেথ

Ring-a-ring of roses,
A pocket full of posies,
A-tishoo! A-tishoo!
We all fall down.

এইরকম একটা ছড়া তোমরা অনেকে হয়তো শুনেছো। কিন্তু তোমরা কী জানো যে ওই ছড়াটা লন্ডনের চতুর্দশ শতাব্দীর প্লেগ মহামারিকে উপলক্ষ করে লেখা হয়েছিল। প্লেগ তার ধ্বংসাত্মক মারণলীলার জন্য সে দেশে ব্ল্যাক ডেথ নামে বেশি পরিচিত। ঠিক যেমন যক্ষ্মাকে একসময় ডাকা হতো হোয়াইট ডেথ নামে। কিন্তু ব্ল্যাক কেন? কারণ আর কিছুই নয়, প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তির সারা গায়ে কালো কালো ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু নানাধরনের প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ানো রোগের কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্লেগের কথা কেন? তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ যে কোনো একটা প্রাণী নিশ্চয়ই এই রোগ ছড়ানোয় সাহায্য করে। কে বলত? ইঁদুর। প্লেগ এত মারাত্মক যে 541-542 খ্রিস্টাব্দে 10 কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েছিল প্লেগ। আর 541 থেকে 700 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাস পায় 50 শতাংশ। ভারতবর্ষও প্লেগের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। অতীতে প্লেগের জীবাণুর আক্রমণে ভারতেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বারবার আক্রমণ করলেও প্লেগ কিন্তু ইউরোপের মাটিতে চিরকালের জন্য থেকে যেতে পারেনি। কারণ প্লেগের আন্যতম বাহক, মেঠো কালো ইঁদুর শীতের দেশের বাসিন্দা নয়। বিষুবরেখার আশেপাশের দেশে এদের বাস। মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় প্রায় 8 থেকে 10 হাজার বছর আগে মানুষ যখন প্রথম চাষবাস করতে শিখেছিল তখন থেকে। উর্বর মাটিকে শস্য উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছিল মানুষ। নিয়মিত খাবারের জোগান পাবার আশায় ক্ষেতের মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছিল কালো মেঠো ইঁদুরের দল। এই মেঠো ইঁদুরের চামড়ায় বাসা বাঁধে এক ধরনের উকুন । আর প্লেগের জীবাণু আশ্রয় নেয় এই উকুনের পাকস্থলীতে।

কিন্তু কীভাবে ছড়ায় এই প্লেগ?

এই জীবাণুগুলো খুব তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে ইঁদুরের উকুনের (Rat flea) পাকস্থলীর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ফলে উকুনটা অনাহারে, খিদের জ্বালায় থাকে সামনে পায়, তাকেই কামড়ায়। আর সেই ক্ষতস্থানে প্লেগের জীবাণু বমি করে দেয়। সেই ক্ষতস্থান থেকে প্লেগের সংক্রমণ ঘটে। ইঁদুরের উকুন ইঁদুরকে কামড়ালে ইঁদুরে, আর মানুষকে কামড়ালে মানুষে প্লেগের সংক্রমণ হয়। বস্তাবন্দি চাল, গম, আলুর সঙ্গে প্লেগের মেঠো ইঁদুর গ্রাম থেকে পৌঁছোয় শহরে। আর বন্দর থেকে জাহাজে করে দূরদূরান্তের দেশে পাড়ি দেয়। আর ইঁদুরের এই দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার পথ ধরেই ছড়িয়েছে প্লেগ। একবার নয়, বারবার।

1899 সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করে। প্রতিদিনই বহু মানুষ মারা যেতে থাকেন। এইসব দেখে ভগিনী নিবেদিতা আর স্থির থাকতে পারেননি । তিনি নিজের হাতে রাস্তাঘাট, নর্দমা পরিষ্কার করার দায়িত্ব তুলে নেন। প্লেগে আক্রান্ত মানুষদের নিজের হাতে সেবা করতে থাকেন। তাঁর এই কাজে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যুবসমাজও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভগিনী নিবেদিতা একটা কমিটি তৈরি করেন। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়ে এই সমাজসেবকরা প্লেগের রোগীদের সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন।

মশা-মাছি আর বিভিন্ন রোগ

মশা
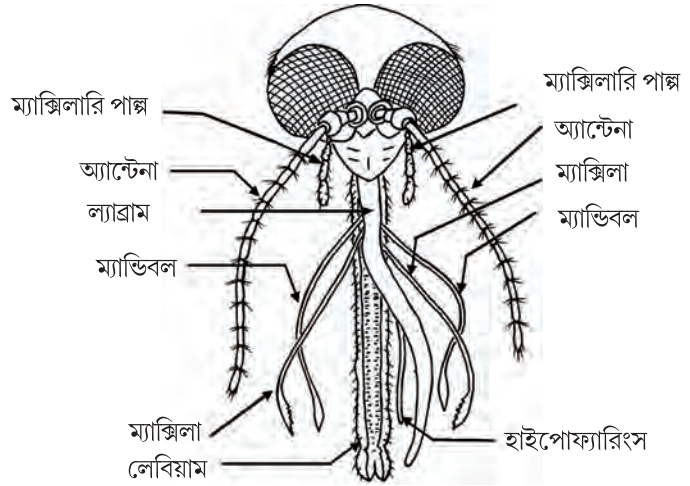
খাবার খাওয়ার জন্য আমরা আমাদের দেহের কী কী অঙ্গ ব্যবহার করি তোমরা তো জানো। এবারে এসো দেখি মশা কীভাবে রক্ত পান করে।

মানুষের খাওয়া		মশার রক্তপান করা	
অঙ্গের নাম	কীভাবে সাহায্য করে	অঙ্গের নাম	কীভাবে সাহায্য করে
1.ঠোঁট	1.	1. লেবিয়াম	1. বাকি দংশক অংশকে ঢেকে রাখে; রক্ত পান করার সময় পেছন দিকে সরে গিয়ে মুখের বাকি অংশকে চামড়া ভেদ করতে দেয়।
2.দাঁত	2.	2. ম্যান্ডিবল	2. সূঁচের মতো অংশ; চামড়া ফুটো করতে সাহায্য করে।
3. জিভ	3.	3. ম্যাক্সিলা	3. ছুরির মতো অংশ; চামড়া ভেদ করতে সাহায্য করে; রক্ত পান করার সময় মশার বাকি দংশক অংশকে অবলম্বন দেয়।
4.	4.	4. হাইপোফ্যারিংস	4. মশা যে ব্যক্তির রক্ত পান করছে সেই ব্যক্তির দেহে নিজের লালারস প্রবেশ করায়, যাতেরক্ত জমাট না বাঁধে।
5.	5.	5. ল্যাব্রাম	5. প্রধান রক্ত-চোষক নল; এর মাধ্যমে মশা রক্তপান করে।

মশার বিভিন্ন মুখ-উপাঙ্গগুলো তাদের বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের জন্য পরিবর্তিত হয়ে **প্রোবোসিস** গঠন করে। এসো এবারে দেখে নিই প্রোবোসিস কীভাবে কাজ করে।

জানার চেষ্টা করা যাক আমাদের চেনা মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়?

- মশার দেহে একটা লম্বা, ফাঁপা নলের মতো প্রোবোসিস থাকে। স্ত্রী মশার ক্ষেত্রে প্রোবোসিসটি হয় সরু আর তীক্ষ্ণ, অনেকটা ইনজেকশানের সূঁচের মতো। কিন্তু পুরুষ মশার প্রোবোসিসটি ভোঁতা।
- স্ত্রী মশা তার সূঁচের মত তীক্ষ্ণ প্রোবোসিস দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া ভেদ করে রক্ত পান করে। পুরুষ মশার প্রোবোসিসটা ভোঁতা হওয়ায়, তারা কেবল উদ্ভিদের বিভিন্ন রস যেমন- ফুলের রস, ফলের রস ইত্যাদি পান করে।
- কোনো প্রাণীর রক্ত পান করার সময় স্ত্রী মশা প্রোবোসিসের মধ্যে দিয়ে তার লালা প্রাণীটির দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়। কারণ আর কিছুই নয় যাতে রক্ত পান করার সময় রক্ত জমাট না বাঁধে।
- এই লালার সঙ্গেই স্ত্রী মশার দেহে বাসা বাঁধা রোগের জীবাণু ওই প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে।

মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়, সেটা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো আমরা দেখে নিই মশার রকমভেদ। আর জেনে নিই কোন মশা কী রোগ ছড়ায়।

নীচের সারণিতে বিভিন্ন ধরনের মশার বৈশিষ্ট্য (চেনার উপায়) আর মশা থেকে ছড়ায় এমন রোগের নাম লেখা আছে। এই তিন ধরনের ছাড়াও আর অন্য কোনো ধরনের মশার কথা তুমি কি জানো? নীচের সারণিতে তাদের কথাও লেখো।

মশা	ছবি	চেনার উপায়/বৈশিষ্ট্য	কী রোগ ছড়ায়
1. অ্যানোফিলিস		1. ডানায় কালো ছোপ থাকে। 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে বসে। 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয়। 4. সন্ধ্যার সময় বাইরে বেরোয়। 5. পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	1. ম্যালেরিয়া
2. কিউলেক্স		1. ডানায় কোনো ছোপ থাকে না। 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসে। 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয় না। 4 রাত্রে বাইরে বের হয়। 5. এরা নোংরা ও ময়লা জলে ডিম পাড়ে।	1. গোদ/ ফাইলেরিয়া 2. এনকেফালাইটিস

মশা	ছবি	চেনার উপায়/বৈশিষ্ট্য	কী রোগ ছড়ায়
3. এডিস		1. পেটে আর পায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বসে । 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয় না। 4. দিনের বেলায় বাইরে বের হয়। 5. পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	1. ডেঙ্গু 2. চিকুনগুনিয়া
4.			
5.			

বিভিন্ন ধরনের মশা আর তারা কী কী রোগ ছড়ায়, সে সম্বন্ধে তোমরা জানলে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় নীচের সারণিতে লিখে ফেলো তো। প্রয়োজনে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো বা শিক্ষক/শিক্ষিকা আর বাড়ির বড়োদের সাহায্য নাও।

মশা নিয়ন্ত্রণের উপায়
1. চৌবাচ্চা, বালতি, ফুলদানি ইত্যাদি জায়গার জল 2-3 দিন অন্তর পালটাতে হবে।
2. মশার লার্ভা খায় এমন মাছ (গাপ্পি, তেচোখা, শোল, ল্যাটা, গাম্বুসিয়া ইত্যাদি) জমা জলে ছাড়তে হবে।
3. নালা, নর্দমার বন্ধ নোংরা জলে পোড়া মবিল, কেরোসিন, ডিজেল ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনকি ব্লিচিং পাউডারও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।
4.

মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়, সেটা তো আমরা জানলাম। এবার এসো আমাদের আরেকটা চেনা প্রাণী, মাছি, কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটা জানি। তার আগে জেনে নিই মাছিদের বংশ পরিচয়।

মাছি

মাছিদের রকমফের

এবারে এসো দেখা যাক মাছির রকমফের।

মাছি	ছবি	চেনার উপায়/ বৈশিষ্ট্য	কি রোগ ছড়ায়
1.সাধারণ মাছি		1. ধূসর রঙের বুক। 2. পিঠে 4টে লম্বা কালো দাগ। 3. সারা দেহে রোমে ঢাকা। 4. দিনের বেলায় বাইরে বেরোয়। রাতে নিষ্ক্রিয় থাকে।	1. টাইফয়েড 2. ডায়ারিয়া

মাছি	ছবি	চেনার উপায়/ বৈশিষ্ট্য	কি রোগ ছড়ায়
2. বালি মাছি		1. মশার চেয়ে আকারে ছোটো 2. দেহ অত্যন্ত রোমশ 3. পাগুলো সরু ও লম্বা 4. সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোয়।	1. কালাজ্বর 2. বালিমাছি জ্বর
3. কালো মাছি		1. কালো রঙের মাছি 2. প্রোবোসিস আকারে ছোটো দাঁতওয়ালা ছোরার মতো। 3. দেহ মোটাসোটা। 4. ডানা দুটো চওড়া। 5. দিনের বেলায় দল বেঁধে বেরোয়। সবচেয়ে সক্রিয় হয় ভোরে আর সন্ধ্যের একটু আগে।	1.অঙ্কোসারকিয়াসিস

মাছি কীভাবে রোগ ছড়ায় ?

সাধারণ মাছি তিনভাবে রোগ ছড়ায়।

- সাধারণ মাছি যখন মল, মূত্র, পুঁজ, থুতু ইত্যাদি জিনিসে বসে, তখন ওইসব জিনিসের ছোটো ছোটো কণা মাছির পায়ে, শুঁড়ে লেগে যায়। ওই কণাগুলির ভেতরে থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু। ওই মাছি যখন রান্না করা খাবার, মিষ্টি, কাটা ফল ইত্যাদির ওপর বসে তখন রোগজীবাণু ওই খাবারে মিশে যায় আর রোগ সংক্রমণ ঘটায়।

- মল, পুঁজ, থুতু ইত্যাদি জিনিসে থাকা রোগজীবাণুগুলো সাধারণ মাছির পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে জমে। মাছি আবার কঠিন খাবার খেতে পারে না। তাই মাছি কঠিন খাবারের ওপরে বমি করে। ফলে খাবারের কিছু অংশ তরল হয় আর মাছি তার প্রোবোসিসের সাহায্যে ওই খাবার গ্রহণ করে। ওই বমির সঙ্গে মাছির দেহের রোগজীবাণু আমাদের খাবারে এসে মিশে সংক্রমণ ঘটায়।

- সাধারণ মাছি সারাদিন ধরে প্রায় 5 মিনিট অন্তর অন্তর যেখানে বসে, সেখানে মলত্যাগ করে। মাছির মলেও অনেক জীবাণু থাকে। আমাদের খাবারের ওপরে মাছি মলত্যাগ করলে ওইসব রোগজীবাণু আমাদের খাবারে এসে মেশে।

মাছি কীভাবে রোগ ছড়ায়, তার একটা ধারণা তোমার পেলে। আর মশা কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটাও তোমরা জেনেছ। ম্যালেরিয়ার গল্পটাও তো পড়েছ। বলো তো মশা আর সাধারণ মাছির রোগ সংক্রমণের মধ্যে তুমি কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলে?

মশা	সাধারণ মাছি
1.	1. সাধারণ মাছির দেহে রোগজীবাণু বংশবৃদ্ধি করে না।
2.	2.

কী বুঝলে ? সাধারণ মাছি তাহলে খালি রোগজীবাণুটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। তাই সাধারণ মাছি হলো — **যান্ত্রিক বাহক** (Mechanical vector)।

আর মশা রোগজীবাণুটিকে তার নিজের দেহে বংশবৃদ্ধি করতে দেয়। তাই মশা হলো — **জৈব বাহক** (Biological vector)।

দেখো তো এইরকম আরো কিছু জৈব আর যান্ত্রিক বাহকের নাম মনে করতে পারো কিনা। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

তাহলে এবারে জৈব বাহক আর যান্ত্রিক বাহকের মধ্যে কয়েকটা পার্থক্য লিখে ফেলো তো।

জৈব বাহক	যান্ত্রিক বাহক
1.	1.
2.	2.
3.	3.

বিভিন্ন ধরনের মাছি আর তারা কী কী রোগ ছড়ায় সেটা তো জানলাম। এমনকি এরা কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটাও জানলাম। এবারে এসো, মাছিকে আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারি সেটা জানার চেষ্টা করি। কয়েকটি উপায় লিখে দেওয়া আছে। তুমি দেখো তো, আরো কয়েকটা উপায় লিখতে পারো কিনা।

মাছি নিয়ন্ত্রণের উপায়
1. যে-কোনো ধরনের খাবার সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত।
2. ঘরের মেঝে/খাওয়ার জায়গা প্রতিদিন ফিনাইল দিয়ে মোছা।
3.
4.
5.

খাদ্যবাহিত রোগ ও প্রতিকার

নষ্ট হওয়া খাবার

(a) ওপরের ছবিতে দেওয়া ফল দুটোর মধ্যে কোনটা তুমি খাবে? ....।

(b) অন্য ফলটাকে বেছে না নিয়ে কেন ওই ফলটাকে তুমি বেছে নিলে? ....।

(c) অন্য ফলটা খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো কি? কী ক্ষতি হতে পারতো বলে তোমার মনে হয়? .... ।

(a) ওপরের ছবিতে দেখানো পাঁউরুটিগুলোর মধ্যে কোন পাঁউরুটি তুমি খাবে? ....।

(b) অন্য পাঁউরুটিটা না বেছে তুমি ওই পাঁউরুটিটাকে বেছে নিলে কেন? ....।

(c) অন্য পাঁউরুটিটা খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো কি? কী ক্ষতি হতে পারত বলে তোমার মনে হয়? ....।

নানাধরনের খাবার পচে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হলো ওইসব খাবারে বিভিন্ন অণুজীবদের আক্রমণ। সাধারণত এইসব অণুজীবেরা হলো ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক।

কী কী ধরনের খাবার তোমরা পচে যেতে বা নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছ, তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো।

পচে যায় এমন/নষ্ট হয়ে যায় এমন খাবার	কীভাবে বুঝলে খাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে (রং বদল/বাহ্যিক চেহারার বদল/ বিশেষ গন্ধ/বিশেষ স্বাদ)
1. ফল :	
2. কাঁচা সবজি :	
3. মাছ/মাংস/ডিম :	
4. রান্না করা খাবার :	
5. অন্যান্য খাবার :	

যখন কোনো খাবারে বাসা বাঁধা অণুজীবরা সংখ্যায় বাড়ে তখন তারা নিজেদের শরীরে তৈরি উৎসেচক দিয়ে খাবারকে ভেঙে দেয়। আর ভেঙে যাওয়া খাবারের সরলতম অণুগুলো নিজেদের দেহে শোষণ করে নেয়।

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ

নানাধরনের ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের খাবারকে ভেঙে নানাধরনের অ্যাসিড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। খাবারে উপস্থিত এইসব ব্যাকটেরিয়া সবসময় যে ক্ষতিকারক হয় তা নয়। কিন্তু তাদের তৈরি করা ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো খাবারের বৈশিষ্ট্য বা স্বাদ বদলে দেয় বা খাবারটাকেই নষ্ট করে দেয়। এমনকি নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারের সঙ্গে ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো আমাদের শরীরে ঢুকলে অনেকসময় নানারকম রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে।

যেসব খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি (যেমন — মাংস, ডিম, মাছ, ডেয়ারিজাত খাবার) সেইসব খাবারে কিছু ব্যাকটেরিয়া সহজে জন্মায়। আবার কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কম প্রোটিনযুক্ত খাবারেও (যেমন - ফল, সবজি) জন্মায়, কিন্তু তারা কাজ করে তুলনায় অনেক ধীরে। ফলে রান্নাঘরে সাধারণ তাপমাত্রায় পেঁয়াজ বা কোনো ফল আর মাংস রেখে দিলে, মাংসতেই আগে পচন ধরার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কিন্তু এইসব ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও মারাত্মক হচ্ছে আরও অন্য কিছু ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যারা খাবারে কোনো খারাপ গন্ধ বা স্বাদ তৈরি করে না বা খাবারের চেহারায় কোনো বদল ও (যেমন হড়হড়ে ভাব, রং পালটে যাওয়া) আনে না। ফলে বাইরে থেকে দেখে বা খেয়েও হয়তো খুব একটা কিছু পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু এইসব ব্যাকটেরিয়া খাবারে বিষক্রিয়া ঘটায়, যা ডেকে আনতে পারে মারাত্মক সব অসুখ, অনেকসময় এমনকি মৃত্যুও। এদের সম্বন্ধে আমরা পরে জানব। আগে দেখে নিই, তোমরা যে পাঁউরুটিটা খেতে চাইলে না, সেটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ আছে।

ব্যাকটেরিয়া উপকারও করে

দই এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাবার তৈরিতে আমরা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিই। এছাড়াও স্ট্রেপটোমাইসেস ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি প্রজাতি থেকে জীবনদায়ী নানারকম ওষুধ আমরা পাই। গবাদি পশুদের পাকস্থলীতে কিছু ব্যাকটেরিয়া বাস করে যারা সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে সাহায্য করে। এছাড়াও মানুষের শরীরের অন্ত্রে বাস করে কিছু ব্যাকটেরিয়া যারা ভিটামিন B_{12} তৈরি করতে সাহায্য করে।

ছত্রাকের আক্রমণ

যে পাঁউরুটিটা তোমরা খেতে চাইলে না, ওই পাঁউরুটিটায় আক্রমণ করেছিল একধরনের ছত্রাক। এরাও অণুজীব। যেসব খাবারে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে, ছত্রাকরা সাধারণত সেইসব খাবারেই জন্মায়। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের আক্রমণের ফলে খাবারের বাহ্যিক চেহারা বা রঙের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। এসো চিনে নিই খাবারে বাসা বাঁধা প্রধান কয়েক ধরনের ছত্রাককে।

Rhizopus প্রজাতির ছত্রাক

Penicillium প্রজাতির ছত্রাক

Neurospora প্রজাতির ছত্রাক

ছত্রাক উপকারও করে

পাঁউরুটি, চিজ, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় — এইসব তৈরি করতে অনেকসময় আমরা ছত্রাকের সাহায্য নিই। এক্ষেত্রে বেশি কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারের প্রতি তাদের আকর্ষণই ওইসব জিনিস তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন কয়েক ধরনের পেনিসিলিয়াম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি হয়, পাঁউরুটি তৈরি করতে লাগে ইস্ট।

Claviceps প্রজাতির ছত্রাক

উৎসেচকের ক্রিয়া

অণুজীব ছাড়াও অন্য আর এক কারণেও খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই কারণটা হলো উৎসেচকের ক্রিয়া। উদ্ভিদজাত বা প্রাণীজাত খাবার কোশ দিয়ে তৈরি। আর ওই কোশে থাকে নানাধরনের উৎসেচক। উদ্ভিদজাত বা প্রাণীজাত খাবারগুলো টাটকা অবস্থায় রান্না না করে ফেলে রাখলে উৎসেচকরা ওইসব খাবারের রং বা স্বাদে অনাকাঙ্খিত বদল আনতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও উৎসেচকের ক্রিয়ার জন্য খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এবারে এসো দেখা যাক কী কী করলে এই ধরনের নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার থেকে হওয়া রোগ আমরা এড়াতে পারি।

1. বাহ্যিক চেহারায় অস্বাভাবিক বদল এসেছে এমন ফল/সবজি না খাওয়া।
2. খারাপ স্বাদ বা গন্ধযুক্ত খাবার না খাওয়া।
3. কোনো কোনো খাবার থেকে জল বের করে দিয়ে (অর্থাৎ শুকিয়ে ফেলে) সেই খাবারকে অনেকদিন অবধি খাওয়ার যোগ্য রাখা যায়। যেমন, ...।
4. ....।
5. ....।

খাবারে পরজীবী প্রাণী আর জীবাণুর সংক্রমণ

(a) ওপরের ছবিতে দেওয়া মাংসগুলোর মধ্যে কোনটা তুমি খাবে? ....।

(b) কেন তুমি ওই মাংসটাকে খাওয়ার জন্য বেছে নিলে? ....।

(c) অন্য মাংসটাকে বেছে নিলে তোমার কি কোনো ক্ষতি হতো? ক্ষতি হলে কী ক্ষতি হতে পারত? ....।

পরজীবী থেকে রোগ

বিভিন্ন পশুর শরীরে অনেকসময় বাসা বাঁধে কৃমি জাতীয় কিছু প্রাণী। পশুর শরীরে সাধারণত আশ্রয় নেওয়া এই কৃমিরা হলো পরজীবী। পরজীবীরা আশ্রয় নিয়েছে এমন পশুর কাঁচা মাংস বা সঠিক তাপমাত্রার রান্না না করা মাংস খেলে ওইসব পরজীবীরা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। আর মানুষের শরীরে নানারকম রোগের সৃষ্টি করে।

এসো এবারে মানুষের শরীরে এইরকম কয়েকটা পরজীবী সংক্রমণ সম্বন্ধে জেনে নিই।

পশুর নাম	পরজীবীর প্রকৃতি	সংক্রামিত মাংস খেলে যে যে রোগ লক্ষণ দেখা যেতে পারে
1. গোরু	ফিতাকৃমি	পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, গা-বমিভাব, খাবারে অনীহা হতে পারে।
2. শুয়োর	ফিতাকৃমি	মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে গেলে মাথায় যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, এমনকি মাঝে মাঝে কাঁপুনিও (seizure) হতে পারে।
	গোলকৃমি	মানুষের অন্ত্রে এই পরজীবীর সংখ্যা বেশি হলে গা-বমিভাব, ডায়ারিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

বার্ড ফ্লু

পাখিদের একধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে (H5N1) অনেকসময় পোলট্রির মুরগিরা আক্রান্ত হয়। এই বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত মুরগিদের লালারস, সর্দি বা মলের সংস্পর্শে এলে অন্য মুরগিরাও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত মুরগির চামড়া, মলমূত্র বা রক্তের সংস্পর্শে এলে মানুষও বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হতে পারে। বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত মুরগির কাঁচা মাংস খেলে বা ঠিক তাপমাত্রায় (70°C তাপমাত্রায় 30 মিনিট) রান্না না করা মাংস খেলেও বার্ড ফ্লু হতে পারে।

বার্ড ফ্লু হলে প্রথম দিকে জ্বর, গলা খুশখুশ, চোখে সংক্রমণ, বমি বা ডায়ারিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অবশেষে নিউমোনিয়া আর শ্বাসকষ্ট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ

পোলট্রিজাত খাবার (যেমন-ডিম, মাংস), কাঁচা সবজি, পাস্তুরাইজ না করা দুধে অনেকসময় জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। এইসব খাবার কাঁচা বা সঠিকভাবে রান্না না করে খেলে শরীরে নানারকম রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে।

এসো এইরকম কয়েকটা রোগজীবাণু আর তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ সম্বন্ধে জানি।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি	কীভাবে সংক্রমণ ঘটে
স্যালমোনেলোসিস	ব্যাকটেরিয়া	কাঁচা বা সঠিকভাবে রান্না না করা পোলট্রিজাত খাবার থেকে; বর্জ্য বস্তুর সাহায্যে ফলানো সবজি থেকে
ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস	ব্যাকটেরিয়া	ঠিকমতো তাপমাত্রায় রান্না না করা পোলট্রিজাত খাবার আর পাস্তুরাইজ না করা দুধ থেকে
খাবারে বিষক্রিয়া	ব্যাকটেরিয়া	রান্না করা বাসি মাংস (বা অন্য পোলট্রিজাত খাবার) বা ফ্রিজ থেকে বার করা মাংস সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে, হালকা গরম করে খেলে; এমনকী ঠিকভাবে রান্না না করা মাংস বা পোলট্রিজাত খাবার খেলে
বটুলিসম	ব্যাকটেরিয়া	টিনবন্দি খাবার (Canned food) টিনবন্দি করার আগে ঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত না করা হলে

পাস্তুরাইজেশন

লুই পাস্তুর

খুব সহজ করে বললে, পাস্তুরাইজেশন হলো খাবার, বিশেষত তরল খাবার (যেমন-দুধ বা দুধ থেকে তৈরি খাবার, ফলের রস)-কে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) আবিষ্কার করেন যে খুব অল্প সময়ের জন্য খাবারটিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করা হলে খাবারের মধ্যে থাকা সমস্ত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (স্পোর সমেত) নষ্ট হয়ে যায়। খাবারকে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়াটির নামের সঙ্গে লুই পাস্তুরের নাম যোগ করার মধ্য দিয়ে তাঁর এই আবিষ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
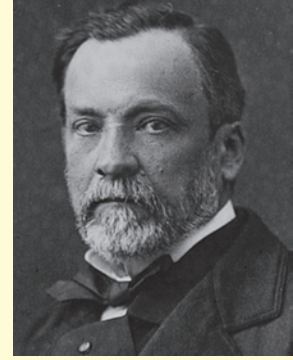
এই প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তুকে একটা বিশেষ তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যবস্তুটিকে ঠান্ডা করে ফেলা হয়।

পাস্তুরাইজ করার জন্য দুধকে 15-40 সেকেন্ডের জন্য 72°-75° সেলসিয়াস বা 2 সেকেন্ডের জন্য 138° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করা হয়। দুধ ওই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছোনোর পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুধের তাপমাত্রা 3° সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে আনা হয়।

জীবাণু সংক্রমণের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ

জীবাণুদের দ্বারা সংক্রামিত খাবারে বিষক্রিয়া ঘটে। আর তার ফলে ওই ধরনের জীবাণু-সংক্রামিত খাবার খেলে শরীরে নানারকম রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এসো এবারে আমরা সেই লক্ষণগুলোর দিকে নজর দিই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কেবলমাত্র খাবারে বিষক্রিয়াই নয় অন্যান্য রোগেও এই ধরনের রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

আর একটা কথা মনে রেখো জীবাণু-সংক্রামিত খাবার খাওয়ার সাধারণত 2-3 ঘন্টার মধ্যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

লক্ষণগুলো হলো	
1. গা গোলানো এবং বমিভাব	4. জ্বর
2. পেটে অসহ্য যন্ত্রণা	5.মাথায় যন্ত্রণা
3. ডায়ারিয়া — বারে বারে পাতলা মলত্যাগ (রক্ত বা রক্ত ছাড়া)	6. দুর্বলতা 7.

এবারে লিখে ফেলো দেখি, খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ বা পরজীবী রোগের হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে?
1.
2.
3.
4.

খাবার থেকে অ্যালার্জি

বায়ুবাহিত রোগের সম্বন্ধে জানার সময় তোমরা নানারকম **অ্যালার্জেন** আর তাদের থেকে সৃষ্ট **অ্যালার্জি** সম্বন্ধে জেনেছ।

কোনো কোনো খাবার খাওয়ার পরে পরেই হয়তো তোমাদের গলা চুলকোয়, মুখে বা গা-হাত-পায়ে চাকা চাকা লালা দাগ দেখা যায়, গা-হাত-পা খুব চুলকোয় — এই সমস্ত লক্ষণই ওই খাবারে থাকা অ্যালার্জেন থেকে হতে পারে।

বিভিন্ন খাবারে থাকা প্রোটিন বা অন্য কোনো উপাদানের বিরুদ্ধে কখনো-কখনো আমাদের শরীরের ইমিউন তন্ত্র নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। অনেক সময় চিংড়ি, বেগুনের মতো কোনো কোনো খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। শরীরে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কোনো খাবারের বিরুদ্ধে, কখনও বা কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে আবার কখনও বা কোনো পতঙ্গ কামড়ালে। বাইরে থেকে আসা প্রোটিনের বিরুদ্ধে শরীরের ইমিউন তন্ত্রের এই যে প্রতিক্রিয়া — এটাই হলো **অ্যালার্জি**। আমরা এখানে কেবলমাত্র বিভিন্ন খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জি নিয়েই আলোচনা করব।

খাবারের বিষক্রিয়া থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছ বুঝতে পারলে কী করবে?

1. ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো।
2. বারেবারে পাতলা মলত্যাগ হলে নুন-চিনির জল/ ORS খেতে হবে।

অ্যালার্জির ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো এটাই যে একটা খাবার খেয়ে হয়তো একজনের শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া (Allergic reaction) দেখা গেল। অথচ তার পাশে বসা আরেকজন, যে ওই একই খাবার খাচ্ছে তার শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না।

কোনো খাবার খেয়ে তোমার কি কখনও অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা গেছিল? যদি তোমার নিজের ক্ষেত্রে এমনটা নাও ঘটে থাকে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো তাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে কিনা। আর নীচে লিখে ফেলো।

অ্যালার্জি হওয়ার কারণ কী বলে মনে হয়	অ্যালার্জির কী কী লক্ষণ দেখা গেছিল	কীভাবে সেরেছিল

এবারে এসো এমন কয়েকটা খাবারের নাম জানি যাদের থেকে অ্যালার্জি হতে দেখা গেছে। তোমরাও শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে আরও কিছু নাম যোগ করতে পারো।

1. ডিম	6. গম
2. সরষে	7. সয়াবিন
3. চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া	8. দুধ
4. শামুক, ঝিনুক	9. বাদাম
5. দুধ/দুগ্ধজাত খাবার	10.

খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জির সাধারণ লক্ষণ

1. গা-হাত-পায়ে লাল লাল চাকা চাকা দাগ	6. বমি
2. গা-হাত-পা চুলকানো	7. পেটে ব্যথা (Abdominal Cramp)
3. মুখ, ঠোঁট, গলা, জিভ ফুলে যাওয়া	8. ডায়ারিয়া
4. গলায় অস্বস্তি; শ্বাসকষ্ট	9.
5. চোখ-মুখ লাল হয়ে যাওয়া	10.

এবারে লিখে ফেলো দেখি, খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জির হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে?

1.
2.
3.
4.

অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিলে কী করবে?

1. ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্বস্তি থেকে সাময়িক আরাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

2. কোন খাবার খেয়ে অ্যালার্জি হলো খুঁজে বার করার চেষ্টা করা। যাতে ভবিষ্যতে ওই খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

খাবারে ভেজাল

তোমরা তো অনেক সময়ই কথাটা শোনো — খাবারে ভেজাল মেশানো আছে। বলতে পারবে এই **ভেজাল**-টা কী? কী ক্ষতি করে আমাদের?

নীচের সারণিটি ভরতি করার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কোন কোন খাবারে ভেজাল মেশানোর কথা তুমি জানো বা শুনেছ	কী মেশানো হয়েছে জানো কি	ওই খাবার খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে

এবারে জানার চেষ্টা করি খাবারে ভেজাল মেশানো আছে কথাটা আমরা কখন বলতে পারি।

(a) খাবারে এমন কিছু মেশানো হয়েছে, যাতে খাবারের খাদ্যগুণ কমে গেছে।

(b) খাবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো উপাদানের বদলে অন্য কোনো সস্তার জিনিস মেশানো আছে।

(c) খাবারটাকে আকর্ষক দেখানোর জন্য বা কাঙ্ক্ষিত স্বাদ আনার জন্য এমন কিছু জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে শরীরে নানারকম রোগ দেখা দিতে পারে।

এই ধরনের খাবার খেয়ে যে সমস্ত রোগ হতে পারে সেগুলোও একধরনের **খাদ্যবাহিত রোগ**।

কাকে ভেজাল খাবার বলবে, সে সম্বন্ধে তোমাদের তো একটা ধারণা হলো। তোমরা প্রতিদিন বাড়ির রান্না করা খাবারের বাইরে আর কী কী খাবার খাও তার একটা তালিকা তৈরি করো। এবারে বলার চেষ্টা করো তো ওইসব খাবারের মধ্যে কোন কোন খাবারে ভেজাল থাকতে পারে।

খাবারের নাম	ভেজাল থাকতে পারে কিনা	কীভাবে থাকতে পারে

তোমরা কি জানো, রঙিন মিষ্টি, লজেন্স, আইসক্রিমে থাকতে পারে এমন সব রং যা আমাদের শরীরে ডেকে আনতে পারে নানারকম রোগ, এমনকি ক্যানসারও! মেলায় বা রাস্তায় যে ঘুগনি বিক্রি হয়, অনেকসময় ঘুগনির ওই হলদে রংটা আনতে দোকানদার একটা ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। এমনকি গুঁড়ো হলুদেও অনেকসময় ওই রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। লাড্ডুতেও অনেকসময় এই রং ব্যবহার করা হয়।

শুধু রং নয়, বিভিন্ন খাবারে সুন্দর স্বাদ আনার জন্যও অনেকসময় ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ। চাউমিন আর চিলি-চিকেনের যে সুন্দর স্বাদ, তার পেছনেও রয়েছে একটা রাসায়নিক পদার্থ। ওই জিনিসটার নাম আজিনোমোটো। আসলে আজিনোমোটো যে কোনো খাবারে দিলে একটা মাংসের মতো স্বাদ আসে। অনেকদিন ধরে খেলে মানুষের শরীরে নানারকম সমস্যা তো হতেই পারে। বিশেষ করে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের কোশের ক্ষতি হতে পারে। রাস্তার ঠিক মান বজায় না রেখে তৈরি করা বিরিয়ানি আর মাংসতেও অনেক সময় ঠিকঠাক রং আর বাঞ্ছিত স্বাদ আনার জন্য মেশানো হতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ। এমনকি হোটেলে রান্না বিরিয়ানি বা মাংসের ক্ষেত্রেও এমনটাই হতে পারে।

অবশ্য সব রাস্তার বা সস্তা খাবারেই যে বাজে রং আর রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় তা নয়। যেসব খাবারে এই জিনিসগুলো মেশানো হয়, সেইসব খাবার একদিন কি দু-দিন খেলে হয়তো কিছু হবে না। কিন্তু অনেকদিন ধরে খেলে হজমের সমস্যা, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, কিডনির রোগ এমনকি ক্যানসারও হতে পারে।

আসলে তুলনামূলকভাবে সস্তা খাবারে ঠিকঠাক স্বাদ, গন্ধ আর রং আনতে অনেক সময়ই নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সস্তার খাবারে মেশানো বেশির ভাগ রং আলকাতরার মতো জিনিস থেকে তৈরি। আলকাতরা কী, সেটা তো তোমরা জানো।

তোমরা কি জানো, দোলে যে রং খেলো সেইসব রঙে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার ফলে তোমাদের চামড়ার নানারকম রোগ হতে পারে! তাই এখন ফুল থেকে নানারকম প্রাকৃতিক রং তৈরি করা হচ্ছে। এইসব রং সবদিক থেকেই বিপন্মুক্ত।

খাবারে ব্যবহার করার জন্য স্বীকৃত বিভিন্ন রং আর রাসায়নিক পদার্থ বাজারে আছে। দাম হয়তো বা একটু বেশি। কিন্তু ওইসব স্বীকৃত রাসায়নিক পদার্থ নির্ধারিত মাত্রায় খাবারে ব্যবহার করলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এসো এবারে দেখা যাক আমাদের প্রতিদিনের খাবারে কীভাবে ভেজাল মেশানো থাকতে পারে।

করে দেখো 1

একটা গ্লাসে কিছুটা দুধ নাও। দুধে কয়েক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন মেশাও। কী দেখলে নীচে লেখো।

....

যদি দেখো দুধের রং নীল হয়ে গেলো, তাহলে বুঝবে যে ওই দুধে স্টার্চ মেশানো আছে।
দীর্ঘদিন ধরে স্টার্চ মেশানো দুধ খেলে পেটে ও শরীরের নানা অঙ্গে সমস্যা হতে পারে।

করে দেখো 2

কাটা আলুর টুকরোয় নুন মাখিয়ে কয়েক মিনিট রাখো। এরপর ওই আলুর টুকরোয় দু-ফোঁটা লেবুর রস দাও। আলুতে নীল রং দেখা গেলে বুঝবে নুনে আয়োডিনের যৌগ মেশানো (Iodized Salt) আছে।
নীল রং যদি দেখা না যায়, তাহলে কী বুঝবে? ....। এই ধরনের নুন খেলে কী ক্ষতি? ....।

করে দেখো 3

(a) কিছু গোটা সরষে নাও।
নমুনা সরষের রং — খুব একটা কালো নয়/ একদম কালো।

(b) নমুনা সরষের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখো।
নমুনা সরষের গাটা — মসৃণ/ মসৃণ নয়।

(c) একটা গোটা সরষের দানা হাতে নিয়ে ভেঙে দেখো।
দানার ভেতরটা — হলদে রঙের/ সাদা রঙের

অনেকসময় সরষের বীজের সঙ্গে শিয়ালকাঁটার বীজ মেশানো থাকে। শিয়ালকাঁটার বীজ সরষের মতো দামি নয়। কিন্তু দেখতে প্রায় সরষে বীজের মতোই।
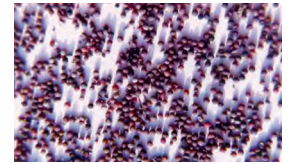
সরষে বীজের চেয়ে শিয়ালকাঁটার বীজ বেশি কালো রঙের হয়। আর বীজের গা-টা অমসৃণ হয় না,বীজের ভেতরটা হয় সাদা রঙের।

শিয়ালকাঁটার বীজ আর তার তেল

শিয়ালকাঁটার বীজ অনেকটা সরষের বীজের মতো দেখতে হয় — সেটা তো তোমরা জেনেছ। বুঝতেই পারছ সরষের তুলনায় শিয়ালকাঁটার বীজের দাম কম। শিয়ালকাঁটার বীজের তেল অনেকসময় সরষের তেলের সঙ্গে মেশানো হয়। এই ভেজাল সরষের তেল খেলে একটা রোগ হয় — যার নাম **ড্রপসি**। এই রোগে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় চামড়া, যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক আর হৃৎপিন্ড। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো বমি, ডায়ারিয়া, গা-বমি ভাব, জ্বর। এমনকি হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুস অচল হয়ে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ড্রপসি রোগ ভারতবর্ষে ইদানীংকালে অনেকবারই হানা দিয়েছে। 1998 সালে দিল্লিতে, 2000 সালে গোয়ালিয়রে, 2002 সালে কনৌজে আর 2005 সালে লক্ষ্মৌতে সরষের তেলে ভেজাল মেশানোর ফলে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ল্যাথিরিজম (Lathyrism)

অনেকসময় অড়হর ডালের সঙ্গে খেসারির (*Lathyrus sativus*) ডাল মিশিয়ে দেওয়া হয় বা বেসনের সঙ্গে খেসারির ডাল গুঁড়ো করে মেশানো হয়। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। অন্যান্য ডালের চেয়ে খেসারির ডালের দাম অনেকটাই কম। একটানা 2-3 মাস ধরে যথেষ্ট পরিমাণে এই ডাল খেলে পায়ে আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে (progressive spastic paralysis)। এটাই ল্যাথিরিজম। ইথিয়োপিয়া, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তানে অনেকসময়ই এই রোগের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

অনেকসময় খাবারে/খাবারের কোনো উপাদানে কৃত্রিম ক্ষতিকারক কিছু রাসায়নিক রং মেশানো হয়, যা স্বীকৃত নয়। এসো এবারে সেইসব রঙের কয়েকটা সম্বন্ধে একটু জেনে নিই।

কৃত্রিম রঙের নাম	রং	কোন কোন খাবার/খাবারের উপাদানে মেশানো হতে পারে	শরীরে কী ক্ষতি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়
1.মেটানিল ইয়োলো (Metanil Yellow)	হলুদ	গুঁড়ো হলুদ, লাড্ডু, ...	অনেকদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারও হতে পারে
2.ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite Green)	সবুজ	উচ্ছে, লঙ্কা, পটল	অনেকদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারও হতে পারে।

মেটানিল ইয়োলো

ম্যালাকাইট গ্রিন

খাবারের মাধ্যমে সংক্রামিত রোগের হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে বলে তোমার মনে হয়?	
1.	3.
2.	4.

নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের পাঁচ চাবিকাঠি

(প্রতিটি ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নিলে তোমার মনে হয় নিরাপদে খাবার খেতে পারবে?)

পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা **(Keep clean)**

i)

ii)

কাঁচা আর রান্না করা খাবার আলাদা রাখা **(Separate raw & cooked food)**

i)

ii)

ভালোভাবে আর পুরোপুরি রান্না করা **(Cook thoroughly)**

i)

ii)

নিরাপদ তাপমাত্রায় খাবার রাখা **(Keep food at safe temperature)**

i)

ii)

পরিষ্কার জল আর কাঁচামাল ব্যবহার করা **(Use safe water and raw materials)**

i)

ii)

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1. ভৌত পরিবেশ

ক) তাপ
খ) আলো
গ) চুম্বক
ঘ) তড়িৎ
ঙ) পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার

2. সময় ও গতি

ক) গতির ধারণা
খ) দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ
গ) বলের ধারণা ও নিউটনের গতিসূত্র, বলের পরিমাপ
ঘ) শক্তি ও কার্য

3. পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

ক) চিহ্ন
খ) পরমাণুর গঠন
গ) সংকেত লেখার কৌশল
ঘ) রাসায়নিক বিক্রিয়া
ঙ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

4. পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা

ক) জীবদেহ গঠনে অজৈব ও জৈব পদার্থে ভূমিকা
খ) সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য শনাক্তকরণ
গ) অম্ল ও ক্ষারের ধারণা; নির্দেশক ও প্রশমন
ঘ) মানবদেহের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য
ঙ) খাদ্য লবণ
চ) সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব

5. মানুষের খাদ্য

ক) খাদ্য উপাদান
খ) অপুষ্টি ও স্থূলত্ব
গ) প্রাকৃতিক খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য
ঘ) জীবনে জলের ভূমিকা
ঙ) খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর ভূমিকা

6. পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া

ক) উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য
খ) পরাগমিলন ও সমস্যা
গ) ব্যাপন
ঘ) অভিস্রবণ
ঙ) অঙ্কুরোদগম

7. পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ

ক) জলবায়ুর পরিবর্তন
খ) জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাস
গ) বর্জ্য ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি
ঘ) পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা

8. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য

ক) পরিবেশের সংকট ও স্বাস্থ্য
খ) মানুষের বিভিন্ন পেশা-সমস্যা ও রোগ
গ) স্বাস্থ্যের প্রকৃতি (দৈহিক ও মানসিক)
ঘ) সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার
ঙ) রোগ সংক্রমণে বাহকের ভূমিকা ও প্রতিকার
চ) খাদ্যবাহিত রোগ ও প্রতিকার

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ— (i) তাপ (1-14)	5
3.	পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (85-100)	5
5.	মানুষের খাদ্য (145-181)	5

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1. ভৌত পরিবেশ—

(ii) আলো (15-37)	5
(iii) চুম্বক (38-48)	5
(iv) তড়িৎ (49-62)	5
(v) পরিবেশবান্ধব শক্তি (63-69)	5
(vi) পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া (182-226)	5

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :

2.	সময় ও গতি (70-84)	10
4.	পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা (101-144)	10
7.	পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ (227-255)	10
8.	পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য (256-307)	10

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশগুলির সঙেগ প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত অধ্যায় তাপ; পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া; মানুষের খাদ্য; দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত আলো অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1. (i) তাপ	5
(ii)আলো	5
2. সময় ও গতি	10
3. পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া	10
4. পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা	10
5. মানুষের খাদ্য	10
6. পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ	10
7. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য	10

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী		প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ	
1)	সারণি পূরণ	1)	অংশগ্রহণ
2)	ছবি বিশ্লেষণ	2)	প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
3)	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	3)	ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
4)	দলগত কাজ ও আলোচনা	4)	সমানুভূতি ও সহযোগিতা
5)	কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	5)	নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
6)	সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন		
7)	হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি		
8)	ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)		

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতি প্রশ্নের নম্বর 1)

(i) জ্বর হওয়ায় কোনো রোগীর শরীরের উষ্ণতা পাওয়া গেল 104^{0}F। ওই উষ্ণতা সেলসিয়াস থার্মোমিটারে মাপলে সেই মান হবে— (a) 40.1 (b) 40.6 (c) 40 (d) 42

(ii) একটি থার্মোমিটার দিয়ে সবচেয়ে কম উষ্ণতা (-1^{o}) ও সবচেয়ে বেশি উষ্ণতা (99^{o}) মাপা যায়। ওই থার্মোমিটারে 1^{o} করে মোট কটি ঘর পাওয়া যাবে? (a) 100 (b) 99 (c) 101 (d) 98

(iii) সমতল আয়নার সঙ্গে লম্বভাবে কোনো আলোকরশ্মি ওই আয়নার ওপর আপতিত হলে, প্রতিফলন কোণের মান হবে— (a) 90^{o} (b) 0^{o} (c) 180^{o} (d) 45^{o}

(iv) রংধনু সৃষ্টির কারণ — (a) আলোর নিয়মিত প্রতিফলন (b) আলোর বিচ্ছুরণ (c) আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (d) আলোর রাসায়নিক পরিবর্তন।

(v) সূর্যের আলো 12 ঘন্টার কম স্থায়ী হলে নীচের কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভালো হয়?— (a) পটল (b) পালং (c) ঝিঙে (d) ঢ্যাঁড়শ
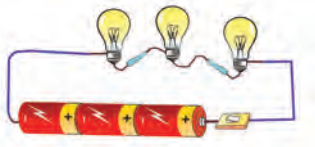
(vi) — এই চিত্রটির জন্য নীচের কোন বর্তনী চিত্রটি ঠিক

(a)

(b)

(c)

(d)
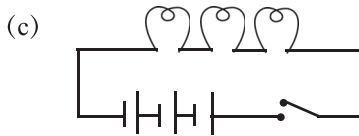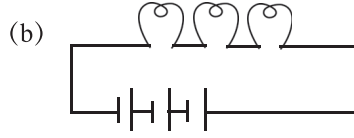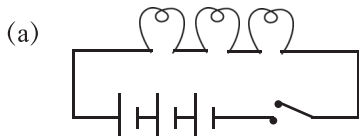
(vii) চুম্বকত্বের নিশ্চিত পরীক্ষা হলো — (a) শুধু আকর্ষণ ধর্মের পরীক্ষা (b) শুধুমাত্র বিকর্ষণ ধর্মের পরীক্ষা (c) আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় ধর্মের পরীক্ষা (d) চুম্বক আবেশের পরীক্ষা

(viii) একটি দণ্ডচুম্বককে তিনটি টুকরো করা হলো— (a) শুধু প্রান্তের টুকরো দুটিই চুম্বক থাকবে (b) শুধু মাঝখানেরটিই চুম্বক থাকবে (c) তিনটি টুকরোই চুম্বক থাকবে (d) কোনো টুকরোই আর চুম্বক থাকবে না

(ix) তড়িৎচুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি নীচের কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক হবে— (a) শুধু তারের পাকসংখ্যা বাড়ানো হলো, (b) শুধু তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বাড়ানো হলো (c) শুধু তড়িৎ প্রবাহের সময় বাড়ানো হলো (d) তারের পাকসংখ্যা ও তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা একসঙ্গে বাড়ানো হলো

(x) কোনো বস্তুকণার ওপর 3N বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুকণাটি বল প্রয়োগের দিকে 12m সরে গেল। এর ফলে মোট কাজের পরিমাণ হলো —(a) (12×3) J (b) $(12+3)$ J (c) $(12-3)$ J (d) $(12\div3)$ J

(xi) স্ক্রু-ড্রাইভারের গতি নীচের কোন গতির উদাহরণ — (a) সরলরৈখিক গতি, (b) বৃত্তাকার পথের গতি, (c) ঘূর্ণন গতি (d) মিশ্র গতি

(xii) জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) ও ফসফেট মূলক (PO_4^{3-}) দিয়ে গঠিত যৌগের সংকেত হবে— (a) $ZnPO_4$ (b) $Zn_2(PO_4)_3$ (c) $Zn(PO_4)_2$ (d) $Zn_3(PO_4)_2$

(xiii) $Pb(NO_3)_2 + FeSO_4 \rightarrow PbSO_4 + Fe(NO_3)_2$ — এই বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া? (a) প্রতিস্থাপন (b) প্রত্যক্ষ সংযোগ (c) বিয়োজন (d) বিনিময়

(xiv) ভিনিগারের মধ্যে কিছুটা খাবার সোডা মেশানো হলো। এর ফলে ভিনিগারের— (a) আম্লিক ধর্ম বৃদ্ধি পাবে (b) আম্লিক ধর্ম হ্রাস পাবে (c) ক্ষারীয় ধর্ম হ্রাস পাবে (d) ক্ষারীয় ধর্ম বৃদ্ধি পাবে।

(xv) নীচের কোন মৌলটি ছাড়া জীবকোশ গঠিত হওয়া অসম্ভব— (a) অ্যালুমিনিয়াম (b) সিলিকন (c) সোনা (d) কার্বন

(xvi) চুল, নখ, চামড়া ও পেশির অপরিহার্য উপাদান হলো— (a) কার্বোহাইড্রেট (b) খনিজ লবণ (c) প্রোটিন (d) লিপিড

(xvii) $^{35}_{17}Cl$ পরমাণুর ক্রমাঙ্ক ও নিউট্রন সংখ্যার যথাক্রমিক মান হলো— (a) 17,18 (b) 35,17 (c) 18,17 (d) 17, 35

(xviii) কোন পলিমারটি বায়োডিগ্রেডেবল— (a) পলিথিন (b) PVC (c) মাংসপেশির প্রোটিন (d) PET

(xix) লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের কাজে কোন ধাতুর আয়ন অপরিহার্য— (a) জিঙ্ক (b) ক্যালশিয়াম (c) সোডিয়াম (d) আয়রন

(xx) এমন একটি খাদ্য উপাদান যা থেকে শক্তি পাওয়া যায় না, সেটি হলো— (a) কার্বোহাইড্রেট (b) প্রোটিন (c) লিপিড (d) ভিটামিন

(xxi) অ্যানিমিয়া হলো — (a) আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ (b) ভিটামিন D-র অভাবজনিত রোগ (c) লৌহের অভাবজনিত রোগ (d) ভিটামিন A-র অভাবজনিত রোগ

(xxii) একটি সংশ্লেষিত খাদ্য হলো — (a) জ্যাম (b) আম (c) মাছের ঝোল (d) কোল্ড ড্রিংক্স

(xxiii) কাণ্ডের যে জায়গা থেকে শাখা বা পাতা বেরোয় সেই জায়গাটা হলো — (a) পর্ব (b) কক্ষ (c) পর্বমধ্য (d) বিটপ

(xxiv) ফুলের যে অংশটা ফলে পরিণত হয় সেটা হলো — (a) বৃতি (b) দলমণ্ডল (c) পরাগধানী (d) ডিম্বাশয়

(xxv) সাধারণ মাছি ছড়ায় এমন একটা রোগ হলো — (a) কালাজ্বর (b) অঙ্কোসারকিয়াসিস (c) টাইফয়েড (d) চিকুনগুনিয়া

(xxvi) ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো একটা — (a) বায়ুবাহিত রোগ (b) মশাবাহিত রোগ (c) মাছিবাহিত রোগ (d) জলবাহিত রোগ

2. নীচের যে কথাটি ঠিক তার পাশে '✓' আর যে কথাটি ভুল তার পাশে '✗' দাও : (প্রতি প্রশ্নের নম্বর 1)

(i) স্ত্রী মশা কেবলমাত্র ফলের রস পান করে। ☐ (ii) সাধারণ মাছি খাদ্য বা পানীয়ে মলত্যাগের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ☐ (iii) সস্তার খাবারে মেশানো বেশিরভাগ রং আলকাতরার মতো জিনিস থেকে তৈরি। ☐ (iv) জন্মগত ত্রুটিও মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। ☐ (v) টিকাদানের মাধ্যমে জল বসন্তকে পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। ☐ (vi) ফ্লুওরাইডের প্রভাবে হাতের তালুতে খসখসে উঁচু উঁচু ছোপ দেখা যায়। ☐ (vii) কলেরা একটা বায়ুবাহিত রোগ। ☐ (viii) অনেকগুলো খাদ্যশৃঙ্খল একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে খাদ্যজাল। ☐ (ix) তাপমাত্রা কমলে ব্যাপন তাড়াতাড়ি ঘটে। ☐ (x) আমের বীজে একটা বীজপত্র থাকে। ☐ (xi) মটরগাছ কাণ্ডের পর্ব থেকে বেরোনো মূল বেয়ে ওপরে ওঠে। ☐ (xii) মূলে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। ☐ (xiii) প্রক্রিয়াজাত খাবারের তুলনায় প্রাকৃতিক খাবারের পুষ্টিগুণ কম। ☐ (xiv) একটি খাদ্য থেকে একাধিক খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে। ☐ (xv) শক্ত দড়ির মতো টেনডন ও লিগামেন্ট প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ☐ (xvi) ব্যাপনের সময় অণুরা কম গাঢ় অংশ থেকে বেশি গাঢ় অংশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

(i) পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সময় পদার্থের ____________ অপরিবর্তিত থাকে। (ii) দুটি ভিন্ন উষ্ণতার পদার্থ সংস্পর্শে থাকলে কোন পদার্থ তাপ গ্রহণ করবে আর কোন পদার্থ তাপ ছাড়বে তা পদার্থ দুটির ____________ এর ওপর নির্ভরশীল। (iii) সূর্য থেকে আসা আলোক রশ্মিগুচ্ছকে ____________ আলোক রশ্মিগুচ্ছ বলা যেতে পারে। (iv) তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার কাছে থেকে কোনো আয়নাকে 1m দূরে সরিয়ে নেওয়া হলো। তোমার প্রতিবিম্ব তোমার কাছ থেকে ____________ m দূরে সরে যাবে। (v) একটি দণ্ড চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য 7cm হলে তার চৌম্বক দৈর্ঘ্য ____________ cm হবে। (vi) কোনো সেলে রাসায়নিক শক্তি ____________ শক্তিতে পরিণত হয়। (vii) কয়লা হলো এক গুরুত্বপূর্ণ ____________ জ্বালানি। (viii) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা ____________ বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়। (ix) প্রোটন ____________ তড়িৎযুক্ত, ইলেক্ট্রন ____________ তড়িৎযুক্ত কণা। (x) নাইট্রেট, সালফেট ও কার্বনেট মূলকের সংকেত হলো ____________, ____________ ও ____________। (xi)স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সংকেত যাওয়া আসায় প্রয়োজন হয় ____________, ____________ ও ____________ আয়ন। (xii) কোনো দ্রবণের pH 10 হলে তাকে ____________ প্রকৃতির বলা যেতে পারে। (xiii) পাতিলেবুর টক স্বাদের জন্য দায়ী হলো ____________ ও ____________ অ্যাসিড। (xiv) পাকস্থলীর রসের pH প্রায় 1 তাই বলা যায় সেটি যথেষ্ট ____________ প্রকৃতির। (xv) গলগণ্ড বা গয়টার রোগে ____________ গ্রন্থি ফুলে ওঠে। (xvi) ____________ জাতীয় যৌগ বহু সংখ্যক ছোটো ছোটো অণু জুড়ে তৈরি হয়। (xvii) চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেলকে কস্টিক ক্ষার সহ গরম করে ____________ তৈরি করা হয়। (xviii) একই উষ্ণতায় হালকা অণুদের চেয়ে ভারী অণুদের ব্যাপনের হার ____________। (xix) চুল ও নখে ____________ প্রোটিন থাকে। (xx) জলে গুলে যায় এমন একটা ভিটামিন হলো ____________। (xxi) ____________ পত্রবৃন্তকে কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত করে। (xxii) পরাগধানীতে থাকে ____________। (xxiii) একটা সরল ফল হলো ____________। (xxiv) দোপাটি হলো ____________ ফুল। (xxv) একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় অবস্থার চেয়ে তরলে ব্যাপন ঘটে ____________। (xxvi) আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা হলো ____________। (xxvii) ____________ হলো একটি অতিবৈচিত্র্যের দেশ। (xxviii) মূলযুক্ত উদ্ভিদ মাটির ____________ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। (xxix) মাছি দ্বারা সংক্রামিত একটা রোগ হলো ____________। (xxx) আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলতে ____________ রশ্মি ব্যবহার করা হয়। (xxxi) পুরুষ মশার প্রোবোসিসটি ____________। (xxxii) মশা হলো ____________ বাহক। (xxxiii) ____________ বীজের তেল মেশানো সরষের তেল খেলে ড্রপসি নামে একটা রোগ হয়।

4. বেমানান শব্দ বা নামটিকে খুঁজে বার করো : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)

i) প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ii) পোলিও, কলেরা, ম্যালেরিয়া, সাধারণ ডায়ারিয়া iii) আত্মসচেতনতা, মানসিক অবসাদ, মনোযোগহীনতা, মানসিক উদবেগ iv) বীজত্বক, বীজপত্র, ফলত্বক, ভ্রূণাক্ষ v) মুলো, আলু, বীট, গাজর vi) সাইবেরিয়ার বাঘ, হাতি, গঙ্গার শুশুক, কস্তুরী মৃগ vii) শিয়ালকাঁটার বীজ, খেসারির ডাল, দুধ, মেটানিল ইয়োলো

5. স্তম্ভগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1 নম্বর)**

নমুনা হিসাবে একটি উত্তর করে দেওয়া হলো ।

I.

'A' স্তম্ভ		'B' স্তম্ভ		'C' স্তম্ভ	
i)	পটাশিয়াম পরমাণু	a)	আয়োডিনের অভাব	1)	ক্যাটায়ন দেয়।
ii)	Zn^{2+} ও Cl^{-} আয়ন	b)	কস্টিক ক্ষার	2)	জিঙ্ক ক্লোরাইড গঠন করে
iii)	থাইরয়েড গ্রন্থি	c)	প্রাকৃতিক পলিমার	3)	তীব্র আম্লিক
iv)	চর্বি	d)	1টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে	4)	সাবান
v)	লঘু HCl দ্রবণ	e)	1: 2 সংখ্যার অনুপাতে যুক্ত হয়ে	5)	বায়োডিগ্রেডেবল
vi)	নাইলন	f)	মিথাইল অরেঞ্জ	6)	গয়টার
vii)	স্টার্চ বা শ্বেতসার	g)	কৃত্রিম পলিমার	7)	নন-বায়োডিগ্রেডেবল
viii)	পাকস্থলীর রস	h)	pH প্রায় 1	8)	লাল

উ: **ii - d - 2**

II.

'A' স্তম্ভ		'B' স্তম্ভ	
i)	চৌম্বক দৈর্ঘ্য	a)	তড়িৎ শক্তির আলোক ও তাপশক্তিতে রূপান্তর
ii)	সূর্যের তাপের প্রভাব	b)	তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি
iii)	প্রাকৃতিক বর্ণালী	c)	সমান মানের কিন্তু বিপরীতমুখী দুটি বল
iv)	তারের পাক সংখ্যা বৃদ্ধি	d)	উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সংযোজক রেখাংশের দৈর্ঘ্য
v)	LED	e)	দিনের বেলায় বাবলা গাছের পাতা খুলে যায়
vi)	ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	f)	রংধনু

III.

'A' স্তম্ভ		'B' স্তম্ভ	
i)	প্রোটিন ও শক্তির অভাব	a)	নিডারিয়া
ii)	মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ শোষণ	b)	রেসারপিন
iii)	কোয়ালা ভালুক	c)	কার্বন ডাইঅক্সাইড
iv)	ঘুম আর খিদে বেড়ে যাওয়া	d)	যক্ষ্মা
v)	মলের রং চাল ধোওয়া জলের মতো	e)	মূলরোম
vi)	সর্পগন্ধা	f)	বায়োডাইভারসিটি হটস্পট
vii)	প্রবাল	g)	ম্যারাসমাস
viii)	গা-হাত-পায়ে চাকা চাকা লাল দাগ	h)	ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা
ix)	গাছের খাবার তৈরির উপাদান	i)	মানসিক অবসাদ
x)	সুন্দাল্যান্ড	j)	অ্যালার্জি
		k)	কলেরা

6. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **(প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)**

(i) কোনো বস্তুর ওপর 'ক' 10 N ও 'খ' ওই একই বস্তুর ওপর 7 N বল প্রয়োগ করার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই কৃতকার্যের পরিমাণ একই হয়। কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির সরণ বেশি হয়েছে? (ii) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে প্রতিমুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হলেও রৈখিক ত্বরণের মান শূন্যই থাকে। (iii) কুলোর সাহায্যে চাল ঝাড়া হচ্ছে — এটি কোন জাড্যের উদাহরণ বলে তুমি মনে করো? (iv) সুইচ অন করলে কোনো বর্তনী 'মুক্ত' না 'বদ্ধ' হয়? (v) একটি লোহার টুকরোকে একটি শক্তিশালী চুম্বকের সামনে আনলে তা

সাময়িকভাবে একটি চুম্বকের মতো আচরণ করতে পারে। এটি চুম্বকের কোন্ ধর্মের জন্য হয়? (vi) আয়নায় P,A,C,O,M,T,S অক্ষরগুলির মধ্যে কোনগুলির প্রতিবিম্বে পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘটবে না? (vii) এমন একটি পদার্থের উদাহরণ দাও যাকে তাপ দিলে গলন না হয়ে সরাসরি বাষ্পীভবন হয়। viii) সমীকরণসহ বিয়োজন বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও। ix) অ্যাসিড-ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি উদাহরণ দাও। x)পরিবর্তনশীল যোজ্যতা আছে এমন দুটো ধাতুর চিহ্ন লেখো। তোমার বক্তব্যের সপক্ষে প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও। xi) খাবার তৈরিতে আজিনোমোটো ব্যবহার করা হয় কেন? xii) লোহিত রক্তকণিকায় থাকা একটা প্রোটিনের নাম লেখো। xiii) দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করে কোন খনিজ মৌল? xiv) খাদ্যতন্তু পাওয়া যায় এমন একটা খাবারের নাম লেখো। xv) বেলের শাখাকণ্টক কী ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড? xvi) অন্যান্য শর্ত একই থাকলে হালকা আর ভারী অণুর ক্ষেত্রে ব্যাপনে কী পার্থক্য লক্ষ করা যায়? xvii) অভিস্রবণে কোন ধরনের পর্দার মাধ্যমে দ্রবণে দ্রাবকের অণুর আসা-যাওয়ার ঘটনা ঘটে? xviii) *Plasmodium vivax* কোন রোগের জীবাণু? xix) নোংরা জলে ডিম পাড়ে কোন ধরনের মশা? xx) ফ্লুওরেসেন্ট বালব তৈরি করতে কোন ধাতুর বাষ্প ব্যবহার করা হয়? xxi) একটা দ্বিবীজপত্রী বীজের বীজত্বকের স্তরগুলোর নাম কী কী?

7. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 2)

i) আকাশে যে রংধনু তুমি দেখতে পাও তা আসলে কী এবং তা আলোর কোন ধর্মের জন্য ঘটে? প্রিজম ছাড়া কীভাবে তা সম্ভব হয়? ii) উষ্ণতার কোন মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট উভয় স্কেলেই সমান হয়? iii) শুষ্ক বায়ু যে তড়িতের কুপরিবাহী তা তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে? iv) দুটি স্টেশনের দূরত্ব 400 km। একটি ট্রেন আপে যাওয়ার সময় 50 km/h বেগে যায় ও ডাউনে 40 km/h বেগে ফিরে আসে। যাতায়াতে ট্রেনটির গড় বেগ কত? v) একটি খেলার বলকে 'ক্যাচ' লোফার পর বলশুদ্ধ হাতকে বলের গতির দিকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়া হয় কেন? vi) একটি খালি বালতির ভিতরের তলদেশে একটি কয়েন রেখে বালতিটি জলপূর্ণ করার পর ওপর থেকে দেখলে কয়েনটি কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হয় কেন? vii) থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলতে কী বোঝ? একটি উদাহরণ দাও। viii) সিমেন্ট-বালি দিয়ে ঢালাই করার পর দিন থেকে ঢালাইতে জল দেওয়া হয় কেন? ix) প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার বিপরীত বিক্রিয়াকে কী ধরনের বিক্রিয়া বলা যেতে পারে? একটি উদাহরণ দাও। x) সমীকরণ দুটোর সমতা বিধান করো (a) $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$ (b) $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow CuO + 4NO_2 + O_2$ xi) দুটি কৃত্রিম পলিমারের নাম লেখো। xii) মানবদেহের ওজনের প্রায় 97% যে চারটি মৌলের মিলিত ভর সেই মৌলগুলি কী কী? xiii) চামড়ার নীচে লিপিডের স্তরের প্রয়োজনীয়তা কী? xiv) ম্যালেরিয়া রোগের একটা মুখ্য আর একটা গৌণ পোষকের নাম লেখো। xv) হাড় ও দাঁতের গঠন ঠিক রাখা কোন কোন ভিটামিনের কাজ? xvi) খাবার তৈরি করতে গাছ পরিবেশ থেকে কোন কোন উপাদান গ্রহণ করে? xvii) জলশোষণ ছাড়াও মূলের অন্য দুটো কাজের কথা লেখো। xviii) খাদ্য সঞ্চয় করে এমন একটা একটা পাতার নাম লেখ। xix) অতিরিক্ত বাষ্পমোচনে বাধা সৃষ্টি করে এমন একটা পাতার নাম লেখো। xx) একটা স্বপরাগী আর একটা ইতরপরাগী ফুলের নাম লেখো। xxi) পরিবেশের এমন দুটো গ্যাসীয় পদার্থের নাম লেখো বিশ্ব উষ্ণায়নে যাদের ভূমিকা আছে। xxii) ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আছে এমন দুটো বায়োডাইভারসিটি হটস্পটের নাম লেখো।

8. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 3)

i) একটি বর্তনীর ছবি আঁকো যাতে দুটি বালব, চারটি সেল দিয়ে তৈরি ব্যাটারী, প্রয়োজন মতো তার ও একটি সুইচ (অফ্ অবস্থায়) থাকবে। ii) একটি কাচের গ্লাসের ওপর একটা কার্ডবোর্ড রাখা আছে। কার্ডবোর্ডটির মাঝখানে রয়েছে একটি কয়েন। কার্ডবোর্ডটাকে জোরে টোকা মারলে তা ছিটকে সরে যাবে কিন্তু কয়েনটা গ্লাসে পড়বে— কারণ ব্যাখ্যা কর। iii) ধরা যাক একটি ডোবায় স্বচ্ছ জল আছে। ডোবার তলদেশের কাছাকাছি একটি ছোটো মাছ স্থির হয়ে ভেসে আছে। পাড় থেকে এক ব্যক্তি তার বন্দুক দিয়ে মাছটিকে যতবার গুলি করছে ততবারই ফসকে যাচ্ছে— কারণ ব্যাখ্যা কর। iv) কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ তিন গুণ করা হলে বস্তুটির সরণ পূর্বের সরণের পাঁচগুণ হয়। কৃতকার্য পূর্বের কতগুণ হবে? v) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয় না এবং তারা একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়। একটি পরীক্ষার সাহায্যে তা বুঝিয়ে দাও। vi) 0^oC উষ্ণতায় 5 গ্রাম বরফকে কত তাপ দিলে তা 0^oC উষ্ণতায় 5 গ্রাম জলে পরিণত হবে। vii) জলে ভেজা গায়ে দাঁড়ালে তোমার ঠান্ডা লাগে। তবে জলে ভেজা গায়ে ঘূর্ণায়মান পাখার তলায় দাঁড়ালে তোমার বেশি ঠান্ডা লাগে কেন? viii) আলোর প্রতিফলনের জন্য আমরা কী সুবিধা পেতে পারি? ix) পৃথিবী একটা বিরাট চুম্বক না হলে কী কী ঘটনা ঘটত? x) কী কী উপায়ে তুমি শক্তির অপব্যবহার কমাতে পারো? xi) কোথায় কোথায় সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়। বেশি সৌরশক্তি ব্যবহার করার কয়েকটি অসুবিধার কথা লেখো। xii) ঘূর্ণনগতি, বৃত্তাকার গতি, মিশ্র গতির একটি করে উদাহরণ দাও। xiii) অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকটি কুফল উল্লেখ করো। xiv) রক্তে নুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কী কী শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?

xv) মানবদেহে ক্যালশিয়াম ও আয়রনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো। xvi) তোমাকে দুটো বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ দেওয়া হয়েছে। এর একটা ক্ষারীয় ও অন্যটা আম্লিক। কী কী পরীক্ষা করে তুমি কোনটা আম্লিক ও কোনটা ক্ষারীয় তা চিনবে? (কোনো দ্রবণ মুখে দিয়ে পরীক্ষা করা চলবে না, তা নিরাপদ নয়)। xvii) ব্যাপন বলতে কী বোঝায়? একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় ও দ্রবণ অবস্থায় ব্যাপনের ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ধীরে ঘটে? xviii) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ব্যাপন কীভাবে প্রভাবিত হয়? xix) ব্যাকটেরিয়া কোশের কোশপ্রাচীর তৈরিতে বাধা পড়লে কী হতে পারে? xx) দেহের ওজন অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া কী কী বিপদ ডেকে আনতে পারে? xxi) কী কী কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে তোমার মনে হয়? xxii) জীবাণু সংক্রমণের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার কয়েকটা লক্ষণ লেখো। xxiii) প্লেগের সংক্রমণ কীভাবে ঘটে? xxiv) অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার তিনটে পার্থক্য লেখো। xxv) জীবনকুশলতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? xxvi) খাদ্যশৃঙ্খলটা সম্পূর্ণ করো : ফুলের মধু → ☐ → ☐ → ☐ xxvii) চোরাশিকারের ফলে একটা বনে বাঘ বা অন্য বড়ো মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে গেল। এর ফলাফল কী হতে পারে? xxviii) উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ গলে গেলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? xix) কলেরা রোগীর শরীরে নুন - গ্লুকোজ মেশানো জল প্রবেশ করানো হয় কেন?

9. 'আমি কে' লেখ : **(প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)**

(a) (i) আমার সারা দেহ রোমে ঢাকা।
(ii) আমার বুক ধূসর রঙের।
(iii) আমার পিঠে চারটে লম্বা কালো দাগ আছে।
(iv) আমি নানারকম রোগ ছড়াই।

আমি ____________________।

(b) (i) আমি সারাক্ষণ তোমাদের চারপাশেই আছি।
(ii) চুনাপাথরকে উত্তপ্ত করলে আমাকে পাবে।
(iii) আমি বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ।
(iv) আমার সাহায্যে গাছেরা খাবার তৈরি করে।

আমি ____________________।

10. সূত্রের সাহায্যে শব্দছকটি পূরণ কর : **(প্রতিটি শব্দের জন্য 1 নম্বর)**
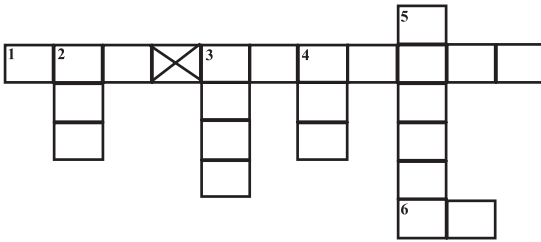
সূত্র

পাশাপাশি : 1. যে প্রক্রিয়ায় ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে
3. জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন জলের অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে যা তৈরি হয়
6. জৈব বাহক

ওপরনীচ : 2. একটা মৃদগত কান্ডের ইংরাজি নাম
3. তড়িৎ চুম্বকের কৃপায় কম্পিউটারের তথ্যের ভাঁড়ার
4. শিয়ালকাঁটার বীজের তেল মেশানো সরষের তেল খেলে এই রোগ হয়
5. এর থেকে পেনিসিলিন তৈরি করা হয়

11. একটা ফলের ছবি এঁকে বহিঃত্বক, অন্তঃত্বক ও বীজের অবস্থান দেখাও। **[3 + (1/2 × 4) = 5]**

12. পাশের ছবিতে গর্ভমুণ্ড, গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয়ের অবস্থান দেখাও। (প্রতিটি অংশ দেখানোর জন্য 1 নম্বর)

শিখন পরামর্শ

এই বইটিতে পরিবেশের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের ধারণার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পঠন-পাঠনের প্রয়োজনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের উপযুক্ত এককগুলি নির্বাচনে শিক্ষক/শিক্ষিকা নমনীয় হতে পারেন। এই বইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে **'আকাদেমি বানান অভিধান'** অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: তাপ, আলোক, চৌম্বক ও তড়িৎশক্তির প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি বহুসংখ্যক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সহজভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জীবজগতে এগুলির প্রভাব নানা উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করতে, প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করতে ও বিশ্লেষণ করতে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সাহায্য করবেন। 36, 37,48 এবং 62 পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিউটনের সূত্রগুলির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত সূত্রগুলি না বুঝে মুখস্থ করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের মনে সূত্রগুলির মূল বিষয় সম্পর্কে যাতে ধারণা স্পষ্ট হয় সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিশেষ নজর রাখবেন। দ্বিতীয় গতিসূত্রের প্রচলিত রূপটি লেখা হয়নি, কারণ স্থির ভরবিশিষ্ট বস্তুর বেলাতেই সূত্রটির আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিউটনের জীবনী (76 পৃষ্ঠা) থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে রসায়নের জগতে প্রবেশ করতে **পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া** সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় ধারণাগুলির অবতারণা করা হয়েছে। চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণের সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু উদাহরণ এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের সমতাবিধান করতে শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্যোগী হয় সেইদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিশেষ নজর রাখবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: 'পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়ে জীবদেহ গঠনে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন **আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য** শনাক্তকরণে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে পরীক্ষা করবে, এটাই কাম্য। মানবদেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হলে কী কী সমস্যা হতে পারে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন **খাদ্যলবণ, সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব** সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর জন্য বহুমুখী কর্মপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। 119 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 128 ও129 পৃষ্ঠার 'জেনে রাখো', 136 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 139 পৃষ্ঠার 'জানো কি?' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পরিচিত নানা **খাদ্যে কী কী খাদ্য উপাদান** থাকে ও তার অভাবে কী সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **অপুষ্টি ও স্থূলত্বের** মতো বিষয়গুলি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিভিন্ন **সংশ্লেষিত খাদ্য** নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **জলপানের প্রয়োজনীয়তা** বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। **খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর** ভূমিকা দেখানো হয়েছে। 154 পৃষ্ঠার ভিটামিনের ইতিহাস ও 172 পৃষ্ঠার পৃথিবীর মিষ্টি জলের হিসেবনিকেশ থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এই অধ্যায়টিতে **উদ্ভিদের দেহগঠনের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্য** সম্পর্কে নানা তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানেও অনেক হাতেকলমে কাজের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশে জীবরা কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা বোঝানোর জন্য **ব্যাপন ও অভিস্রবণ** প্রক্রিয়ার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: পরিবেশ দূষণ ও দূষণজনিত ক্ষতি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। পরিবেশের ক্ষতির নানান ভয়াবহ দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতন করতে **জীববৈচিত্র্যের ধারণা, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বর্জ্য ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি** অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে **পরিবেশ রক্ষায় নানা গাছের ভূমিকা** উপলব্ধি করবে । 231 ও 232 পৃষ্ঠায় দেওয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও 249 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

অষ্টম অধ্যায়: আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড দূষণ, পেশা ও সমস্যা এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগের সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার চেষ্টা হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দুটি বিষয়। কীভাবে **দূষিত পরিবেশ জনস্বাস্থ্যকে** প্রভাবিত করে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থী অবহিত হবে এই অধ্যায়ে। 256 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 265 পৃষ্ঠার WHO এবং UNICEF সম্বন্ধীয় বিষয় ও 281 পৃষ্ঠায় 'কলেরা রোগের ইতিহাস' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন অধ্যায়ের উপরোক্ত পৃষ্ঠাগুলি ছাড়াও বইয়ের অন্যত্র শিক্ষার্থীর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এইসব অংশ থেকে নিছক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে লেখো।